

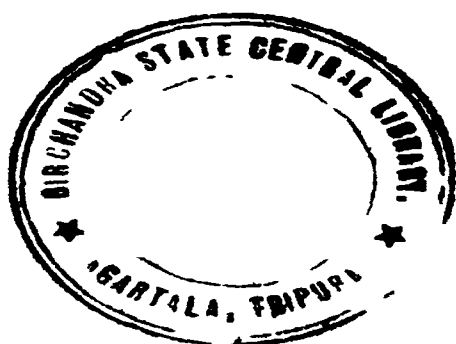
অরূপ রতন

সৈয়দ মুস্তফা সিরাজ



অরূপ রতন

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ



প্রকাশ ভবন

১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৬

প্রথম সংস্করণ : বৈশাখ, ১৩৫০

প্রকাশক :

শ্রীশচীন্দ্রনাথ মৃধোপাধ্যায়

প্রকাশ ভবন

১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট

কলিকাতা—৭৩

মুদ্রাকর :

শ্রীগোপালচন্দ্র রায়

লক্ষ্মীনারায়ণ প্রেস

৬, শিবু বিশ্বাস লেন

কলিকাতা—৬

প্রচ্ছদ পট

শ্রীমদোজ বিশ্বাস

পনেরো টাকা

পাড়ারগাঁয়েৰ মহাপ্ৰাণ ধৰন্তুৰি
প্ৰয়াত ডাঃ চিত্তৰঞ্জন সিংহেৰ
স্মৃতিৰ উদ্দেশে

এই লেখকের দল্লৈখাযাগা উপন্যাস

নিরুপ গঙ্গা

আশুনের চারপাশে

উত্তর জাহুবী

তৃণভূমি

সংশ্লুক

বাসস্থান

কুম্ভা বাড সেরেনি

নিশলনা

সোনালী আঙ্গুর গুচ্চ

নির্ব্য না জা'ন

লক্ষ্যম

বিভ্রাভ

র চমাহে'

হুমত ছিল ন

১ বামুদক্ষ

অশরারী ঝড়

অপেক্ষ নিচে দাড়িয়ে

পূর্বকথা

বসন্তপুর হন্ট থেকে পশ্চিমে ক্রোশ হই গেলে মাঝারি আয়তনের একটি নদী পড়ে। নদীর নাম করালী। করালীর ওপারে কিছুদূর বিস্তৃত এক বনভূমি। তার ভেতর দেবী করালীর জীর্ণ প্রাচীন মন্দির। একদময় এই মন্দিরের চারপাশ ঘিরে পাঁচিল এবং ধর্মশালাও ছিল। কালক্রমে পাঁচিল ভেঙে পড়েছে। ধর্মশালার অবস্থাও তদ্রূপ। মেঝেয় কাটল ধরেছে। কাটলের ভেতর দিয়ে পেছনের বটগাছের শেকড় বাকড় এগিয়ে এসেছে। যেন মহাকাল তাঁর নৈসর্গিক পাঞ্জায় মনুষ্যসৃষ্ট এক রম্যনিকেতনকে বেশি মাত্রায় শাসন করতে গিয়ে তাকে ধ্বংস করেই কেলেছেন প্রায়।

বাংলা ১৩২২ সালের বৈশাখী পূর্ণিমার রাতে বীক্ষা-শ্রীরামপুরের মথুরামোহন তাঁর মেয়ে কনককে নিয়ে করালীর মন্দিরে পূজা দিতে গিয়েছিলেন। মথুরামোহন ততকিছু পয়সাওলা মানুষ ছিলেন না। জমিদারী সেরেস্তায় নিছক হিসাবরক্ষকের কাজ করতেন। তাঁর পদটিকে বলা হত সেরেস্তাদার। মাসে সাড়ে সাতটাকা বেতন। সেরেস্তায় সার্বিকভাবে যে উপরি আয়ের গোপন চক্র ছিল, সেখান থেকে মাঝে-মধ্যে তাঁর কতুয়ার পকেটে দুচারপয়সা নেহাত মুখ্যপা দিতেই গুঁজে দেওয়া হত। সরল মানুষ মথুরামোহন নীতিবোধ সত্ত্বেও মুখ বুজে এই উপরি নিতেন। না নিয়ে উপায়ও ছিল না। কিন্তু পাগভয়ে সেই বাড়তি রোজগারের সাতটাই নানাভাবে দান করে কেলেতেন। এই অভ্যাসের ফলে তাঁর বৈষয়িক অবস্থার উন্নতি ঘটেনি। এখন কী একালের মধ্যবিত্ত চাকুরীদের মতো মাঝেমাঝে তিনি প্রচণ্ড অর্থীভাবে পড়তেন। করালীর মন্দিরে যাবার সময় তাঁর ওইরকম নৈশ্রদশা চলছিল।

তাই বসন্তপুর হন্টে নেমে গরুর গাড়ি ভাড়া করার সামর্থ্য সেদিন তাঁর ছিল না। চোদ্দবছর বয়সের মেয়ে কনকের একটি পা জন্মাবধি বিকল। ওই বিকলাঙ্গ মেয়েকে দুক্লেশ দূরত্ব পেরিয়ে করালীর মন্দিরে নিয়ে যাওয়া বস্তুত কঠিন কর্ম। কিন্তু মথুরামোহনের শারীরিক সামর্থ্য ছিল প্রচুর। কনক একটি লাঠির সাহায্যে কিছুটা চলাকোরা করতে পারত। সেও বড়জোর বাড়ির সীমানার মধ্যে। করালীর মন্দিরে যাবার রাস্তায় কয়েক পা এগিয়ে সে ক্লান্ত হয়ে পড়ছিল। তখন মথুরামোহন মেয়েকে কাঁধে তুলে নিচ্ছিলেন। এই রাস্তায় এখন দৃশ্য নতুন কিছু ছিল না।

করালী নদীতে চৈত্রে গোড়ার দিকে চড়ে যায়। সোনালী বালির
 ঠাঁজে-ঠাঁজে বিলম্বিত করে ক্ষীণ জলের ধারা বয়। বৈশাখী পূর্ণিমার দিন বাবা
 ও মেয়ে করালী নদীতে সেটুকু জলও দেখতে পেল না। তাদের তৃষ্ণা পেয়েছিল।
 নদী পেরিয়ে বনভূমির ভেতর সামাগ্র কিছুটা এগিয়ে যখন মন্দির দেখা গেল, তখন
 কনক মূহুর্তে 'জল' শব্দটা উচ্চারণ করল।

মথুরামোহন শাস্ত্রভাবে হেসে বললেন, 'এখনই জল পেয়ে যাবি, মা।
 একটুখানি ধৈর্য ধর। প্রাঙ্গণে ইঁদারা আছে।'

ততক্ষণে বনভূমির ভেতর এই মন্দিরে শেষ বেলায় ধূসরতা গাঢ় হয়েছে।
 ভাঙা তোরণের দুপাশে ইঁটের তুপে ক্ষয়ধ্বংসে গুল্ম জন্মেছে। মাথার ওপর
 বিশাল সব গাছের ডালপালা আর পুরু পাতার ছাউনি আকাশকে আড়াল
 করেছে। চারপাশে গভীর কোন অস্ত্রবাল থেকে পাখিদের কলরব শোনা যাচ্ছে।
 হঠাৎ কখন বাতাস থেমে গেছে মথুরামোহন লক্ষ্য করেননি। পাখিদের ওই
 তুমুল অগ্ৰচ চাপা চিংকারও যেন একটা গুমোট স্তব্ধতারই অংশ হয়ে উঠেছে।
 নির্জন মন্দির প্রাঙ্গণে কনককে নামিয়ে রেখে মথুরামোহন এসেই কেসে সাড়া
 দিলেন। তারপর ইঁদারার দিকে এগিয়ে গেলেন। ইঁদারার গোড়াটা গোল
 করে কাণোপাথরে বাধানো। পাথর ময়ূষ হয়ে আছে। একপাশে দড়ি ও
 বালতি যত্ন করে রাখা আছে। বালতি নামানোর সময় মথুরামোহন মুখ ঘুরিয়ে
 দেখলেন, কনক তার লাঠির সাহায্যে একপা-একপা করে এগিয়ে আসছে। তার
 সুন্দর মুখে তৃষ্ণার রেখা ঘুটে রয়েছে।

মথুরামোহন ইঁদারার ভেতর বুকে জল দেখার চেষ্টা করলেন। বালতিটা
 যেন অনন্তবাল ধরে নেমে চলেছে। এইসময় তিনি হঠাৎ একটা দুর্গন্ধ টের
 পেলেন। ইঁদারার ওপরে অবশ্য খানিকটা জায়গা ফাঁকা এবং আকাশ দেখা
 যাচ্ছে। তাই ইঁদারার তলায় মলিন কাঁচের মতো ময়ূষ অধবৃদ্ধাকার বস্তুটি যে
 জল, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু দুর্গন্ধটা কি জল থেকেই ভেসে আসছে?
 মথুরামোহন বিব্রত হলেন। মন্দিরের এবজন সেবায়ত আছেন। পাশের
 একটা গ্রামে তাঁর বাড়ি। এই মন্দিরের দেবোত্তর সম্পত্তি তিনিই ভোগদখল
 করেন। তাঁর কি উচিত নয় ইঁদারাটা পরিষ্কার রাখা? বিশেষ করে আজ
 বৈশাখী পূর্ণিমার দিনটা অনেক ভক্ত আসে এখানে। আগের মতো ভিড় হয় না
 বটে, ধুমধামও কিছু হয় না—কালক্রমে যেন মা করালীর মাহাত্ম্য লোপ পেয়েছে,
 তাহলেও এরকম অব্যবস্থার কারণ কী?

বালতিকে জলস্পর্শ না করিয়ে মথুরামোহন এদিক-ওদিক তাকিয়ে

সেবায়তকে খুঁজলেন। শুনেছেন, বিশেষ তিথির দিনটা ছাড়া সেখানেই সন্ধ্যার আগেই বাড়ি চলে যান, করেন প্রত্যাশে। আজ বিশেষ তিথি। মথচ মন্দির সংলগ্ন ঘরের দরজা বন্ধ রয়েছে। ভারি আশ্চর্য তো।

মথুরামোহন মন্দিরের দিকে তাকালেন। মন্দিরের দরজা যথারীতি খোলা রয়েছে। মন্দিরের অবস্থাও জরাজীর্ণ। কতকাল সংস্কার করা হয়নি। চড়াব ত্রিশূল হেলে রয়েছে। ফাটনে আগাছা গজিয়েছে। সামনের দেয়ালে জায়গায়-জায়গায় পলেস্তারা, বাকি সবটাই নোনাঘরা ইটের থাক। দরজার সামনে উঁচু ক্ষতরটার অবস্থাও করুণ। তবে পরিষ্কার করার চিহ্ন রয়েছে। নিচের প্রাঙ্গণটাও পরিচ্ছন্ন। একদিকে শুকনো পাতা জড়ো করা আছে। মথুরামোহন মন্দিরের গভবাসিনী দেবীর উদ্দেশে মনে মনে বললেন, ‘ক্ষমা করো মা।’

কনক এগিয়ে এসে ইদারার ধারে পাথরের চত্বরে বসে ফের:বলল, ‘জল খাব, বাবা।’

মথুরামোহন উদ্বিগ্ন মুখে ইদারার ভেতর আবার খুঁজলেন। শালতিটা ছেড়ে দিলেন। দূরে গভীরে একটা শব্দ হল। যেন অগ্নি কোনো জগতের স্পন্দন ধ্বনিত হল। কিন্তু কী দুর্গন্ধ! মথুরামোহন ক্ষুণ্ণমনে মূখী তুলে মেয়ের উদ্দেশে বললেন, ‘তাই তো কনক! এত দূরে পড়া গেল দেখছি।’

কনক অশ্রুচক্ষুর প্রগ্ন কবল, ‘কেন বাবা? কী হয়েছে?’

‘ইদারাব জলটা বেজায় দুর্গন্ধ।’

বুদ্ধিমতী কনক একটু হাসবার চেষ্টা কবে বলল, ‘গাছের পাতা পড়েছে। সেই পচা পাতার গন্ধ।’

‘না মা। খুঁজিছিরি গন্ধটা। মনে হচ্ছে...’ গেমে গেলেন মথুরামোহন। কথাটা বলতে বাবল। তিনি বলতে চাইলেন, জীবজন্তুর মড়ার পচা গন্ধের মতো কতকটা।

কনক শিশুর মতো জেদ করে বলল, ‘হোক। ওই জলই খাব। আমার ভীষণ তেষ্ঠা পেয়েছে যে।’

মথুরামোহন বিব্রত বোধ করলেন। তারও তেষ্ঠা পেয়েছে। মন্দিরে পৌঁছে জল খাবেন ভেবে বসন্তপুর হস্টে জল খাননি। কনকও খেতে চায় নি। ভুল হয়ে গেছে। মথুরামোহন আবার এদিক-ওদিক মুখ ঘুরিয়ে একটা কিছু হাতড়াচ্ছিলেন। হঠাৎ মাথায় এল, সেখানেই ঘরের ঘরে জল থাকা সম্ভব। জলের অভাবে কষ্ট হচ্ছে বলে তো মড়াপচা জল খাওয়া যায় না। নিশ্চয় ইদারার ভেতর কাঠবেড়ালী হোক, কিংবা এই উদ্বলের কোনো প্রাণী হোক, দৈবাৎ পড়ে গিয়ে মারা গেছে।

মথুরামোহন দাঁড়িটা ইদারার মুখে লোহার আংটার বেঁধে রেখে সেবায়তের ঘরের দিকে এগিয়ে গেলেন। কনক অবাক হয়ে বলল, ‘কী হয়েছে বাবা ! কোথায় চললে হঠাৎ ?’

মথুরামোহন যেতে যেতে বললেন, ‘আসছি।’ তারপর সেবায়তের ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে দেখলেন, দরজাটা ঠেকা দেওয়া আছে। তাহলে কি সেবায়ত নেশার ঘোরে সন্ধ্যা আদি নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছেন ? মথুরামোহন বিনীতভাবে একটু কেসে ডাকলেন, ‘ঠাকুর মশাই আছেন নাকি ? ঠাকুর মশাই !’

কোনো সাড়া এল না। বনভূমির অভ্যন্তরে ততক্ষণে আবছা আঁধার ঘনিয়েছে। পা বাড়িয়ে দরজায় টোকা দিতে গিয়ে সেই অস্পষ্ট আলোতে পায়ের সামনে কালো কয়েকটা ছোপ দেখতে পেলেন মথুরামোহন। বৃক্কের ভেতরটা ধড়াস করে উঠল। তার যষ্ঠেজিয় জেগে উঠল যেন। এগুলো কি রক্ত ? কিসের রক্ত ?

হেঁট হয়ে ঝুঁকে দেখে মথুরামোহন স্থির জানলেন, রক্তই বটে। তাঁর সারা শরীর খরখর করে কঁপে উঠল। কিন্তু তিনি মরায়া হয়ে দরজা জোরে ‘ঠেলে দিলেন। ঘরের ভেতরটা আঁধার হয়ে আছে। স্থলিত স্বরে চৈচিয়ে উঠলেন মথুরামোহন, ‘ঠাকুর মশাই ! ঠাকুরমশাই !’

কোনো সাড়া এল না। তখন মথুরামোহন ছুটে গেলেন কনকের কাছে। করালীর মন্দিরে রাত্রিযাপন করতে হবে বলে পুঁটুলির ভেতর যথেষ্ট চিঁড়ে গুড় এবং একখানা ছোট সতরঞ্জি এনেছেন। একটা ঘটি আর বেঁটে চৌকোনো কাচের লণ্ঠনও এনেছেন। লণ্ঠনে দুমূল্য কেরোসিন ভরা রয়েছে। সেরেস্তার নায়েব মশাইয়ের সম্পত্তি এটি। অনুগ্রহ করে দিয়েছেন সজ্জন সেরেস্তাদারকে। সে-আমলে কেরোসিন দামের জ্ঞান নয়, বিলাসিতার জিনিস হিসেবেই গণ্য হত পাড়াগায়ে। অবিকাংশ বাড়িতেই রেড়ির তেলের পিদিম জলত। কদাচিৎ কোনো-কোনো বাড়িতে কেরোসিনের কুপি বা লণ্ঠন। আসলে গ্রামের মানুষ বড় বেশি ঐতিহ্য অনুগত। প্রথা ভাঙতে চায় না সহজে। তাছাড়া সাধারণভাবে সৌখিনতার প্রতি প্রচ্ছন্ন নিদার বাকা দৃষ্টও পড়ত। মথুরামোহন ঐতিহ্য-অনুগত সাধারণ গেরস্থহিসেবেই জীবনযাপন করতেন। এমন কী দেশলাই কাঠিও কদাচিৎ ব্যবহার করতেন। চকমকি-পাখর আর একটুকরো শোলা ছিল তাঁর প্রিয় জিনিস। মাঝে মাঝে হুকো এবং বিড়ি টানার নেশা ছিল। তাই চকমকি সঙ্গে রাখতেন। একটা কোঁটোর ভেতর যত্ন করেই রাখতেন।

কনকের প্রশ্নের কোনো জবাব না দিয়ে ব্যস্তভাবে তিনি চকমকি হুকো শোলাটা ধরিয়ে নিলেন। তারপর শুকনো নারকোল ছোবড়ার গুটি বের করে

ফুঁ দিয়ে ধরালেন। শোলাটা নিভিয়ে রেখে ফুঁ দিতে থাকলেন ছোবড়ার গুটিতে। সেই সঙ্গে কনককে করমাস করলেন, ‘বটপট ওই পাতাগুলো কুড়িয়ে দে তো মা!’

কনক যেখানে বসে ছিল, সেখানে ইঁদারার চব্বরের নিচের খাঁজে শুকনো পাতা বাতাসের টানে উড়ে এসে জমে আছে প্রচুর। কনক ভাবল, বাবা ঠিকই করছেন। লষ্ঠন জ্বালার সময় হয়েছে। সে পাতাগুলো হাত বাড়িয়ে কুড়িয়ে সামনে রাখল। তখন মথুরামোহন জ্বলন্ত ছোবড়ার গুটিটা পাতাগুলোর তলায় রেখে ফুঁ দিতে শুরু করলেন। একটু পরেই পাতাগুলো জ্বলে উঠল।

এইভাবে অনেক পরিশ্রমে যখন লষ্ঠনটা ধরেছে, তখন গাছপালার আড়ালে পূর্ণ চাঁদও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। গাছের ছাউনির ফাঁকে চাঁদটাকে দেখতে পেয়ে কনক চাপা দীর্ঘশ্বাস কেলল। আনমনা হয়ে গেল কিছুক্ষণের জন্য। গ্রাম্য বালিকাদের এই স্বভাব। সে তেষ্ঠার কথা সাময়িকভাবে ভুলে গেল।

মথুরামোহন ততক্ষণে সেবায়েতের ঘরের ভেতর উঁকি মেরে আবার ধরধর করে কাঁপছেন। ঘরের ভেতর আসবাবপত্র তেমন কিছু নেই। একটা খাটিয়া, আলনায় একটা গামছা আর কতুয়া ঝুলছে। খাটিয়া এবং মেঝের চাপ-চাপ কালছে রক্ত।

সবচেয়ে ভয়ংকর লাগল মথুরামোহনের, জলের কুঁজোটা উণ্টে পড়ে রয়েছে।

দৃষ্ট আরও স্বচ্ছ হলে এবার লক্ষ্য করলেন, একটা কোনা খুঁড়ে চূর্ণস্বরূপে আর মাটির চাবড়া স্তূপ করে রেখেছে কারা।

মুহূর্তে বুঝলেন মথুরামোহন, গোপন ধনসম্পদের লোভেই ডাকাতরা সম্ভবত সেবা তাকে খুন করে ইঁদারার ভেতর ফেলে দিয়েছে।

কনকের বুদ্ধি গাঢ়তম করছিল। গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে মুহূর্তে হালুদ জ্যোৎস্না মন্দিরপ্রাঙ্গণকে চিত্রিত করেছে। সে অস্বস্তিতে বাবাকে ডাকছিল। সেই ভাবে মথুরামোহনের সঙ্গি ফিরল। এতক্ষণে তিনি অনুমান করতে পারছেন, আজ বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে কেন করালীর মন্দির এমন জনশূন্য। যারা পূজো দিতে এসেছিল, সম্ভবত এ ঘটনা চাক্ষুষ করে তারা তৎক্ষণাৎ স্থানত্যাগ করেছে।

মথুরামোহন ভারি পায়ে মেয়ের কাছে ফবে এসে শুধু বললেন ‘জল নেই।’ কনক ভয় পাবে বলে অনুকথা গোপন রাখলেন।

কিন্তু কাছে জল না থাকলে মানুষের তৃষ্ণা বেড়ে যায় আরও। কনক বারবার অশ্রুটস্বরে জল শব্দ উচ্চারণ করতে থাকল। আর মথুরামোহনেরও ওই ভীষণ দৃশ্য দেখে বর্ধতালু আরও শুষ্ক হয়েছে। শরীর প্রায় বিধ্বস্ত। মাথা ঘুরছে। এ অবস্থায় কনককে কাঁধে তুলে দুকোশ পথ হেঁটে বসন্তপুর হাটে পৌঁছানোর

কথা চিন্তা করাও বাতুলতা। হঠাৎ মথুরামোহনের মনে পড়ে গেল, পূজো দেবার আগে ভক্তরা করালীর দহে নাকিপূজন করে আসে। এই মন্দিরের দেবীমাহাত্ম্য যাদের কাছে শুনেছিলেন, তারাই বলেছিল একথা।

মথুরামোহন বললেন, ‘মা কনক ! শুনেছি নদীতে কোথাও একটা দহ আছে। সেখানে জল থাকা স্বাভাবিক। চল, আমরা সেটা খুঁজে দেখি।’

কনক বলল, ‘ঘটি নিয়ে তুমি যাও বরং। আমি এখানে থাকছি।’

‘সে কী ! এখানে একা থাকতে তোর ভয় করবে না তো মা ?’

কনক বলল, ‘না। আমাকে কি কখনও ভয় পেতে দেখেছ ?’

সেক্ষাণ্টিক। মথুরামোহন তবু ইতস্তত করছিলেন। কনককে কিছু না জানিয়ে এই ভয়ংকর নির্জন স্থানে একা রেখে যাওয়া কি ঠিক হবে ? কিন্তু কনকের তাগিদে শেষ পর্যন্ত তিনি লণ্ঠন ওর কাছে রেখে ঘটি নিয়ে চলে গেলেন। যাবার সময় সাবধান করে গেলেন, যদি সে ভয় পায়,::যেন বাবাকে চিৎকার করে ডাকে।

জনহীন বনভূমি পূর্ণিমার চাঁদের জ্যোৎস্নায় ঝলমল করছিল। নদীতে পৌঁছে প্রথমে মথুরামোহন গেলেন কিছুদূর উত্তরে। কিন্তু সর্বত্র বালির চড়া জ্যোৎস্নায় ধু ধু করছে। তখন ফিরলেন দক্ষিণে। বেশ কিছুদূর চলার পর বনভূমির অন্তর্গতে ছোট একটা দহ সত্যি দেখতে পেলেন। দহের জলও প্রায় শুকিয়ে এসেছে। হাঁটু জলে দাঁড়িয়ে প্রাণভরে জলপান করলেন মথুরামোহন। কাঁধে মুখে জল ছোটালেন। তারপর আরও একটু এগিয়ে ঘটি ডুবিয়ে জল নিলেন।

শরীরের ক্লান্তি দূর হবার ফলে আতংকটাও অনেক হ্রাস পেল। সাহস এল মনে। বিভ্রিড় করে মা করালীর নাম উচ্চারণ করতে করতে পাড়ে উঠলেন মথুরামোহন। বনের ভেতর দিয়ে মন্দির অনুমান করে দ্রুত হাঁটতে থাকলেন।

একটু পরে মন্দির দেখতে পেলেন। তখন কনককে আশ্বস্ত করার জন্য মথুরামোহন গলা চড়িয়ে বললেন, ‘পেয়েছি মা ! যাচ্ছি। তুমি ভয় কোরো না।’

গাছের ফাঁকে স্থানে-স্থানে যথেষ্ট চাঁদের আলো এসে পড়েছে। তার ফলে মোটা-মুটি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে সব কিছু। শুধু কোথাও কোথাও লতাগুল্মের কুপ কালো হয়ে আছে। সেই ভাঙা তোরণের সামনে পৌঁছে থমকে দাঁড়ালেন মথুরামোহন। লণ্ঠন দেখা যাচ্ছে না কেন ? ডাকলেন, ‘কনক ! কনক !’

কিন্তু কোনো সাড়া এল না। কনক কি তাহলে মন্দিরে মাকে প্রণাম করতে চুকেছে ? মথুরামোহন ব্যস্তভাবে মন্দিরের দিকে ছুটে গেলেন। কিন্তু মন্দির অন্ধকার। ফের ডাকলেন, ‘কনক ! কনক ! তুই কোথায় গেলি ?’

নির্জন মন্দির, বন এবং জ্যোৎস্না প্রৌঢ় পিতার ব্যাকুল চিংকারে কেঁপে-কেঁপে উঠতে থাকল। তবু কোনো সাড়া এল না। মথুরামোহন উন্মাদে মতন প্রাঙ্গণে একবার এদিকে একবার সেদিকে ছোট্টাছুটি করে বেড়ানেন। ইনারার মধ্যে মুখ ঢুকিয়ে আত্ননাদ করে ডাকলেন. ‘কনক! কনকলতা!’ পুরোহিতের প্রেতাগ্না যেন গভীর, দুর্গন্ধ, কালো জলের ভেতর থেকে প্রতিধ্বনিত সাড়া দিল, ‘কনকলতা!’ কনকলতা!’

কনককে কি তাহলে বাষে ধরে নিয়ে গেছে? অসহায় মথুরামোহন পিভাঙ্ক পদক্ষেপে প্রাঙ্গণে নেমে আসতেই তাঁর পায়ে লণ্ঠনটা ঠেকল। লণ্ঠনের কাচ চূর্ণ। কেরোসিনের গন্ধ ছড়াচ্ছে। আর তার পাণেই তাঁর বৃহৎ পোটনাটি পড়ে রয়েছে।

মথুরামোহনের হাত থেকে এতক্ষণে জলপূর্ণ ঘটি সশব্দে পড়ে গেল। ছহাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে কাঁদতে সেখানেই উন্মূল গাহের মতো আছড় পড়লেন প্রৌঢ় সেরেস্তাদার। ‘মা করালো! এ তুমি কো কবলে? এই উদ্দেশ্যেই তুমি কি আমাকে স্বপ্নে দর্শন দিয়েছিলে রাক্ষুসী?’

১৩২২ সালের বৈশাখী পূর্ণিমার রাতে জনহীন দেবীকরানীর মন্দিরপ্রাঙ্গণে বলিপ্রদত্ত প্রাণীর মতো ধড়ফড় করতে থাকলেন বাঁকা-শ্রীরামপুরের হতভাগ্য মান্দ্র মথুরামোহন সেরেস্তাদার।

ভাইবোন

বাংলার শীত বড় মধুর। মাহুনের জীবনের মূল তিনটে ব্যাপার আহার-নিদ্রা-মৈথুনের কথা ভাবলে বাংলার শীতের মতো রোমাঞ্চকর ও উদ্দীপনাময় আর কোনো ঋতু দেখা যায় না। সতেজ টাটকা সবজির এত বেশি আমদানি আর কোনো সময় চোখে পড়বে না। মাছ-মা'সেরও স্বাদ যেন এ সময়টাতে স্মিট হয়ে ওঠে। গ্রামাঞ্চলে প্রধান শস্ত ধান এসময়ই উৎপন্ন হয়। তার ফলে লোকের হাতে টাকা আসে। রাতের বেলা লেপ-কাঁথা মুড়ি দিয়ে ঘুমের আরামটাও কি কম? তাছাড়া অগ্নিপ্রাণীর যেমন একটা করে মৈথুনঋতু থাকে, মাহুনের দেহের সম্ভবত এর অগ্নিও নেই। মাহুন এবং মাহুনের এই শীতে শারীরিক স্বনিষ্ঠতা কামনা খুবই স্বাভাবিক। কথায় বলে না মাঘ মাসে যার মাগ নেই সে যাক না আশান্বাতে?

রত্ন ভক্তার শতদ্রুকে এসব তত্ত্ব শুনিয়েছিলেন। রত্নাব্দে রসিক মাহুণ। শতদ্রুকে সম্পর্কে নাতি বিবেচনা করেন। বলেছিলেন, 'ভায়া! মেমসায়েরদের দেশ থেকে যখন একা ফিরতে পেরেছ, তখন বোকা যাচ্ছে, তুমি খাটি সাদিক ভারতীয়। অতএব ভারত-ঐতিহ্যমতে ঝটপট একটি স্ত্রী-সংগ্রহ করো। আমার সন্ধানে এ বস্তুটির অভাব নেই।'

বিকলে শতদ্রু হাইওয়েতে বেড়াতে পেরিয়ে রত্নভক্তারের রসিকতা মনে পড়ায় হঠাৎ থক থক করে হেসে ফেলল।

তার নোন বিপাশা বলল, 'কীরে দাদা?'

শতদ্রু বলল, 'কিছু না! আচ্ছা বিয়াস, কাল সন্ধ্যায় তোরা ঘরে একটি মেয়েকে দেখছিলুম, সে কে রে?'

বিপাশা শতদ্রুর মুখের দিকে তাকিয়ে সন্দ্বিগ্নভাবে বলল, 'ওকে তোরা চোখে ধরেছে বুঝি?'

'ভাট! চোখে ধরেছে কী বলছিস? শতদ্রু সংকোচের সঙ্গে হাসল। 'চোখে পড়েছে বলতে পারিস!'

ওই একই কথা।' বিপাশা কিছু গম্ভীরভাবে বলল। 'ওর নাম রজন। তুই যখন স্ট্রেটসে গেলি তখন ও এখানে টুকুন ছিল। তাই লক্ষ্য করিস নি। রজন আর দিদি অপরাধী আমার ক্লাসফ্রেন্ড ছিল। রজন আর সন্ধে আমার বয়সের কত তফাত!'

‘কত?’

‘পাঁচের কম হবে না।’ বিপাশা প্রশ্ন করল। ‘কিন্তু কেন ওর কথা জিগ্যাস করছিস?’

‘এমনি। চেনা লাগছিল যেন।’ শতদ্রু চুপচাপ হাত্কা পায়ে হাঁটতে থাকল। সে টের পেয়েছিল, বিপাশা রঙ্গনা সম্পর্কে কা এক বিধিনিষেধ আরোপ করতে চাইছে। আসলে এমনটা তার পক্ষে হয়তো স্বাভাবিক। দুমাদের লম্বা ছুটিতে শতদ্রু দেশে এসেছে। এই সুযোগে বাবা-মা তার জন্ম বটপট একটা পাত্ৰা যোগাড় করতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। কলকাতার ইংরিজি কাগজে ইতিমধ্যে বিজ্ঞাপনও দেওয়া হয়েছে। আত্মীয় স্বজনকে চিঠি লিখেও তৎপর করা হয়েছে। শতদ্রুর এতে আপত্তি নেই অবশ্য। মাঠে ফেরার সময় একজন লজ্জিনী থাকা মন্দ হবে না। অন্তত একাকিত্ব তো দূর হবেই।

এই অবস্থায় বুঝি বিপাশা চাইছেন, দাদা যাকে-তাকে ছট করে জুটিয়ে নিক। শতদ্রু মনে মনে হাসতে লাগল। কিন্তু রঙ্গনা নামটা এতক্ষণে তার বেশ মনে পড়ে গেছে। মামুষের জীবনে কেন যেন কোনো একটা দৃশ্য বহুদিন নিখুঁতভাবে স্মৃতিতে থেকে যায়।

কতদূর আগে, ঠিক মনে পড়ছেন। এই বসন্তপুর স্থলে (তখনও কলেজ হয় নি) কা একটা অস্থগান ছিল। শতদ্রু স্টেজের পেছনে ফ্রকপরা একটা মেয়েকে একান্ত একটা চেয়ারে বসে তন্নয়ভাবে বই পড়তে দেখেছিল। ওখানে একটা মিটমিটে বাষ জ্বলছিল মাথার ওপর। মেয়েটির বয়স তখন কত আর হবে? এগারো-বারোর বেশি নিশ্চয় ছিল না। স্টেজে তখন গান কিংবা নাচ চলছে। এখানে অন্ধ করে কা বই পড়ছে মেয়েটি? শতদ্রু অবাক হয়েছিল। শুধু অবাক নয়, খুব ভালও লেগেছিল। মিস্ট্রি চেহারার মেয়ে, তার মুখের দুপাশে চুল এসে পড়েছে। আলতো হাতের আঙ্গুলে চুলগুলো সরিয়ে দিচ্ছে। তারপর সে চোখ তুলতেই চোখ পড়েছিল শতদ্রুর চোখে। মুখে কিন্তু হাসি বা লজ্জা কিছুই ছিল না। কেমন যেন উদাসীন চাহনি! ফের সে বইয়ের পাতায় চোখ নামিয়েছিল। শতদ্রুর শুধু এটুকুই মনে আছে, কেউ তাকে রঙ্গনা বলে ডাকছিল। তখন সে বলেছিল, ‘বাই!’ তখনই এতদূর ধরে হঠাৎ কখনও-কখনও দৃশ্যটা তার মনে পড়েছে। মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে এত অদ্ভুত আবেগময় অনুভূতিতে সে আচ্ছন্ন হয়েছে। একটা স্বপ্নের মতো ঘটনা যেন। অথচ সে বুঝতে পারে না কেন ওই কিশোরীকে দেখে সে মুগ্ধ হয়েছিল। নাকি রঙ্গনা নামটাই এর মূল? এ ঘটনা তার একান্ত ব্যক্তিগত। তাই কাকেও জিগ্যাস করেনি শতদ্রু,

কিশোরীটি কোথায় থাকে এবং কী তার পরিচয়। এতকাল পরে তাকে কোথায় দেখে সে মনে মনে খুব বিচলিত হলেও মুখ ফুটে বিপাশাকে জিজ্ঞাস করতে বেবেছিল।

এতক্ষণে জনপদের বাইরে এসে রত্নভাঙ্গারের রাসিকতা প্রসঙ্গে হঠাৎ মনে হয়েছে, বিপাশাকে জিজ্ঞাস করলে এমন কিছু মহভারত অশুদ্ধ হবে না।

শতদ্রব কাছে এখানকার শীত শীতই নয়। সে একটা চকরা-বকরা উজ্জল রঙের গুরু পানজাবি, তার ওপর হাতাকাটা ভেলভেটের জ্যাকেট চড়িয়েছে। পরনে চুস্ত-ছাঁটের পাজামা। আসার সময় নিউইয়র্কে ব্রডওয়েতে ফুটপাথে সাজানো খ্রিসমাস সেলের পোশাকের গুপ হাতড়ে সত্যায় এগুলো কিনেছিল। সবসুদ্ধ মোটে ডলার চারেক দাম। সে থাকে ইলিনয় স্টেটের আরগান শহরে। এসব বিচিত্র পণ্য সেখানে মেলে না।

বিপাশার সাজগোজের স্বভাব নয়। হালকা সোনালী রঙের তাঁতের শাড়ির ওপর সে একটা ধূসর কার্ডিগান চাপিয়েছে। কথাবার্তা ও আচরণে সে এতটু ধারালো, কিন্তু তার চেহারায় আবছা ধরণের বিষমতা আছে—সেটা তার চোখের তলায় এবং কপালের কয়েকটা স্থম্ব ভাঁজে চোখে না পড়ে পারে না। শতদ্রব বিদেশে থাকার সময়ই জানতে পেরেছিল, হঠাৎ এক ঝড়বৃষ্টির সন্ধ্যায় চিলেকোঠায় ওঠার সিঁড়িতে কিছু দেখে প্রচণ্ড ভয় পেয়ে বিপাশা অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। তারপর থেকে তাকে একটা ভয়-পাওয়া রোগে ধরেছে।

তাদের বাড়িটা খুব পুরনো। ঠাকুরদারও ঠাকুরদার আমলে নাকি তৈরি। তবে পুরুষপুরুষের সংস্কার করা হয়েছে। গায়ে অনেকগুলো ঘরও পরস্পর কাঁধে যুক্ত করা হয়েছে। সব মিলিয়ে বাড়িটা আয়তনে বিশাল হয়ে গেছে। সামনে পেছনে পাঁচিলঘেরা প্রচুর ফাঁকা জায়গায় ফুল ফলের বাগান আছে। তারা বনেদী পরিবারের লোক। ঠাকুরদা অমরনাথ ছিলেন মাঝারি ধরনের জমিদার। অমরনাথের ছেলে রক্ষনাথ জমিদারী উচ্ছেদের পর বস্তুকটাকারি করতেন। প্রচুর টাকাকড়ি কামিয়ে এখন অবসর নিচ্ছেন। বয়স ষাট পেরিয়ে গেছে। বসন্তপুর এলাকায় কেউ কন্ট্রাক্টর নামে সবাই চেনে তাঁকে।

বিপাশা গাড়ি করে বেরুতে চেয়েছিল। কিন্তু শতদ্রব তাতে ভীষণ আপত্তি। সে গাড়ির দেশ আমেরিকা থেকে এসেছে। পায় হেঁটে ঘুরতেই তার ভাল লাগছে। পাঁচ বছর বিদেশে থাকার পর বসন্তপুরকে হাত্তবর রকমের নোংরা দেখলেও প্রাণ গেলে সে তা বলছে না। বরং ভাল লাগার চেষ্টা করছে মনে-মনে। আশ্চর্য, একবার সিউক্সে একটা মাঠ পেরিয়ে যাবার সময় বসন্তপুরের এই উত্তরের মাঠটার কথা মনে পড়ে সে প্রায় কঁদে ফেলেছিল।

তবে যেমন দেখে গিয়েছিল, তেমনি আর নেই বসন্তপুর। সামান্য পাঁচটা বছরেই কী প্রচণ্ড বদলে গেছে। টেগনে ওভাবব্রিক হয়েছে। প্ল্যাটফর্মগুলো উচু হয়েছে। তেমনি ভিড়ও বেড়েছে। তার চোখের সামনেই ছেলেবেলার সমস্ত গ্রামকে সে শহবে রূপান্তরিত হতে দেখেছিল। এখন বসন্তপুর আরও যেন জটিল হয়েছে। বাস লরি টেম্পো রিক্সা ট্যাক্সি প্রাইভেটকার গিজ গিজ করছে।

এই হাইওয়ে টেগনের একটা তলায় দিয়ে রেললাইন ডিঙিয়ে সোজা পূর্বে এগিয়ে গেছে। বেললাইন পেবিয় ৩৫ইন কয়েক পা এগোতেই কে ডাকল ‘বিয়াস! বিয়াস!’

অমরনাথই নাতি-নাতিবির নাম বেখেছিলেন শতদ্রু এবং বিপাশা। উনি রসিকতা করে এদের ইংবেজি প্রতিশব্দ ‘স্টেজ’ এবং ‘বিয়াস’ নামে ডাকতেন। তার ফলে বসন্তপুরে সটলেজ এবং বিয়াস নামেই ছোটবেলায় সবাই ডাকত ওদের।

বিপাশা ঘুরে দেখে বলল, ‘দাদা! এই সেরেছে বে! অপরাধ আসছে!’

শতদ্রু বলল, ‘স্বপ্ননাব দিদি?’

বিপাশা মাথা নাড়ল। টেগনের দিক থেকে লাইনেব ধারে-ধারে সাবধানে কাপড় গুটিয়ে অপরাধ আসছিল। বিপাশা হাসিমুখে বলল, ‘তুই কি ট্রেন এলি? কোন ট্রেন? যা বা!। কোনো ট্রেন তো দেখলুম না।’

অপরাধ সে-কথার জবাব না দিয়ে নমস্কার করল শতদ্রুকে। ‘আপনি এসেছেন খবর পেয়েছি। দেখা কবতে যাওয়ায় সময় পাইনি।’ তারপর বিপাশার দিকে ঘুরে বলল, ‘এমেছি তো অনেকক্ষণ। একজনের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। কথায় কথায় দেরি। তোবা বেড়াতে বেরিয়েছিস?’

বিপাশা হাসিমুখে মাথাটা দোলাল।

শতদ্রু বলল, ‘ইচ্ছে কবে তো আপনি আসতে পারেন। খুব চমৎকার আবহাওয়া।’

অপরাধ বলল, ‘ইচ্ছে নিশ্চয় করছে। কিন্তু উপায় নেই। ঠাকমা একলা আছে। রান্না যা মেয়ে!’

বিপাশা বলল, ‘তুই গিয়েছিলি কোথায় বে?’

‘কলকাতা।’ বলে অপরাধ একটা চোখ নাচাল। ‘জন্মের একটা ইন্টারভিউ দিয়ে এলুম জানিস?’

‘তাই বুঝি? কিসে?’

‘একটা বড় প্রাইভেট কোম্পানি।’ অপরাধ ফের শতদ্রুর দিকে তাকাল। ‘আপনি একেবারে কিন্তু সায়েব হয়ে গেছেন। চেনা যাচ্ছে না।’

বিপাশা বলল, 'তাহলে আয় তুই। আমরা একটু ঘুরে আসি।'

অপরূপা চলে গেলে শতদ্রু বলল, 'তোরা বন্ধুটিকে কি আশি চিনি? মনে পড়ছে না তো!'

বিপাশা বলল, 'দেখেছি। মনে থাকার কথা না।'

শতদ্রুর কৈশোর থেকেই কলকাতায় কেটেছে। বাড়ি এসেছে বছরে দু'এক বার মাত্র। বসন্তপুর তার বরাবর অপছন্দ ছিল। বাবা-মায়ের তাগিদে বাড়ি আসত বটে, ঝটপট কেটে পড়ত। রুম্মনাথ বলতেন, 'ওর মামী ওকে তুচ্ছ করেছে।'

চওড়া কংক্রিটে ঢাকা রাস্তার দু'বারে আদিগন্ত ফাঁকা মাঠ। দূরে কোথাও আবছা হলুদ আর সবুজ রঙের ছোপ। সামনে অনেকটা দূরে একখানে সাদা ব্রিজের ওপর শেষ বেলার নরম রৌদ পড়েছে। তার পেছনে কালচে এবং ধূসর একটা টিলার মতো জিনিস দেখিয়ে শতদ্রু বলল, 'ওটা কি কোনো গ্রাম?'

'কোনটা?'

'ওই যে—ওখানে।'

বিপাশা দেখতে-দেখতে বলল, 'ও। এটা করালীর মন্দির। লোকে বলে, মা করালীর ভিটে।'

'ওখানে গেলে মন্দ হত না রে!'

বিপাশা ব্যস্তভাবে বলল, 'তোরা মাথাধারাপ? পাকা ছ কিলোমিটার ডিসট্যান্স। তাছাড়া ওখানে গিয়ে কী দেখবি? জঙ্গলে ভর্তি।'

বিপাশা করালীর মন্দিরের কথা বলতে থাকল। মন্দিরের আর কিছু অবশিষ্ট নেই। বটগাছ গজিয়ে সবটাই ঢেকে ফেলেছে। এপাশে-ওপাশে ইটের স্তূপ ছিল প্রচুর। আশেপাশের গ্রামের মুসলমানরা সব নিয়ে গেছে। ওরা তো ঠাকুরদেবতা মানে না। তবে এই রাস্তাটা করার সময় খুব গুণগোল হয়েছিল। মন্দিরের প্রায় ওপর দিয়ে রাস্তার নকসা করেছিল কোন ইনজিনিয়ার। সে মুখে রক্ত উঠে মারা গড়ে। পরে নকসা বদলানো হল। কিন্তু কেউ মাটি কোপাতে চায় না। বলে, 'মা করালীর ভিটেয় কোপ বসাতে পারব না।' এসব কাণ্ডের পর রাস্তা জঙ্গলের পাশ দিয়ে দোরানো হল। জঙ্গলটা থেকে গেল। ওখানে কেউ গাছের ডাল পর্যন্ত কাটিতে সাহস করে না। তবে মুসলমানদের কথা আলাদা।

শুনে শতদ্রু হাসতে হাসতে বলল, 'তুই বুঝি এসব বিশ্বাস করিস বিয়াস?'

'কী সব?'

'ওই যে বললি মুখে রক্ত উঠে কে মরেছিল।'

বিপাশা কথার জবাব না দিয়ে মুখে একটা হু হু শব্দ করে বলল, 'এই। আর না। বড্ড শীত করছে। কী বিচ্ছিরি হাওয়া এখানে।'

শতজু ঘুরে বলল, 'ইলিনয় স্টেট এবটু উত্তরঘেঁষে তো। তাই সেপ্টেম্বরেই কোনো-কোনো দিন বিচ্ছিরি ঠাণ্ডা পড়ে। তবে এই ওয়েদারকে তুই ঠাণ্ডা বলছিস? আমেরিকানরা যেদিন আকাশে মুখ তুলে 'আ। ফাইন। ভেরি প্লেজাণ্ট ওয়েদার' বলে ওঠে, তখন আমার বুক কেঁপে ওঠে।'

বিপাশা আনমনে বলল, 'কেন?'

'টের পাই, সেদিন ইণ্ডিয়ানদের পক্ষে জঘন্য আবহাওয়া।' শতজু হাঁটতে হাঁটতে বলল। 'একে তুই শীত বলছিস—আই মিন, ঠাণ্ডা? প্রকৃত শীত ঝ ঠাণ্ডা কাকে বলে কল্পনা করতে পারবিনে। নাকে গালে কামড়ে যেন মাংস তুলে নিচ্ছে মনে হবে।'

'ডিপফ্রিজের ভেতরকার মতো?'

শতজু হো হো করে হাসল। 'থাক। তুতাকে বোঝাতে পারব না। বরুং গেলে হাতেনাতে প্রমাণ পাবি।'

বিপাশা বলল, 'আমি যাব? যাচ্ছি। ইস!'

'কেন? সায়েবদের দেশ দেখতে ইচ্ছে করে না?'

বিপাশা কিছু বলল না। চূপচাপ হাটতে থাকল। শতজুর মনে হল, পাঁচ-বছর আগের বিপাশার সঙ্গে এ বিপাশার কোনো মিল নেই। বড় খামখেয়ালী দেখাচ্ছে ওকে। রেলফটকের কাছে এসে ওরা দাঁড়াল। একটা মালগাড়ি আসছে। মাল গাড়িটা চলে গেলে শতজু বলল, 'তোরা ওই বন্ধু—অপরূপাদের বাড়ি কোনটা রে?'

মালগাড়ির শব্দের জগ্ন স্পষ্ট শুনতে পেল না বিপাশা। ফটক পেরিয়ে গিয়ে বলল, 'কী বলছিলি যেন?'

'কিছু না।'

বিপাশা হাসল। 'অপরূপার কথা ভিগ্যেস করছিলি। একটা কথা বলি শোন। ওদের ফ্যামিলিটা মোটেও ভাল না। এখানে কেউ ওদের সঙ্গে গা মাথা-মাখি করতে চায় না। অপরূপা নেশা ত গায়ে পড়ে মেখে। তাই একটু পাতা দিই। তবে রন্ধনাটা ভাল।'

'তাহলে খারাপ কে?'

'অপরূপার দাদাকে তুই দেখেছিস নিশ্চয়। তার নাম অনিবার্ণ। অনি বলে ডাকে সবাই।'

‘ওয়েল। তারপর?’

বিপাশা বলল, ‘অনি কেয়ারী আসামী। অনেকদিন হল লুকিয়ে বেড়াচ্ছে।’

‘কেন?’

‘শুনেছি কোথায় খুনটুন, নাকি ডাকাতি করেছিল।’

শতদ্রু বলল, ‘বাড়ির একটা ছেলে অমন হতেই পারে। ধর, আমি যদি...’

কথা কেড়ে বিপাশা বলল, ‘তুই বা আমি এমন হব না। ওটা বংশের দোষ।
রক্তে থাকে।’

‘মানলুম। কিন্তু ওর বাবাও কি তাই ছিলেন নাকি?’

বিপাশা জোরে মাথাটা দোলাল। ‘না। ও বাবা সোনাবাবুর গদিতে কাজ
করতেন। কিন্তু অনিদার ঠাকুরদা...’ বলে সে শতদ্রুর মুখের দিকে তাকাল।
‘তুই কী ছেলেরে! মনে পড়ছে না—ওই কালুবাবু আসছে বললেই তুই ঘরে
গিয়ে লুকোতিস?’

শতদ্রু বলল, ‘তাই বুঝি? আমার কিছু মনে থাকে না।’

বিপাশা হাসতে হাসতে বলল, ‘সায়েরা তোর ব্রেনওয়াশ করে দিয়েছে।’

শতদ্রু মাথার বড়-বড় চুল আকড়ে বলল, ‘যা বলেছি।’

‘কালুবাবু নাকি সংঘাতিক ডাকাত ছিল। পুলিশের গুলিতে মারা যায়।’

শতদ্রু বোনকে পরিহাসের ছলে বলল, ‘আর তুই তা দেখেছিলি বুঝি?’

একথার জবাবে বিপাশা কেন যেন নিতেজ হয়ে গেল। আন্তে বলল, ‘না।
শুনেছি। তুইও শুনে থাকবি—মনে নেই।’

‘তোর কি শরীর খারাপ করছে?’

‘হঠাৎ মাথাটা কেমন ঘুরে উঠল।’

বিপাশাকে দাঁড়াতে দেখে শতদ্রু উদ্বেগ হয়ে এদিক-ওদিক তাকাল। মায়ের
চিঠিতে শুনেছে, বিপাশার মাথা-ঘোরা অস্থির আছে। হঠাৎ করে অজ্ঞান হয়ে
যায়। শতদ্রু একটা সাইবেলরিকশো দাঁড় করাল। বিপাশা চোখ বুজে দাঁড়িয়ে
ছিল। শতদ্রু তার হাত ধরে বলল, ‘রিকশোয় ওঠ। আমারই ভুল হয়েছিল।’

বিপাশা চোখ খুলে রথ হেসে দাদার সাহায্যে রিকশোয় উঠল।

কুড়ানি ঠাকরুনের জীবনকথা

শাতের দুপুরে রোদেভরা উঠানে মাহুর পেতে বসে রঙ্গনা একটা রঙীন ইংরেজি পত্রিকা পড়ছিল। তার দিদি অপরাধা তাকে বলে বইপাকা। এবাড়ি ওবাড়ি ঘুরে বেড়ানোর অভ্যাসও আছে রঙ্গনার। তাই তার আরও একটা নাম দিয়েছে পাড়াবেড়ানী। রঙ্গনার কোনোটাতেই আপত্তি নেই। ছোটবেলা থেকেই খানিকটা আত্মভোলা মেয়ে সে।

ইংরেজি পত্রিকাটা সিঙ্গিবাড়ির ছেলে আমেরিকা থেকে এনেছে। রঙ্গনা তার বোনের কাছে মেটা দেখতে পেয়ে চেয়ে এনেছিল। বসন্তপুরে শিক্ষিতা মেয়েদের মধ্যে রঙ্গনার মেদালী বলে সুনাম ছিল। তার ইংরেজি জ্ঞানের খ্যাতি স্কুল থেকে। লাইব্রেরী হাতড়ে ইংরেজি বই নিয়ে যেত। সহ-পাঠিনীরা বলত ভড়ং। রঙ্গনার গ্রাহ ছিল না। দুঃখের বিষয়, স্থানীয় কো-এডুকেশনের কলেজে ছবছর পড়ার পর তাকে পড়া ছাড়তে হয়েছে। ভীষণ অর্থাতাব।

এমন মেয়েকে সাহায্য করতে অনেকেই রাজি ছিল। কলেজে ফ্রিশিপেরও প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তার দাদা অনিবার্য এক গোঁ। ‘গরীব হতে পারি, ভিক্ষে নেব না কোনো শালার কাছে।’ গোয়ার অবশিষ্ট অনিবার্য ছোটবোনের পড়াশুনায় বাদ দেবেছিল। এদিকে রঙ্গনা তার দাদার ভীষণ ভক্ত।

অপরাধা ততদিনে বি. এ. পাশ করেছে। সে দাদাকে ভক্তি করে না, ভয় করে। সে জানে, দাদার নিজের পড়াশুনা হয় নি বলে বোনের শিক্ষায় বাদ দেবেছে বরাবর। তার মাঝেপ, বাশ বেঁচ থাকলে রঙ্গনাকে কলেজ ছাড়তে হত না। বাবার মৃত্যুর পর স্বভাবত অনিবার্য তাদের গার্জেন হয়ে উঠেছিল।

বাড়িটা বসন্তপুরের শেষ প্রান্তে খাঠের সীমানায় অবস্থিত। এদিকটায় এখনও সেকালের বসন্তপুর কিছুটা টিকে আছে। বাঁশবন, আগাছার জঙ্গল, পচা ডোবা, শেয়ালের ডাক, গরুর হাঙ্গারব এই সব নিয়ে দুর্দশাগ্রস্ত সনাতন পাড়াগাঁ। অথচ একটুখানি পশ্চিমে এগিয়ে গেলেই প্রশস্ত পীড়র পথ, বাজার, বিদ্যুৎ, ভিড়, মোটরগাড়ি। এখানে এখনও সঙ্কটময় লম্প জলে। ভুতুড়ে অন্ধকারে শ্রাওড়াগাছে প্যাচা ডাকে। প্রেতিনীরা ডোবার ধারে জোনাকির আলো নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। মধ্যরাতে হাড়ি-বাড়ির পিরিমল ওঝা ঘুম-ঘুম গলায় তার পোষা দুইস্ত প্রেতটিকে ধমক দিয়ে বলে, ‘খুব হয়েছে! এবারে যা দিকনি!’

রন্ধনাদের অবস্থা একসময় ভালই ছিল, তার প্রমাণ এখনও বাড়ির আনা কানোচে ছড়ানো রয়েছে। চারদিকঘেরা দালানবাড়ি কালক্রমে ইটের স্তূপে পরিণত হয়েছিল। কিছুটা অনির বাবা গৌরমোহন এবং পরে বাকিটা তাঁর ছেলে অনিবার্ণ বেচে নিয়েছে। সেকালের ইট-কাঠের ওপর অনেক লোকের একটা অদ্ভুত আকর্ষণ আছে। তবে ইটগুলো সত্যি মজবুত ছিল। শতকর বাবা কৃষ্ণনাথ কন্ট্রাক্টার অনিদের ওইসব ইট, লাইম-কংক্রিটের চাবড়া, স্বধকি ইত্যাদি রাত্ৰায় ব্যবহার করেছেন। ব্লক অফিসের বহু কাজেও লাগিয়েছেন। বাড়ির সেই সব শূণ্যতা ঢেকে ফেলেছেন স্নেহময়ী প্রকৃতি। চারপাশে আগাছা, টিবিজুড়ে ঘন জঙ্গল। মধ্যখানে একটা জীর্ণ একতলা দুটো ঘরের একটা বাড়ি টিকে আছে কোনক্রমে। তার ছাদ থেকে বর্ষায় জল চুইয়ে পড়ে। আশংকা হয়, কবে হঠাৎ ধসে পড়বে হয়তো।

তবু এগাড়িতে যেন কী এতটা শ্রীও আছে। উঠো-টুকু সবসময় ঝকঝকে। প্রাচীন ইঁদারার জল এখনও স্থপেয়। উঠোনের একপ্রান্তে সুন্দর শিম, লাউ, শশার মাচান। কয়েকটা পেঁপেগাছ। কিছু ফুলফলের গাছও ঋতুভেদে ফুলফল দান করে। সংকীর্ণ খিড়কির পথের দুধারে জবাফুলের ঝাড়। ডোবার ঘাটের মাথায় কয়েকটা কলাগাছ ফলভারে এখন প্রায় অবনত। সত্যি বলতে কী, ওইসব ফুলফল ও আনাজপত্র এ সংসারে জুবার অন্ন যোগায় আজকাল। লোকেয়া এসে কিনে নিয়ে যায়। রন্ধনার ঠাকমা, কুড়ানি ঠাকরুন বলে যান পারচিত, দরদরি করে বেচেন। এসব তাঁরই হাতে লাগানো। এতদসঙ্গে ওই খল্ল বৃদ্ধা বগলে ক্রাচ ভর করে ডোবা থেকে জল এনে সেচন করেন। তাঁর বাঁ পা-খানি হাঁটুর নিচে থেকে কাঠির মতো দেখতে এবং পায়ের পাতা দোমড়ানো।

শীতের দুপুরে স্নানাহার সেরে কুড়ানি ঠাকরুন ছোট্ট চাটাইয়ে বসে নাতনের দিকে তাকিয়ে ঝিমোচ্ছিলেন। হঠাৎ কী মনে হল, ঝিমুন ভেঙে ডাকলেন, ‘অ রনি। রনি রে!’

রন্ধনা মন দিয়ে ‘অবজারভার’ পত্রিকায় কিংবদন্তীখ্যাত আটলান্টা নগরী আবিষ্কারে এক পাগলা সায়েদের সাম্প্রতিক অভিযানকাহিনী পড়ছিল। বিরক্ত হয়ে বলল, ‘কী!’

‘রনি রে! আমায় একবারটি করালীর খানে নিয়ে যাবি?’ বৃদ্ধা হঠাৎ কী কারণে চকল হয়ে উঠেছেন। ‘অ রনি! তোর পায়ে পড়ি ভাই! একবারটি...’

রন্ধনা পত্রিকা থেকে মুখ তুলে হাসিমুখে ঘুরল ঠাকমার দিকে। ‘বলো, কী বলছ। তোমারটা শুনে নিই আগে।’

কুড়ানি ঠাকরনের বয়স প্রায় বাহাত্তর হয়ে গেছে নিজের হিসেবে। তবু একটাও দাঁত ভাঙেনি, এটাই আশ্চর্য। সরু সরু মুক্তোর মতো দাঁতে হেসে বললেন, ‘বাসে চেপে যাব, বাসে চেপেই ফিরব। তুই শুধু বাসরাস্তা থেকে থানপর্ষন্ত একটু ধবে নিয়ে যাবি। ব্যস্! আর তোকে কিছু কত্তে হবে না। অ রনি, যাবি না?’

রঙ্গনা ভুরুকুঁচকে বলল, ‘কোথায়?’

‘বললুম না? করালীর খানে।’ বৃদ্ধা কাকুতিমিনতি করলেন। ‘বড্ড ম., কেমন করছে রে! কাল রাত্তির থেকে খালি স্বপন হচ্ছে। অ রনি, তোর পায়ে পড়ি!’

‘আবাব তুমি ওই ভূতের জঙ্গলে যাবে?’ রঙ্গনা কপটভাবে ধমক দিল। কিন্তু সে মিটিমিটি হাসছিল দুচোখে। তাব মতো করে চোখে হাসতে খুব কম মেয়েই পাবে। ‘সেবারে গিয়ে কেমন ভিরমি খেয়ে আমাকে বিপদে ফেলেছিলে মনে নেই? আর আমি তোমার সঙ্গে কোথাও যাচ্ছিনে বাবা!’

কুড়ানি ঠাকরন পাছা ঘষড়ে এবং ক্রাচটা নিয়ে ওর কাছে এলেন। ‘আজ সন্ধে করব না। বুঝলি? দিন-সবরেই ফিবে আসবু। দোহাই নক্ষি মেয়ে, আমাব সোনা! মাণিক।’

রঙ্গনা তার কাঁধ থেকে ঠাকমার হাত আলতোভাবে ছাড়িয়ে দিয়ে বলল, ‘যেতে পাবি। একটা শর্তে।’

বৃদ্ধা ককণমুখে তার দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘তাঁই বল কী তোর শর্ত।’

‘একপানা বই কিনে দেবে।’

বৃদ্ধা সত্যে বললেন, ‘কই? দাম কত বে?’

‘১০—মোর্টে টাব’।’ রঙ্গনা চাপা গলায় বলল ফের, ‘মধুরবাবুকে কেনো ওই যে ভট্টাচায়াদেব মধুরবাবু। ওদেব বাড়িতে অনেক বই আছে। মনবনা ষাটার লোভে লুকিয়ে একটা করে বেচে দেয়। আমিই তিনখানা কিনছি মনে পড়ছে না মধুরবাবুকে?’

বৃদ্ধা ঠাকরনের মাথায এসে চোকে ন। তবু বললেন, ‘বুঝছি। সেই একটা

১০. ফিসফিস কবে বলল, ‘মধুরবাবুর মাথা জানতে পারলে বিপদ হবে।

১১. মন মুখ ফসকে কাকেও বলে ফেলো না।’

বৃদ্ধা জ্বরে মাথা দোলালেন।

‘জাহ্নমে দিচ্ছ তো ছটাকা?’ রঙ্গনা ঠাকমাব গলা জড়িয়ে আহুবে গলায় গেল, ‘ঠাকমা!’

বৃদ্ধা খাঁস ফেলে আস্তে বললেন, ‘তাই তো !’

‘তাই তো বোলো না। তোমার আবার টাকার অভাব ?’ বৃদ্ধনা খিলখিল করে হেসে উঠল। ‘ঠাকুরদার গুপ্তধনের খবর তুমিই তো জানো। অনেক টাকা পুঁতে রেখে গেছেন—না গো ?’

কুড়ানি ঠাকরুন ঘোলাটে চোখে নম্পলক তাকিয়ে রইলেন রঞ্জনর দিকে।

রঞ্জন বলল, ‘কী ? বলছ না যে ? তোমার কাছেই তো গল্প শুনেছি, ঠাকুরদা দুর্ধর্ষ ডাকাত ছিলেন। ডাকাতরা সোনা-দানা টাকা-পয়সা লুকিয়ে রাখে কে না জানে !’

বৃদ্ধার হুঁচোখ দিয়ে টপটপ করে জল গড়াতে শুরু করল। রঞ্জন অশ্রুত হয়ে তাকিয়ে রইল ওঁর মুখের দিকে। একমুহূর্ত পরে কুড়ানি ঠাকরুন খানের আঁচলের খুঁটে চোখ মুছে ধরা গলায় বললেন, ‘তাই যদি হত রে, এবয়সে খোঁড়া পায়ে কি ভোবার জল বয়ে এসব পালতুম ?’ সবজিমাচান, ফুলফলের গাছের দিকে জরাগ্রস্ত শোল একটা বাহ তুলে ঠাকরুন বললেন, ‘এসব কিছু পালতুম না তাহলে। রাণীর মতন পালংকে শুয়ে শেষবেলায় দাসদাসীর সেবা নিতুম। আমার খুব কষ্টের জেবন ভাই, সে সবকথা তোরা বুঝবিনে।’

কুড়ানি ঠাকরুন হঠাৎ ক্রাচটা তুলে শূত্রে নেড়ে কোনো পার্থক্য অথবা গুরু-বেড়ালের উদ্দেশ্যে বলে উঠলেন, ‘যা ! যা ! দূর ! দূর !’

বাড়িতে কেউ না থাকলেই মুশকিল। চোরে সব শেষ করে ফেলবে তাই কতবার ইচ্ছে করে, তবু করালীর থানে যাওয়া হয় না। অপরাধী না করলে তাই যাওয়া হবে না। সে আজকাল চাকরির জ্ঞান ব্যস্ত হয়ে ছোটোছুটি করে বেড়াচ্ছে। এবেলা কোথায় গেছে বলে যায় নি। কখন ফিরবে তাও জানা নেই।

অপরাধী ফিরতে বেলা গড়িয়ে গেল। ঠাকরুণ করালীর থানে যাওয়ার কথা শুনে সে কোনোরকম উচ্চবাচ্য করল না। ব্লকে কিছু স্থানীয় সমাজশিক্ষা সংগঠক নেবে—আজ তার তদ্বিরে মুরকি ধরতে গিয়েছিল। আশ্বাস পেয়ে মনটা ভাল আছে অপরাধীর। শুধু বলল, ‘দেখো—যেন সেবারকার মতো কেলেকাবি বাধিও না। রনি তোমার মতো বুড়োহাড় কাঁধে বইতে পারবে না !’

রিকশা করে বাসস্ট্যাণ্ডে, তারপর বাসে যখন চলেছেন কুড়ানি ঠাকরুন, তখনও মনের ভেতর অপূর্ণ কথাটা বাহুড়ের মতো ঝটপট করে আঁচড় কাটছে। কাঁধে বইতে পারবেনা...কাঁধে বইতে পারবেনা...কাঁধে বইতে পারবেনা

ব্রেক কষার কাঁকুনিতে ক্যালক্যাল করে তাকাচ্ছিলেন বৃদ্ধা। কণ্ঠকটার চেঁচাচ্ছে, ‘ও দিদিমনি ! করালীর ভিটে ! করালীর ভিটে !’

এখানে ঈশ নেই। কালে-ভদ্রে কদাচিৎ কেউ ওট মন্দিরে এখনও আসে। তাদের খাতির বাস দাঁড় করাতে হয়। অন্ত-যাত্রীরা খাপ্পা হয়ে চেঁচায়, ‘বলি মারো! বলি মারো!’ তাদের দোষ নেই। বাসটাকে দব থেকে দেখায় একটা চলমান মোচাকের মতো। আঁটেপিটে লোক গিজগিজ করছে ছাদে, পেছনে। জানালা আকড়েও ঝুলছে কত লোক। ড্রাইভারের কোলেও জনাকতক। মফস্বলে বাস যত সেড়েছে, যাত্রী বেড়েছে তার চৌগুণ। আঙকান গ্রামের লোকে এক পা পায়ে হাটতে রাজি নয়।

কঙ্কাকটাব ছোকরাটি সম্ভবত রঙ্গনার মুখ চেয়েই তার ঠাকমাকে হাতে তুলে যাত্রীদের মাথা ও কাঁধের ব্যুহ ভেদ করে নামিয়ে দিল। যাবার সময় হাত নেড়ে রঙ্গনার উদ্দেশে প্রেমিকের হাসি হেসে বলে গেল, ‘ট’ টা দিদিমণি। ফিবতি টিপেই নিসে যান। য়েট করবেন।’

ব্রিজ পেরিয়ে এসে প্রকাণ্ড একটা বকল গাছের কাছে বাসটা থেমেছিল। বাস চলে গেলে কুড়ানি ঠাকরুন ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে চাবুক দেখছেন। তখনও মাটিতে বসে উনি। রঙ্গনা জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে বলল, ‘এবার ? এসে তো গেছি না হুয় ?’

বন্ধা নড়বড় করে উঠে দাড়ান। কাছে ভর কবে বললেন, ‘বান।’ নদীটা কোন বাগে রে ? চোখে কিছু সোজা না কেন ?’

মাঝে মাঝে ঠাকমার মুখের কথায় অঙ্কুত একটা টান লক্ষ্য করে রঙ্গনা। সমস্তপুর এলাকায় লোকের কথায় এমন বেশরো টান নেই বলে তার ধারণা। সে রসিকতা করে ঈষৎ ভেৎচি কেটে বলল, ‘সোজে না কেন—কা বলছ ? পেরিয়ে এলে না নদী ?’

‘অ’—বন্ধা একটা হাসলেন। ‘বিরজ হয়েটে বটে তা অ’ ন’ মুখপুড়ি, তুই আমায় ভেঙাচ্ছিস যে বড ? জানি না, কার মাটিতে দাড়িয়ে আছিস এখন ?’

রঙ্গনা চোখ কপালে তুলে বলল, ‘হঠাৎ যে জোর বেড়ে গেল তোমার। ব্যাপারটা কা ?’

কুড়ানি ঠাকরুন অঁটি হেসে হাত বাড়ালেন ‘নে এর ফুস ফুস করে যাই।’

রাস্তা থেকে গড়ানে জায়গা। নচে ঝোপঝাড়ের ভেতর সাঁ পায়ে চলা একফালি পথ গিয়ে জঙ্গলে ঢুকেছে। ডাইনে নদী। করালীর ভিনে উঁচ জায়গা বলে বোধ দেওয়া হয়নি এদিকটায়। সাবধানে ঠাকমাকে ধরে নিচের পথে নামাল রঙ্গনা। তারপর বলল, ‘তোমার জোর বেড়ে গেল কেন বললে।’ ‘ত’ ?’

আগে চলতে চলতে বৃদ্ধা বললেন, 'বাড়বেই তো। এ হল গে আমার মায়ের ভিটে।'।

'মায়ের ভিটে!' রঙ্গনা হাসতে লাগল। 'দেবী করালী তো বিশ্বহৃদু সবার মা।'।

'কক্কুরি করিস নে রনি।' বৃদ্ধা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলেন।

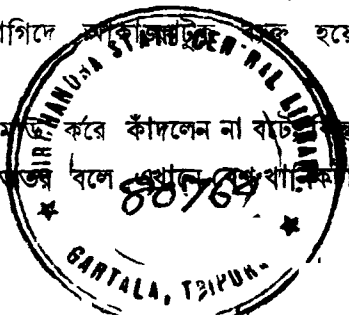
রঙ্গনার মনে পড়ল, কবছর আগে এমনি করে ঠাকমাকে নিয়ে এসেছিল। তখন কিন্তু গুর আচরণ ছিল অগুরুকম। ভীষণ কান্নাকাটি করছিলেন। শেষে মন্দিরতলায় ষাড় গুঁজে পড়ে রইলেন। কোনো সাড়াশব্দ নেই। রঙ্গনা খুব বিপদে পড়ে গিয়েছিল। ভাগ্যিস দৈবাত্বে নদীর ওপারে ধানক্ষেতে কয়েকটা শেকের দেখা পেয়েছিল। রঙ্গনার ডাকে তারা ব্রিজ পেরিয়ে দৌড়ে এসেছিল। ধরাধরি করে তারাই বাসে তুলে দেয়। কুড়ানি ঠাকরন তখনও আচ্ছন্ন অবস্থায় ছিলেন। বিড়বিড় করে কীসব বলছিলেন আর কান্নাকাটি করছিলেন। রঙ্গনার তখন বয়স কম। ভয়ে সারা।

তাই আজ রঙ্গনার সন্দেহতা খুঁচে না। সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বৃদ্ধার দিকে লক্ষ্য রেখেছে—কোনোরকম কুলক্ষণ দেখা যায় নাকি। বৃদ্ধা লাকিয়ে-লাকিয়ে এগোচ্ছেন। চোখদুটো গাছপালার ডগার দিকে। নিম্পলক দৃষ্টি। মুখের গাম্ভীর্য আছে বটে, কিন্তু তাতে অপ্রকৃতিস্থতা নেই।

মন্দিরতলায় ফাঁকা জায়গা খুব কম। সবত্র বটের খুরি। প্রাচীন ইদারা ঘরে একটা গর্তমতো রয়েছে। তার চারদিকে গুল্ম-লতা। একটুকরো পাথর অশিষ্ট নেই কোথাও। মন্দিরের একটা দেয়াল এবং ত্রিকোণ চূড়ার কিছু অংশ বনের কয়েকটা খুরির মধ্যে আটকে রয়েছে মাত্র। বেদীসহ কালোপাথরের ছোট মূর্তিটি কোন গ্রামে নিয়ে গিয়ে প্রতিষ্ঠার কথা শোনা যায়। কিন্তু সঠিকভাবে স্টেপ করতে পারে না কোন গ্রামে। মন্দিরের মেঝেয় ঝোপঝাড় গজিয়ে রয়েছে। সে দিকে তাকিয়ে কুড়ানি ঠাকরন চোখ বুজে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর হাতে আস্তে বসে মাটিতে লুটিয়ে প্রণাম করলেন।

দেখাদেশি ভয়ে-ভয়ে রঙ্গনাও দাঁড়ানো অবস্থায় একটা প্রণাম করল। মন্দিরবুর কাছে ছাঁটাকায় একটা মস্ত বড় ইংরেজি নভেল পাবে, এই তার হৃদয়ঙ্গম। প্রণামের সময় অবচেতন ভাগিদে

বৃদ্ধ সেবারকার মতো বিশ্রি বকম হাঁউমডি করে কাঁদলেন না বটে, কিন্তু ফোঁস ফোঁস করলেন কিছুক্ষণ। গাছপালার খোঁজ বলে প্রাচীন দেয়াল



ওম আছে। নদীর ওদিকে হাওয়া বেশ উত্তাল। বেলা গড়িয়ে এসেছে বলে সেই হাওয়া শীত ধরিয়ে দেয়। রঙ্গনা বলল, ‘হল? আর কতক্ষণ?’

বৃদ্ধা বললেন, ‘এটা কত সন চলছে রে রনি?’

রঙ্গনা বলল, ‘ইংরেজিটা জানি। বাংলা কে জানে কত!’

‘তেহাত্তর?’ কাঁপা-কাঁপা গলায় বৃদ্ধা প্রশ্ন করলেন। ঘোলাটে চোপের ক্যাকাসে তারা ফেটে বেরিয়ে আসছে যেন।

রঙ্গনা বলল, ‘ইংরেজি! ইংরেজি তিয়াত্তর।’

‘তেরশো বাইশ সনের বোশেখী-পুল্লিমেতে বাবা আমাকে কাঁধে করে এখানে বয়ে এনেছিল।’ বৃদ্ধা সেইরকম নিম্পলক দৃষ্টে তাকিয়ে যেন গাছপালা আর শূণ্য মন্দিরকে গল্প শোনাচ্ছেন। ...‘ভাগরপানা চাদখানা উঠেছিল ওইখানে। বড় জল তেষ্ঠা পেয়েছিল। ইঁদারার জলটায় গন্ধ। তাই বাবা গেল নদী থেকে জল আনতে। আমি বসে আছি। পাশে লণ্ঠন জ্বলছে। কেউ কোথা নাই। তাপরে...’

রঙ্গনার গা ছমছম করছিল এই জনহীন বনের ভেতর। কয়ালীর ভিটে নিয়ে অসংখ্য হুতের গল্পও সে ছোটবেলা থেকে শুনেছে। যত শিগগির চলে যেতে পারে, তত ভাল। ঠাকমার কথা কেড়ে সে বলল, ‘ও ঠাকুমা! বাড়ি গিয়ে শুনব। তুমি ওস এবার। বাসটা এক্ষুনি ফিরে আসবে।’

বৃদ্ধার চোখ থেকে জল পড়তে লাগল। ‘অ। বাস আসবার সময় হল বুঝি?’

‘হবে না? তুমি এবার ওস।’

বৃদ্ধা করুণ মুখে বলল, ‘উঠি। :আমায় ধরদিনি-এটুখানি।’ রঙ্গনার সাহায্যে উঠে দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক তাকিয়ে ফের বললেন, ‘তদগু থাকতে বড় ইচ্ছে করে। তোর ঠাকুদা বেঁচে থাকতে পায়ের মাথা ভেঙিচি, ওগো, একবারটি আমার মায়ের থানে নিয়ে চলো।’ সে বড় পাষণ্ড মানুষ ছিল—তোর ঠাকুদা।’

রঙ্গনা পা বাড়িয়ে বলল, ‘আমি দেখিনি।’

‘তুই তখন কোথা যে দেখবি?’ বৃদ্ধা একটু হাসলেন। ‘তোর বাবাকে যদি বলতুম, ও গউর, আমায় এখানে নিয়ে যা বাবা! গউরের আর সময়ই হত না—মুখে বলত, যাব। রনি, তোর মনে বড় দয়া। তাই তুই কতকাল পরে মায়ের ভিটেতে আমায় এনেছিলি। আজ আমার নিয়ে এসিছিস! তোর ভাল হবে দেখবি। আশীর্বাদ করছি। ওই জ্বাখ, মাও কচ্ছেন, তোর খুব ভাল হবে। বড় স্বরে বে হবে। সোনার চাঁদ ছেলে প্রসব করবি।...’

রঙ্গনা রাগ করে বলল, 'নাও, শুরু হল ! ফিরে গিয়ে ছটা টাকা দেবে, বাস !'
কুড়ানি ঠাকরুণ জ্রাচ ঠকঠক করে পা বাড়িয়ে বললেন, 'দোব ! তুই নক্ষি
মেয়ে !' তারপর হঠাৎ ঘুরে কান পেতে কিছু শোনার ভংগিতে বললেন, 'অই !
অই !'

রঙ্গনা ভড়কে গিয়ে বলল, 'কী ? কী ঠাকুমা ?'

বৃদ্ধা চুঃখিতভাবে একটু হাসলেন । 'এখানে আসাঅদি খালি কানে শব্দটা
বাজছে—কনক ' কনকলতা রে !'

বিস্মিত রঙ্গনা বলল, 'কনকলতা মানে ? ও ঠাকুমা, কনকলতা মানে কী ?
কে সে ?'

'আবার কে ! বাবা ওই নামে ডাকতেন !'

'তোমার নাম কনকলতা নাকি ?' রঙ্গনা হেসে উঠল । 'কী সুন্দর নাম গো
তোমার ' কিন্তু আমরা যে জানি কুড়ানি ঠাকরুণ ! ব্যাপারটা কী ?'

'আমার শাউড়িঠাকরুণ বড় হেনস্তা করতেন । তোর ঠাকুদার ভয়ে সামনে
কিছু বলতেন না । আড়ালে কতরকম মাগী-টাগী গালমন্দ করতেন । বলতেন,
অ কুড়ুনির বেটি কুড়ুনি ' সেই থেকে 'ওই নামই বহাল হল ।'

'ঠাকুর্দা কী নামে ডাকতেন ?'

'শূলতা বলে ডাকতেন ।'

দুজনে ফিরে যেতে-যেতে এইসব কথা হল । রঙ্গনা এবার ঠাকুমার কাঁধ ধরে
হাঁটছিল । একটু তফাতে নিচে নদীর জলে এখন ছায়া পড়েছে । দূর থেকে
পাশ্পিং মেসিনের চাপা ধক ধক শব্দ ভেসে আসছে । নদীর ওপারে ঘন সবুজ
গম-সরিষার ক্ষেত । এখানে-ওখানে লোকজন চোখে পড়ে ।

পাকা রাস্তায় উঠতে খুব কষ্ট হল । ঠাকুমাকে প্রায় টেনে হিঁচড়ে রঙ্গনা
বাস্তায় ওঠাল । রাস্তার কিনারায় কাঁচা অংশে ঘাসের ওপর বসে কুড়ানি ঠাকরুণ
হাঁকাচ্ছিলেন । রঙ্গনা জানে, বাস ফিরতে এখনও ঘণ্টাখানেক দেরি হবে । সদর
শহর থেকে আসবে বাসটা । ততক্ষণে অন্ধকার হয়ে যাবে । এখনই সবখানে
কুয়াসা জমে গেছে । তবে রাস্তা নির্জন নয় । মাঝে মাঝে বিকশো বা ট্রাক
আনাগোনা করছে ।

রঙ্গনা ঠাকুমার গায়ে তাঁর চাদরটা ভাল করে জড়িয়ে দিয়ে বলল, 'এবার
থেকে তাহলে তোমায় কনকঠাকুমা বলব ।'

বৃদ্ধা জোরে মাথা নেড়ে বললেন, 'না না ।'

'আচ্ছা ঠাকুমা ! দিদি বা দাদা তোমার আসল নাম জানে ?'

‘কেউ জানে না। কাকপক্ষীটিও না।’...বৃদ্ধা আবার একটু হাসলেন।
‘কাকেও বলিনি ভাই, কী দরকার? কেবল তোকেই বললুম।’

‘ঠাকুমা, তোমার বাপের বাড়ি কোথায় ছিল গো?’

‘বাপের বাড়ি? বাঁকা-ছিরামপুর চিনিস কোথা?’

‘উহ। কোথায়?’

কুড়ানি ঠাকরুন মুখ নামিয়ে ঘাস ছিঁড়তে লাগলেন। মুখে একটা কালো ছায়া পড়েছে। রক্তনা ডাকলে আস্তে বললেন, ‘তিনিছি নিমতিতের উদিকে কোথা যেন। কেউ সঠিক করে বলতে পারে না।’

রক্তনা স্তম্ভিত হয়ে গেল। এই বৃদ্ধার কোলে সে একরকম মানুষ হয়েছে। শৈশবে মায়ের মৃত্যুর পর ঠাকমাই ছিলেন তার মায়ের মতো। অথচ আশ্চর্য, সে কোনোদিন ঠাকমাকে তাঁর জীবন, তাঁর অতীত সম্পর্কে একটাও প্রশ্ন করে নি। একটু পরে রক্তনার মনে হল এটাই তো স্বাভাবিক। বাড়ির লোকেদের অতীত কথা কেই বা শুনতে চায়। ওঁরা নিজেরা যেটুকু বলেন নিজে থেকে, সেইটুকুই। ঠাকুমা না ঠাকুমা। এত আপন, এত কাছের মানুষ—তার বাইরের অস্তিত্ব কেউ কল্পনা করতেও পারে না।

রক্তনা হুঃখিতভাবে বলল, ‘সে কা! তুমি বুঝি বাপের বাড়ি বিয়ের পর আর যাওনি?’

‘না। কেউ নিয়ে যায় নি। বললুম না, তোর ঠাকুদা ছিল পাষণ মানুষ।’

‘কী আশ্চর্য! তুমি লুকিয়ে গেলেও পারতে। আমি হলে তাই করতুম!’

‘তোরা একালের মেয়ে। তোদের কত সাহস কত জোর! তাছাড়া আমি খোঁড়া-খঞ্জ মানুষ, ভাই।’

রক্তনা একটু চুপ করে থাকার পর বলল, ‘তাই বলে তুমি এটুকুও জানবে না, বাঁকা-ছিরামপুর না কী বললে, সেটা ঠিক কোথায়?’

বৃদ্ধা হাসলেন। ‘খোঁড়া হয়ে মায়ের পেট থেকে জন্মেছিলুম। বাড়ির বাইরে কি কখনও গেছি? তাছাড়া বাবা এই খানে যখন নিয়ে এল, তখন বয়সই বা কত? তেরো-চোদ্দর বেশি হবে না। খোঁড়া বলে বে হচ্ছিল না, তা জানিস?’

বক্তনা অবাক হয়ে বলল, ‘তখন ঠাকুদা অতটুকু মেয়ের বিয়ে হত?’

‘আটবছর-দশবছর বয়স হলেই বর খুঁজতে বেরুত লোকে।’

‘বলো কী।’ রক্তনা হাসতে লাগল। ‘হ্যাঁ গো, তখন ঠাকুদার বয়স কত ছিল?’

বৃদ্ধা মুখ নামিয়ে দ্বিধাজড়িত গলায় বললেন, ‘সে-হিসেব কি জানি ? তখন সোমস্ত পুরুষ । পেলায় যোয়ান । তা আমার ডবল বয়েস তো হবেই ।’

রজনী আরও হেসে বলল, ‘তা যাই বলে—ঠাকুর্দাকে পাষণটাবাণ করছ বটে, কিন্তু ওঁর উদারতার প্রশংসা করছ না । তোমার মতো প্রতিবন্ধী মেয়েকে বিয়ে করে ঠাকুর্দা খুব বড় মনের পরিচয় দিয়েছিলেন ।’

বৃদ্ধা হাঁ করে কথাগুলো শুনলেন । কিন্তু কিছু বুঝতে পারলেন না । বললেন, ‘আমার শাউড়ি ঠাকরুন আমায় অ-জাত কু-জাত বে-জাত বলে খোঁটা দিতেন । কেঁদে কেঁটে বলতুম, বিশ্বাস করো মা, আমি কায়েতের মেয়ে । অমনি মূড়া ঝাঁটা তুলে বলতেন, বেরো, বেরো । বামুনের জাত মেরে আবার কথা হচ্ছে ?’

রজনী চঞ্চল হয়ে হাততালি দিল । ‘ঠাকুর্দা বেঁচে থাকলে কনগ্রাচুলেশান জানাতুম ! ভাবা যায় ? অসবর্ণ বিয়ে করে গেছেন ভদ্রলোক !’

অশ্রমনস্কভাবে কুড়ানি ঠাকরুন বললেন, ‘অনিকে কতবার বলেছি—অপু.কেও বলেছি, একবার বাঁকা-ছিরামপুর ঠিক কোথা একটু খোঁজখবর কর । শোনে নি । বলেছে, সেখানে কী আছে ? তবে আমারই দোষ, ভেতরের কথা খুলে তা বলি নি । বললে হয়তো খোঁজ করত ।’

‘বাবাকে বলে নি কেন ?’

‘গউর ? তাকে বলতে নজ্জা হত ভাই । বড় নজ্জা হত ।’

‘সে কী ! নজ্জা কিসের নিজের ছেলেকে ?’

‘রনি ! জাতের খোঁটা বড় খোঁটা । গউর জানলে দুঃখ পেত । তাই কিছু বলিনি ।’

রজনী রাগ দেখিয়ে বলল, ‘বড় অদ্ভুত মানুষ তুমি ! আজ হঠাৎ আমার বললে যে ?’

‘বললুম ।’ বৃদ্ধা একটু চুপ করে থাকার পর ফের বললেন, ‘মা বললেন, তাই বললুম । আমার বোধ হয় ডাক এসেছে, তাই মা কাল রাত্রির থেকে স্বপন দিচ্ছেন খালি । তাই তোকে বলে গেলুম । রনি ! তোর হাতে ধরে বলছি, এসব কথা কাকেও যেন বলবিনে ভাই ।’

রজনী কী বলতে যাচ্ছে, একটু তফাতে ব্রিজের ওপর একটা মোটরগাড়ি এসে দাঁড়াল । আসন্ন সন্ধ্যার ধূসরতা ক্রমশ ঘন হয়েছে । গার্ডির হেডলাইটে চোখ ধাঁধিয়ে গেল । কুড়ানি ঠাকরুন হকচকিয়ে বললেন, ‘অই ! বাস এল বুঝি ?’

রজনী বলল, ‘বাস ওদিক থেকে আসবে নাকি ? ওদিকে তো বসন্তপুর । বাস আসবে এদিকে থেকে ।’

‘লেট কল্লে তাহলে।’

মোটরগাড়িটা ফের স্টার্ট নিয়ে এগিয়ে এল। রঙ্গনাদের পাশে দাঁড়াল। রঙ্গনার বুকটা ধড়াস করে উঠল সঙ্গে সঙ্গে। সে বিহ্বল দৃষ্টে তাকাল গাড়িটার দিকে।

গাড়ি থেকে নেমে এল শতদ্রু। ‘নমস্কার। আপনি রঙ্গনা না?’

রঙ্গনা চিনতে পেরে মুহূর্তে খুশি হয়ে বলল, ‘বেড়াতে বেরিয়েছেন বুঝি?’
বিয়াসদি আসে নি?’

‘ওর শরীরটা ভাল না।’ শতদ্রু বলল। ‘তা আপনারা এখানে কী কবছেন সন্ধ্যাবেলা?’

‘ঠাকুমাকে নিয়ে করালীর থানে এসেছিলুম। বাসের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছি।’

‘আমুন।’ বলে শতদ্রু কুড়ানি ঠাকরনের দিকে তাকাল। ‘ওঁকে দরতে হবে বুঝি? আপনি উঠুন—আমি দেখছি।’

কুড়ানি ঠাকরন হতবাক হয়ে গেছেন। রঙ্গনা বলল, ‘বিয়াসদির দাদা। বিলেতে থাকেন...’

‘নেটটে।’ শুধরে দিল শতদ্রু।

রঙ্গনা হাসল। ‘...ঠাকুমাব কাছে বিলেতই এনাক। ওই ঠাকর, তোমার কপাল! আসলে তোমার মা করালীই তোমার জ্ঞাত গাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছেন।’

রঙ্গনার সাহায্যে বুদ্ধা উঠলেন—তখনও হতচকিত অবস্থায়। গাড়িতে ঢুকিয়ে দিলে সিঁটিয়ে বসে রইলেন। জীবনে বাসমোটরে ছুঁচারবার চেপেছেন। এমন গদিআটা গাড়িতে চাপেন নি। বঙ্গনা দেখল, তার ঠাকমা হাত বলিহে গদি পরখ করছেন।

শতদ্রু বলল, ‘আপনি সামনে অসুন না। কথা বলতে বলতে যাই।’

রঙ্গনা আন্তে বলল, ‘থাংকস। ঠাকুমা হয়তো অস্বস্তি বোধ করবেন একা।’

শতদ্রু বলল, ‘তাই বটে। ঠিক আছে।’

গাড়ি সামনে এগোচ্ছে দেখে রঙ্গনা একটি চমকাল। আমবা উন্টোপিকে যাচ্ছি।’

‘ভাববেন না। ঠিক পৌছে দেব। শতদ্রু হাসতে হাসতে বলল। ‘এই সুন্দর সন্ধ্যায় একটু চকর দিয়ে আসতে দোষ কী? বাসের আলো সামনে দেখলেই গাড়ি ঘোরাব।’

শেষ অব্দি ভালই লাগল রঙ্গনার। কিন্তু এমন প্রচণ্ড গতিতে গাড়ি চলেছে

দেখে তার বুক টিপটিপ করছিল। মাঝে মাঝে লরি আসছে চোখে আলো ফেলে।
পলকে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে। প্রতিবারই প্রাণের আশা চেড়ে দিচ্ছে বঙ্গনা।
শেষে বলল, 'ইস। ভীষণ জোরে গাড়ি চালাতে পারেন দেখছি।'

'আমেরিকার বাস্তা আরও চওড়া। একমুখো। তাছাড়া গাড়িগুলোও
দারুণ। সেই অভ্যাস।' শতজ্ঞ আমেরিকার গল্প ছুড়ে দিল। বঙ্গনাকে
আকৃষ্ট করার ইচ্ছায় সে চঞ্চল হয়ে উঠেছে। আর এদিকে রঙ্গনারও ক্রমশ
স্থিতি কেটে বাচ্ছিল। সে অসংখ্য প্রশ্ন করতে থাকল। বইতে পড়া বিবরণের
সঙ্গে মিলিয়ে নেবার ইচ্ছা। কুড়ানি ঠাকরণ কাঠ হয়ে বসে আছে। কোনো
সাদাশব্দ নেই।...

বইচোর

মধুরবাবু আজ খুব সমস্তায় পড়েছিলেন।

সারাদিন আকাশ মেঘলা ছিল। তারপর সন্ধ্যার দিকে হাওয়া উঠেছে কেঁপে। সেইসঙ্গে টিপ টিপ বৃষ্টি। উত্তরের হিম হাওয়ার সঙ্গে এই টিপ টিপ বৃষ্টিকে স্থানীয় লোকে বলে পউষে বাদলা। বসন্তপুরের বাজার এলাকা। তবু প্রায় জনশূন্য হয়ে গেছে। দোকানপাটের বাঁপ পড়ে গেছে সাত-তাড়াতাড়ি। শুধু চায়ের আড্ডা, হোটেল, সিনেমাঘরের আনাচে-কানাচে আমরা লোকেরা গুড়ে মাছি আটকে যাওয়ার মতো দাঁটে আছে। রাস্তায় সার হয়ে দাঁড়িয়ে আছে কয়েকটা প্রকাণ্ড ট্রাক। সর্দারজীরা ট্রান্সপোর্ট কোম্পানির অফিসের চত্বরে আটচালায় খাটিয়ায় বসে দারু পান করছে। পাশে গরম মাংসের ঝোল আর ইয়া মোটা চাপাটি

মধুরবাবুর আগের দিনটা স্বেথের ছিল। আজ এমন দিনটা হুংথের। পয়সাকড়ি ফরিয়ে গেছে তেবন্তের কামারশালে সন্ধ্যা নাগাদ গাঁজার আসর বসে। হেমন্ত আজ সন্ধ্যাতেই বাঁপ বন্ধ করে গুতে গেছে। মধুরবাবু শেয়ালভেজা হয়ে বাজারের এদিকে-ওদিকে হোক-হোক করে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। একটা জাতি অবশ্য আছে। কিন্তু হাওয়ার দাপটে খালি উণ্টে যায় সেটা।

আবগারিব দোকানে আর ধার মেলে না। কুবের শা মধুরবাবুকে দেখলেই টাৱা চোখে তাকিয়ে ‘লন, ‘পয়সাটা?’ দেড় টাকা বাকি। ‘পয়সা’ বলেন এও মধুরবাবুর বাপের ভাগি। পয়সা থাকলে হডু মুচির মারকত মাল আনিয়ে নেন। টের পান না শা মশাই।

এই কাল-সন্ধ্যায় হডু পেট্রোল পাম্পের পাশে তার ঝোপড়িতে ঢুকেছে। তেরপলের তাঁবুতো আস্তানা। হাওয়ায় খরখর করে কাঁপছে। মধুরবাবু টের পান, ফুটোয় চোখ রেখে হাওয়ার গতিক ঝাঁচ করছে হডু। তার জগ্ন মনে কষ্ট হয়। আহা, পৃথিবীতে কত মানুষের কত রকমের দুঃখদুর্দশা।

মধুরবাবুর হসাং মাথায় এল সিঙ্গিবাড়ির শতজ্বর কথা। ছোকরা তো মার্কিন নুস্তুকে থাকে। সেখানে নাকি হরেকরকম শুকনো নেশার ছড়াছড়ি। হেরোইন, মারিজুয়ানা, এল এস ডি। এদেশের বড়লোকের ছেলেরাও সেই রাস্তা ধরেছে। ধরবেই তো। সায়েবরা মাথায় লঙ্গা চুল রাখলে নেটিবরাও রাখবে। ওরা সখ

করে ছেঁড়া পাতলুন পরলে এরাও পরবে। আর ওই যে হিপি-হিপি করছে, আরে বাবা, হিপিই বলো, লম্বা চুল বলো, ছেঁড়া কাপচোপড় বলো, জাংটা-আধজাংটা হওয়া বলো—সবই আগে ভারতে, তারপর সায়েবদের দেশে। কী বোকা এদেশের লোকেরা ভাবা যায় না।

মনে-মনে শতজ্বর সঙ্গে এইসব তর্কাতর্কি করতে-করতে সিঙ্গিবাড়িন গেটে পৌঁছে দেখলেন গেট বন্ধ। দারোয়ান জঙ্গ বাহাদুরও কোন গর্তে সেপিয়েছে। শতজ্বকে ছেড়ে কেঁট কন্ট্রাকটারের মুণ্ডপাত করতে-করতে মধুরবাবু হতাশ ও ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফিরলেন।

বাড়িটা বিরাট। বসন্তপুরে বরাবর বনেন্দী বড়লোকের বাস। মধুবাবু এ বাড়ির আশ্রিত। কমলাক্ষ ভটচায় তাঁর অতি দূর সম্পর্কের মামা। ভটচায়রা পুরুষাঙ্কুরে সেবায়ত্তী এবং যজ্ঞমানী বৃত্তি অবলম্বন করে এসেছেন, কমলাক্ষের আমলে তা পরিত্যক্ত হয়েছিল। কমলাক্ষের বয়স এখন প্রায় সত্তরের কাছাকাছি। এখনও খুব শক্তসমর্থ মানুষ। স্থানীয় স্কুলে জাদরেল হেডমাস্টার ছিলেন। বইপড়ার প্রচণ্ড নেশা। বাড়িতে বেশ বড় আকারে একটা পারিবারিক লাইব্রেরি গড়ে তুলেছিলেন। নিচের হলঘরে আলমারি ভর্তি বইয়ের যত্ন-আত্তি এখনও করেন। ক'মাস আগে একটা আলমারি ভেঙে অনেক বই চুরি গেছে। সেই থেকে হলঘরে কাকেও ঢুকতে দেন না। কড়া নজর রাখেন। তবু তাঁর অগোচরে প্রায়ই একটা করে বই চুরি হচ্ছে। চোর যে ঘরের মানুষ, তাঁর মাংস এখনও ঢোকে নি।

বাড়ি যেমন বড়, লোকজনও প্রচুর। চার ছেলে, তাদের বউ, নতি-নাতনি নিয়ে বৃহৎ একাদ্বর্ভী সংসার। এমুগে এমন সংসার দেখা যায় না তবে কমলাক্ষের মৃত্যু হলে কী হবে, অনুমান করা সোজা।

খিড়কির দরজার পাশেই পাঁচিল, তার ওদিকে খানিকটা অগাছাভরা পোড়ো জায়গা। কেউ জানেনা, ঝোপের ভেতর একটা চাষবাসের ছোট্ট মই লুকোনো আছে। মইটা মধুরবাবু চাষীপাড়া থেকে সংগ্রহ করেছিলেন বাড়ি ফিরতে রাত হলে মইটা কাজে লাগে। পাঁচিল থেকে জবাগাছের প্রকাণ্ড ঝাড়ে পা রেখে নামেন। তারপর দরজা খুলে বেরিয়ে মইটা যথাস্থানে রেখে আসেন।

খিড়কির দিকের উঠোনটুকু ঠাকুরদালানের। এ পরিবারের পূজা গৃহদেবতা সিংহবাহিনী আত্মীয় দেবী। এ অঞ্চলের সব দেবদেবীর ইনিই নাকি অধীশ্বরী। তাই ভটচায়দের অনেকে অনেক স্থানীয় দেবীর পূজোআচ্চা এবং সেবায়ত্তীও করেছেন, বংশে দোষ ঢোকে নি কোনোকালে। কিন্তু শোনা যায়, ঈশানপুরের

মাঠে নদীর ধারে প্রাচীনা এক দেবী করালীর সেবায়ত্তী করতে গিয়ে কমলাক্ষের জ্যোতামশাই বেণীমাধব গৃহদেবীর কোণে পড়েন। তাঁর মুণ্ডহীন দেহ উদ্ধার করা হয় করালীর থানের ইদারা থেকে। এ ঘটনা প্রায় ষাট বছর আগেকার। কমলাক্ষের তখন সবে হাঁটি-হাঁটি দশা। সঠিক কী ঘটেছিল কেউ বলতে পারে না। জনরব আছে, দেবী করালীর সামনে প্রণামরত বেণীমাধবের মুণ্ডচ্ছেদ করেন দেবী অত্রেয়ী এবং মুণ্ডটি নিজে গ্রহণ করে দেহটি অধীনস্থ করালীকে অস্থকম্পা-ভাবে দান করেন। দেবী করালীও কম নন। ঘৃণা ভরে সে-দেহ প্রত্যাখ্যান করেন এবং লাথি মেরে ইদারায় নিক্ষেপ করেন। তারপর মনের দুখে সেই দেবী করালী নিরুদ্দিষ্ট হয়ে যান। তাঁর বিগ্রহ আর কেউ খানে দেখেনি সেই থেকে।

জনরবের আর একটু গোপন অংশ আছে। বেণীমাধব নাকি দেবী করালীর ভিটেতে প্রচুর ধনরত্ন পেয়েছিলেন। সেই টাকায় রাতারাতি ভটচাষপরিবারের আত্মুল ফুলে কলাগাছ হয়েছিল। এত বড় বাড়িটা তিনিই রেখে গেছেন। কমলাক্ষবাবা সত্যহৃন্দর তো চির-রুগী মানুষ ছিলেন। খেঁটে কাষায় বস্ত্র পরে ঘুরতেন। গ্রাড়া মাধায় একটি দীর্ঘ শিখা, পেটের রোগের কারণে হাতে সবসময় গাড়ু। জমিদার সিদ্ধির ভাণ্ডার কাজে জৈবকর্মে যেতেন এবং নাকি প্রতিদিন একটা করে ইট হাতে বাড়ি কিরতেন। একদিন সিদ্ধিরা হাতে-নাতে ধরে খুব অশ্রমান করেছিলেন। তারপর সত্যহৃন্দরের দাদা বেণীমাধব প্রতিজ্ঞা করেন, সিদ্ধিদের চেয়ে বড় দালানবাড়ি না বানিয়ে জলম্পর্শ করব না।

মধুরবাবু ঠুন্দের কাউকে দেখেন নি। তাঁর বয়স প্রায় বাহান্ন বছর। ধানবাদের এদিকে রেল টিকিটদেকার থাকার সময় তুচ্ছ কারণে চাকরি যায়। চিরকুমার মানুষ। এখানে-ওখানে হস্তে হয়ে শেষে বসন্তপুরে আশ্রয় নেন। কমলাক্ষ টের পেয়েছিলেন, এই ভাগ্নেবাবাজীর গাতক সুবিধের নয়। বাড়ির বাজার করা, সাংসারিক হাজারটা কাজে সহায়তা, কখনও কাচ্চা-বাচ্চাদের পড়ানো—এসব কাজে প্রচুর ফাঁকি দিতেন মধুরচন্দ্র। শেষে তাজবিরকৃত হয়ে তাঁকে রেহাই দওয়া হয়েছে। এ বাড়ির লোকেরা এখন আড়ালে বলে, শিবের ষাড়। কানে এটাও হজম করতে হয় মধুরবাবুকে। বাইরে লোকের কাছে বলেন, ‘আখায় না, সাথে ফুঁ আর কানে ফুঁ দেওয়া বংশ তো। বরাবর সেবায়ত্তী সম্পত্তি পরহস্তে খেয়ে ফুলে ঢাক হয়েছে। রোসো না, বুড়ো টেঁসে থাক—কী হয় দেখবে।’ তাসের ঘর হুড়মুড় করে ধসে যাবে—হঁ বাবা!’

পউষে বাদলায় সাত-সক্কেয় খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেছে টের পেলেন মধুরবাবু।

ঠাকুরদালানে মিটমিটে বাষ জলছিল। কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকলেন খাপটি মেরে। এমন একটা রাতে মৌতাত হল না—দুঃখে প্রাণটা কাতর হয়ে গেছে।

খামের আড়ালে চোখ বুজে খন্টাখানেক পড়ে থাকার পর বাড়ি যখন স্নমস্নম হয়ে গেল, তখন ছাতিটা বগলদাবা করে পা টিপে টিপে বেরলেন।

টানা বারান্দার পর ভেতর বাড়ির দরজা। দরজা আটকানো আছে। বাঁয়ে হলঘর। খড়খড়ির জানালা। ছাত্তির ডগা দিয়ে খড়খড়ি তুলে ভাঙা জায়গাটা দিয়ে হাত ভরে একটা পাট সাবধানে খুললেন।

একটা মরচেধরা গরাদ অনেকদিন আগে থেকে আলাগা করে রেখেছেন। ওপরে চৌকাঠটা রেখেছেন ফাটিয়ে। নিচের দিকটা ঠেলে তুলতেই সেটা উঠে গেল। তখন গরাদটা টেনে বের করে দিলেন। এই পথেই একবার বাউরি পাড়ার বংকার সাহায্যে এক বস্তা বই চুরি করে বেচে এসেছিলেন কলকাতায়।

রোগা পাঁকাটি গড়ন। গলিয়ে যেতে অস্ববিধা হয় না মধুরবাবু। অন্ধকার হলঘরে ঢুকে কিছুক্ষণ শ্বাস চেপে দাঁড়িয়ে রইলেন। কদিন থেকে মফেজ হোসেন দপ্তরী এসে পুরনো বই আর মাসিক পত্রিকা বাধিয়ে দিচ্ছে। মঝের গাতুড়ি, ছেনি, ময়দার লেই, স্ততোর গুটি, শিরিস কাগজ, চামড় এসব কবেক জিনিস পড়ে আছে। পায়ে লাগলে শব্দ হবে। পকেট থেকে দেশলাই বের করে জ্বালতে গিয়ে দেখলেন, ভিজে চুর হয়েছে। এদিকে নিজেরও 'চিমখাওয়া' ভজা শরীরে নিঃসাড় অবস্থা। ঘরের ওমে কিছুটা ধাতস্থ হয়েছেন মাত্র।

হাঁটু গেড়ে হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে গিয়ে বুকটা বড়াস করে উঠল। একগাদা বই হাতে ঠেকেছে। হাত বুলিয়ে বুঝলেন, ভারি একটুকরো পাথর চাপিয়ে রেখে গেছে মফেজ দপ্তরী।

একখানা বইয়েরই ওজন কম নয়। তাই সঠি। কথাই বলে, চারের কপনিটুকুও লাভ।...

কিছুক্ষণ পরে মধুরবাবু যখন আগাছার জঙ্গল থেকে পোরয়ে পুরনোপাড়ার পথে হাঁটছেন, তখন পটম্বে বাদলার আরও জোর বেড়েছে। মাথার ওপর গাছপালা এবং ছাতিটা থাকায় তাকে আয়েল করতে পারছে না বাদলাটা।

কালু মুখঘোর ভিটেয় ঢুকে দেখলেন, টিনের কপাটের ফাঁকে আলো নজর হচ্ছে। মূহু ধাক্কা দিতে দিতে কাঁপা-কাঁপা গলায় ডাকলেন, 'বান! অরনি! রনি মা!'

অপরূপা পাশের ঘরে শুয়ে পড়েছে। অন্ধকারের দরজা তখনও খোলা। কুড়ানি ঠাকরনের গুতে অনেক দেবি হয়। কদিন থেকে বজ্রন! তাব কাছ

ঘেঁষে ঘুরছে। তাঁর কাছেই শুচ্ছে। কুপি জ্বলছে দরজার চৌকাঠের কাছে। কুড়ানি ঠাকরুন পাশে ছুঁপা ছড়িয়ে বসে বৃষ্টির শব্দ শুনছিলেন। রজনী সামান্য তফাতে বসেছে বিছানার পায়ের দিকটায়। মেঝের বিছানা করেই শোন ঠাকরুন। কুপির শিশ হাওয়ায় ঘুরে কেবল নাকে এসে ঢোকে। তাই রজনী কুপির একটু দূরে স্থান নিয়েছে। বিছানার পায়ের দিকে উপুড় হয়ে সে ভার্জিনিয়া উলফ পড়ছে। বইটার টাইটেলপেজ স্বদ্ধু মলাট ছেঁড়া। এটাই মধুরবাবুর কাছে ৩টাকায় দরাদরি করে কিনেছিল সে।

কুড়ানি ঠাকরুনের কান এখনও পাতলা। চমকে উঠে বললেন, ‘অই! অই!’

রজনী বইয়ের পাতায় চোখ রেখেই বলল, ‘উ?’

কুড়ানি ঠাকরুন নড়বড় কবে ওঠার চেষ্টা করে গলা চেপে বললেন, ‘অই গো। অনি এসেছে নাকি।’

রজনী চমকে উঠে তাকাল। ‘দাদা? কই? কোথায়?’

‘ডাকছে। ওহ শোন।’ ঠাকরুন আরও গলা চেপে বললেন, ‘স্বাস্থ্য বড় হয়ে গেছে। তারাতুটো ঠেলে বেরুচ্ছে যেন।’

রজনী বুড়মুড় করে উঠে পড়ল। পাশের খরের দরজায় দিকিকে ব্যস্তভাবে ডাকতে থাকল। কোনো সাড়া পেল না। অপরাধ গভীর ঘুমে তলিয়ে গেছে। তখন রজনী দৌড়ে বৃষ্টির মধ্যে উঠোন পেরিয়ে টিনের দরজাটা খেঁচ খেঁচে, মধুরবাবু ঢুকে পড়লেন।

রজনী তখনও চিনতে পারে নি। লম্পের আলো এতদূর পৌঁছয়নি—বারান্দার পায়ের আড়ালে রয়েছে। দরজা আটকে সে বলল, ‘কোথেকে এলে এভাবে? কোথায় ছিলে এ্যাটর্নি?’

মধুরবাবু বারান্দায় গিয়ে উঠেছেন বিনা বাক্যব্যয়ে। রজনী যথেষ্ট ভিজ়ে এসে যখন দেখল মধুরবাবু—দাদা নয়, তখন সে প্রথমে বিরক্ত হয়ে পরমুহুর্তেই হাসিতে ভেঙে পড়ল।

মধুরবাবু কুড়ানি ঠাকরুনকে প্রায় ডিঙিয়ে ঘরে ঢুকে রুদ্ধশ্বাসে বললেন, ‘ক্লোজ দা ডোর। ক্লোজ দা ডোর—ইমিজিয়েটলি!’

রজনী ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে মৃদু হাসে দেখছেন। রজনী দরজা বন্ধ করল না। বলল, ‘বই এনেছেন মধুর কাকা? কী বই, দেখি—দেখি।’ সে বইটা প্রায় ছিনিয়ে নিল। স্বন্দর ও মজবুত বাঁধানো প্রকাণ্ড বইটার গন্ধ শুকনো আগের। সত্য বাঁধানো বলে গন্ধটা তার মনোপূত হল না। বইয়ের গন্ধ তার কী যে ভাল লাগে। খুলে দেখল, প্রবাসী পত্রিকা।

মধুরবাবু মেঝের বসেছেন এবং হু হু হা হা শব্দে কাঁপছেন। রজনী লম্পের আলোয় ঝুঁকে পড়ল বইয়ের পাতায়। রবীন্দ্রনাথের রাশিয়ার চিঠির কিস্তি, আবার তাঁরই কবিতা। অভ্যাসমতো দ্রুত চোখ বুলোচ্ছিল রজনী। মধুরবাবু অতিকষ্টে বললেন, ‘বেশি চাইব না মা। দুটো—মাস্তার দুটো টাকা এখন দে। পরে যা হয় কিছু দিবি। আর শোন, লুকিয়ে পড়বি। কেউ যেন না দেখতে পায়। আর মা রনি, যদি এক কাপ চা খাওয়াতে পারিস, প্রাণভরে আশীর্বাদ করব মা!’

রজনী বই বুজিয়ে রেখে হাসিমুখে তাকাল। ‘...চা? ঠাকুমা, একটু চা করা যায় না? উল্লে নেই?’

কুড়ানি ঠাকরুন গুম হয়ে বললেন, ‘আঁচ নিভে গেছে। দুধও নেই, বাছা!’

‘হু।’ নিরাশ গলায় মধুরবাবু বললেন, ‘তা একটুখানি কাঠকুটো জেলে চা কি করা যায় না? রনি, টোটাল প্রাইস বরং একটা টাকা ধরেই দেব’ধন। বড় ঠাণ্ড, মাদার! শেয়ালভেজা ভিজিছি!’

রজনী বলল, ‘দেখছি। তবে দুধ নেই যে!’

‘কটাই খাব। প্রিজ মাদার রজনী!’ দুঃখিত মুখে হাসলেন মধুরবাবু গোস্থানী

সন্ধ্যার শেষে রান্নাঘর। রজনী কুপি হাতে বেরুল। অন্ধকারে মধুরবাবু আর কুড়ানি ঠাকরুন চুপচাপ বসে আছেন। একটু পরে বুদ্ধা গলা ঝেড়ে নিয়ে ডাকলেন, ‘বাবুমশাই!’

‘বলুন বুড়িমা!’

‘...এই হাক... এই লোকটিকে কয়েকবার দেখেছেন। রজনীকে বই বেচে যান। তাই নামটাও শোনা আছে। খজ মাহুদ—বিশেষ করে তাঁর মতো স্ত্রীলোকের জীবনের গুপ্তী চিরদিন খুব সীমাবদ্ধ। বড়জোর বাড়ির আনাচ-কানাচটুকু খুঁটিয়ে জানা।। তাঁর বাইরে যাবার স্বযোগও কম এবং গেলে পরে ফাপরে... বড় বান। বললেন, ‘একটা কথা বলতুম আপনাকে।’

মধুরবাবু টাকা এবং চায়ের স্বপ্নে আবিষ্ট। খুশি হয়ে বললেন, ‘বলুন, বলুন’

‘...বলুন... বলুন... আপনি রেলের লোক। রেল গাড়িতে টিকিট পরীক্ষা করতেন...’

‘করতেন বটে।’ মধুরবাবু আরও খুশি হয়ে বললেন।

‘...আপনি তো ঢের-ঢের দেশে ঘুরেছেন।’

‘সুয়েছি ।’

‘নিমতিভের উদিকে বাঁকা-ছিরামপুর চেনেন বাবুমশাই ?’

রেলের লোক বলেই ‘বাবুমশাই’ এই সম্বোধন কুড়ানি ঠাকরনের ।
মধুরবাবু অনেকক্ষণ খোঁজাখুঁজি করে বললেন, ‘নিমতিভের উদিকে বাঁকা-
শ্রীরামপুর ? মনে আসছে আবার আসছে না । একটু ধৈর্য ধরুন বুড়িমা । চা
পেটে পড়লেই মেমরি খুলবে ।’

বাইরে পউবে বাদলার সারাক্ষণ শৌ শৌ ঝির ঝির বিচিত্র শব্দ । বৃষ্টিটা
বেশিক্ষণ চললে ছাদ চুইয়ে জল পড়বে । রক্তনা চা আনল গেলাসে । তারপর
মিষ্টি হেসে বলল, ‘মধুরকাকা, পত্রিকাটা আপনি নিয়ে যান ।’

মধুরবাবুর গলায় চা : আটকে গেল । কাসতে থাকলেন । লালচে চোখের
ঢালা বেরিয়ে : এলন । শিরাবহুল : গলার ওপর ধুকধুকি নডতে দেখা গেল কুপির
আলোয় ।

রক্তনা : তেমনি হাসিমুখে বলল, ‘প্রথম : কথা, পত্রিকা-টত্রিকা আমার তত
ভাল লাগে না ।’

‘অ ।’ মধুরবাবুর মুখ : দিয়ে বেরুল : মনে মনে বললেন, হারামজাদী ! এতক্ষণ
রান্নাঘরে বসে : ভেবে-টেবে এই ঠিক করেছ তাহলে ? হায় ! কোন মুখে যে চা
খাব বলনুম । ঝোঁকের : মাথায় যা হবার : হত ।

রক্তনা বলল, ‘দ্বিতীয় কথা, আমার কাছে এখন একটা পয়সাও নেই ।’

মধুরবাবু বটপট বললেন, ‘পরে দিবি । সকালে দিবি । একটু বেলা হলেই
দিবি বরঞ্চ ।’

রক্তনা নির্বিকারভাবে মাথাটা ছুপাশে দোলাল । ‘বিশ্বাস করুন, নেই ।’

‘সেদিন তো অতগুলো টাকা দেখলুম ।’ মবীয়া মধুরবাবু শেষ চেষ্টা করলেন ।

‘সে তো ঠাকুমার । তাই না ঠাকুমা ?’

রক্তা ওর দিকে একবার তাকালেন মাত্র । মধুরবাবু মেঝের : পাছা ঘষটে
রক্তার কাছে এসে ‘ইউরেকা’ বলার স্বরে বলে উঠলেন, ‘অই-! মনে পড়েছে—
বাঁকা-শ্রীরামপুর পাকুড় স্টেশনের কাছে ।’

রক্তা সন্দেহ স্বরে অস্ফুট বললেন, ‘পাকুড় ! পাকুড় ! নাম শুনিছি : ।’

‘ওদিকে পাকুড়, এদিকে নিমতিভে- ?’ ব মাঝামাঝি ।’

‘বড় গাঁ । জমিদারী কাছারি ছিল ।’ রক্তা বলতে থাকলেন । ‘খুলনপুন্নিমেষে
রালে : মেলা বসত কাছারি বাড়িতে । সে কী : হলদুলাস : সে কী ভিড় ! বাবার
কোলে চেপে মেলায় যেতুম । আর ছিল পেল্লায় পেতলের রথ’ । একশো লোকে

টেনে নড়াতে পারত না। তখন ডাক পড়ত কৈলেসের। কৈলেস ছিল পাহাড় পুরুষ। গায়ে অস্ত্রের শক্তি। মাথায় জটা গজিয়েছিল কৈলেসের। ভাং খেত একবালতি করে। সেই কৈলেস এসে বাবার নামে জয় হেঁকে যেই না দিয়েছে রশিতে হাত, চাকা গড় গড় করে গড়াতে নেগেছে।’

কুড়ানি ঠাকরুন শীর্ণ একটা হাত ছুলিয়ে দিলেন দরজার দিকে—যেন চাকা গড়িয়ে দিলেন প্রাচীন এক রথের। ‘...আমার বাপের গায়ে আর একটা হলুদুলুস ছিল পুণ্যার দিন। পুণ্যা কন্তে জমিদার আসতেন কোন মল্লুক থেকে। শুনিছি, তিনি পদ্মপারের লোক। হাতি চেপে আসতেন। হাতির গলার ঘণ্টা বাঁধা থাকত। আমাদের বাড়ির ছামু দিয়ে হাতি যেত ঘণ্টা বাজিয়ে। আমি তো খোঁড়া-খন্ড মেয়ে। চটকট কতাম। পাড়ার ছেলেমেয়েরা ছড়া গাইতে গাইতে হাতির পেছনে-পেছনে যাচ্ছে, হাতি তোর গোদা গোদা পা। হাতি তুই নেদে দিয়ে যা...’

বুঝা হাসতে থাকলেন। ‘কে নিয়ে যাবে আমায় বলে? বাবা ছেরেস্তাদার মাহুষ। আছেন কাচারিতে। আমার মাকে চোখে দেখিছি বলে মনেও পড়ে না। খাঁচার পাখির মতো ঘরে বন্দী আছি। ওই যে পাখি যেমন ছোলাদানা খায়, বাবা রেঁধেবেড়ে রেখে গেছেন, ক্ষিদে পেলে খাচ্ছি। হঠাৎ হাতির গলার ঘণ্টার শব্দ।’ হঠাৎ যেন ‘যাখায় যা’ খেয়ে চূপ করে গেলেন। বোলাটে চোখের কাকাসে তারা বজবজ করছে জলে।

রক্তনা বাঁধানো পত্রিকাটা ফেরত দেবার আগে স্বেযোগ পেয়ে চোখ বুলিয়ে নিচ্ছিল। এবার ঠাকুরার দিকে তাকাল। মধুর বাবুর চা শেষ। জায়গামতো কোপ বসানোর অপেক্ষায় আছেন। বললেন, ‘সেই বটে, সেই বটে। সেই বাঁকা-ত্রীরাপুর। খুব চিনি, খুব চিনি।’

কুড়ানি ঠাকরুনের চোখ ভিজ়ে গেছে। ক্লান্তভাবে বললেন, ‘তা আমার একবার নিয়ে যেতে পারেন বাবা? আমি আপনার মায়ের মতন। গউর বাঁচলে এ্যাঙ্কিন আপনার বয়সী হত।’

মধুরবাবু সায় দিতে দেরি করলেন না। ‘আলবাৎ নিয়ে যাব। বাঃ, এ কী একটা কথা হল? এ বয়সে বাপের গা যেতে কার না ইচ্ছে করে? এই যে দেখছেন, আমারও অবস্থা কি অগ্ররকম? আমাদের বাড়ি ছিল রামপুরহাটের ওদিকে। প্রাণ কেঁদে যায় মা, বুঝলেন? কিন্তু যাব কোথায়? ভিটেমাটি-টুকুও আর নেই।’

বুঝা সহানুভূতি দেখিয়ে বললেন, ‘কী হল বাবা?’

‘আত্মীয়স্বজনে দখল করে নিয়েছে। আর কী হবে?’ মধুরবাবু রক্তনার দিকে আড়চোখে চেয়ে কের বললেন, ‘আপনার বেলায় তা হবে না। আপনি তো জীলোক। আপনার বাবাজ্যাঠার বংশ এখনও ভিটে আলো করে বসে আছে। দেখলে কত আদর করে তুলে নেবে।’

কুড়ানি ঠাকরুন নিস্তেজ ভংগিতে বললেন, ‘কে জানে কে বেঁচে আছে কা নেই! এখানে এসে তো আর যাওয়া হয় নি।’

পারিবারিক ব্যাপারে হাত পড়েছে দেখে রক্তনা সজাগ হল। পত্রিকাটা বুজিয়ে মধুরবাবুর হাতে জোর করে গুঁজে দিয়ে বলল, ‘রাত অনেক হল মধুর কাকা। এবার আমরা ঘুমু।’

মনে মনে ক্রুদ্ধ হলেও মধুরবাবু দাঁত বের করলেন। ‘ঠিক, ঠিক। তাহলে এটা রাখবিনে মা?’

‘না।’

‘এক কাজ কর।’ মধুরবাবু চাপা গলায় বললেন। ‘রাত্তরটা তোর কাছেই থাক। সকালে এসে নিয়ে যাব। কেমন? আর বুড়িমা, তাহলে ওই কথা রইল। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা। ওয়েদার ভাল হলেই মায়ের-পোনের বেরিয়ে পড়ব।’

পত্রিকাটা বিছানায় রেখে মধুরবাবু উঠলেন। দরজার বাইরে গিয়ে ছাতিটা নিলেন। তারপর একটু কেসে বুদ্ধার দিকে হেঁট হয়ে কাঁচুমাচু মুখে বললেন, ‘একটা কথা বলছিলুম, মা!’

‘বলো বাবা!’

‘এখন একটা টাকা হবে?’ ধারই চাইছি। খুব দরকার, মা। দিন না একটা টাকা!’

কুড়ানি ঠাকরুন পেটের কাছে কাপড়ের স্কেতার হাত পুরে দিলেন। দুটো আধুলি পের করে বললেন, ‘আমি গরীব মানুষ। কলটা ফুলটা বেচে খাই, বাবা। সকালে একঝুড়ি পেয়ারা বেচেছিলুম।’

মধুরবাবু আধুলি দুটো তুলে নিয়ে ঝটপট বেরিয়ে গেলেন। হাওয়াটা আছে। বৃষ্টি একটু কমেছে। ঘুরঘুরে অন্ধকার এই পাড়াটা। তবু এই দুর্ঘোণের রাতকে মৌতাতে জমিয়ে তোলার তাগিদে মধুরবাবু পাগলের মতো ছুটে চললেন বাউরি-পাড়ার দিকে। গাড়া বাউড়ি গোপনে গাঁজা বেচে।

গাড়াকে ঘুম থেকে ওঠানো সহজ কথা নয়। মালটা তার বউ দিল। মধুরবাবুর গায়ে তখন মত্ত হাতির বল।

ঠাকুরদালানের এদিকে নিচের তলায় কোণার ঘরে মধুরবাবু থাকেন। একটা

জীর্ণ ভক্তাপোষে নোংরা বিছানা পাতা। ভক্তাপোষটা পাশ কিরলেই বিশ্রি শব্দ করে। নহু ঠাকুর সপরিবারে থাকে পাশের একটা ঘরে। রাতের খাবারটা সে যত্ন করে ঢেকে রেখে যায় এ ঘরে। সেও গাঁজাখোর মানুষ। তবে নিজে কেনে না, প্রসাদ পায়।

মধুরবাবু ভিজ়ে দেশলাই অনেক সাধ্যসাধনা করে জ্বলে হেরিকেন ধরালেন। এঘরের বাষটা কতদিন থেকে জ্বলে না। বলে-বলে হৃদ হয়ে গেছেন। কেউ গ্রাহ্য করে না। তাই অভিমানে একটা হেরিকেন চেয়ে এনেছেন হেমন্ত কামারের কাছে। হেমন্ত বিদ্যুৎ নিয়েছে কামারশালে। হেরিকেনটা তাই পড়েছিল অযত্নে।

হেরিকেন জ্বলে খাবারটা দেখলেন মধুরবাবু। কয়েকটা রুটি—‘হুহুরের কান’ তাঁর ভাষায়। একটু তরকারি। ছুঁলেন না। তাকে এক গেলাস দুধ আছে। দুধটা তাঁর নিজের পয়সার। মাসকাবারে দিয়ে যায় নকড়ি গোয়াল। নহু ঠাকুর সেটীর জিন্দাদার। গরম করে তেমনি যত্নে রেখে দেয়। বেড়ালের, উৎপাত্তে মাঝে মাঝে দুধটা ভোগে লাগে না। কিন্তু কপালটাই যার পোড়া, সে করবেটা কী? তবে গাঁজার ভোগ হল গিয়ে দুধ। দুধের জোরেই এখনও টিকে আছে শরীরটা।

গুপ্তস্থান থেকে ককে ও ছোবড়ার গুটি বের করে গাঁজাটা আচ্ছারকম ডলে বিছানায় বসে মধুরবাবু মনে মনে বললেন, ‘ব্যোম ব্যোম শংকর। জয় বাবা, ভোলানাথ। বড় সুন্দর এই রাতটা পৃথিবীতে ছেড়েছে বাবা!’

বেলাপর্যন্ত যুগ্মোন মধুরকৃষ্ণ। কিন্তু তার আগেই দরজা লাখির চোটে খিল ভেঙে দড়াম করে খুলে গেল। রাত্তা চোখে ধুড়মুড় করে উঠে বসতেই কমলাকন্দু রূপো বাঁধানো ছড়িটা এসে গড়ল কপালে। তারপর কাঁধে।...‘স্বাউগুেল। শুওরের বাচ্চা। চোর। আজ তোমায় শেষ করে ফেলব।’ কমলাকন্দের গর্জনে ঠাকুরদালান গমগম করে উঠল। বাইরে পউষে বাদলা আগের দিনের মতো বরছে ঝির ঝির করে। হাওয়া বইছে উদ্দাম। কপাল, তাঁটের কাছটা কেটে রক্ত বরছে মধুরকৃষ্ণের। চুপ করে বসে আছেন মরা মানুষের মতো। কেউ আটকাচ্ছে না কমলাককে।

দেয়ালে লেগে ছড়িটা মট করে ভেঙে গেল। তখন চুল খামচে ধরে হিঁচড়ে নামালেন। লাখি-খেয়ে মধুরবাবু কঁক শব্দ করে পড়ে গেলেন।

কমলাক ভাতা গলায় গর্জালেন, ‘কোথায় কাকে বেচলি হারামজাদা? বল, কাকে বেচেছিস?’ তারপর আবার কাঁধে একটা লাখি। ‘গাঁজাখোরটাকে আজ শেষ করে ফেলব!’

কমলাক্ষের বয়স হয়েছে। ধরধর করে কাঁপছেন। এতক্ষণে ওপর থেকে বড় ছেলে স্নহাস এসে তাঁকে ধরল। এবারসে এতটা বাড়াবাড়ি হার্ট সহ্যবে না। টানতে টানতে নিয়ে গেল বাবাকে। স্নহাস স্থানীয় কলেজের লেকচারার। বাবার মতে আদর্শ ছেলে। তাই সে ছাড়া কমলাক্ষকে নিবৃত্ত করা আর কারুর পক্ষে সম্ভব ছিল না। আপাতত বাবাকে সে হলঘরে নিয়ে গেল। তার কথা শোনা যাচ্ছিল—‘নিজেও হার্টকেল করে মারা পড়বেন, আবার ওই গাঁজাখোরটাকে খুনখারাপি করে বাড়ির সবাইকে বিপদে ফেলবেন। এ এক জ্বালা!’

মধুরকৃষ্ণের মুখ রক্তে ভেসে যাচ্ছে। হাতের আঙুলে রক্তটা দেখে অবাক হয়ে গেছেন যেন। নিজের রক্তের দিকে তাকিয়ে আছেন। কাঁধে আর উরুর কাছে প্রচণ্ড ব্যথা। মুখের ক্ষতগুলো রক্ত বরাচ্ছে, কিন্তু টের পাচ্ছেন না কোনো যন্ত্রণা। মুখমণ্ডল—গলার ওপরের অংশটা নিঃসাড় হয়ে গেছে যেন।

বাড়ি অসম্ভব স্তব্ধ। কতক্ষণ পরে আস্তে আস্তে তক্তা-পোষটা আকড়ে অনেক কষ্টে উঠে দাঁড়ালেন হতভাগ্য প্রৌঢ় মধুরকৃষ্ণ। কিছু দাঁড়ানো যাচ্ছে না। বিছানায় গড়িয়ে পড়লেন। তারপর বুকের খুব ভেতর থেকে একটা কান্নার মতো আওয়াজ টেনে কণ্ঠনালী পার করালেন—তখন সেটা একটা জাস্তব হংকারে পরিণত হল মাত্র। তাঁর আহত শরীরটা কাঁপতে থাকল শুধু।

নস্ট ঠাকুর দয়াপরবশ হয়ে উকি মেয়ে চলে গেল ঘন্টাখানেক পরে। সে দেখে গেল, চিত হয়ে গোঁষ বুজে শুয়ে আছেন মধুরবাবু—সারা মুখে কালো রক্তের ছোপ। বড় ভয়ংকর দেখাচ্ছে। পা দুটো অভ্যাসমতো নাড়াচ্ছেন দেখে নস্ট ঠাকুর জেনেছে, বাবু জীবিত আছেন।

বিপাশার ঘরে রাত

কিছুকাল থেকে বিপাশা এক অদ্ভুত অস্থখে ভুগছে। তার কোনো-কোনো রাতে ভাল ঘুম হয় না। ঘুম যদি বা একটুখানি আসে, কী সব স্বপ্ন এসে ঘিরে ধরে কাঁকে-কাঁকে। জলে টোপ পড়লে যেমন করে মাছের কাঁক এসে ঠোকরায়। নিজের কোনো কথা মুখ ফুটে কাউকে বলার অভ্যাস নেই বিপাশার। সে বুঝতে পারে, নিজের ভেতরটা যেন একবিন্দু করে ক্ষয় হচ্ছে এবং একটা গহ্বর সৃষ্টি হচ্ছে দিনে দিনে। সেই গহ্বরে মাঝে মাঝে শৌ শৌ করে তুড়ুড়ে হাওয়ার শব্দ ভালগোল পাকিয়ে যায়—সে কে, কেন এখানে

কাটাচ্ছে, কিছুক্ষণ ধরে এসব প্রশ্ন তাকে বড় জ্বালায়। জবাব খুঁজে পায় না। অনেক সময় বাবা বা মায়ের দিকে তাকিয়ে তার অবাক লাগে। ওঁরা কে? দূরের জন—অনাখ্যায়, কিংবা সম্পর্কহীন মানুষ বলে ভুল হতে থাকে। তখন সে বাবা অথবা মায়ের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকে। ছুঁয়ে ভুল ভাঙার চেষ্টা করে। শমিতা বলেন, ‘কী হল বিয়াস? শরীর ধারাপ?’ দুহাতে মাপে জড়িয়ে ধরে বিপাশা ছোট্ট মেয়েব মতো বুকে মাথা গোজে। স্বর্কনাগ আড়ালে জীকো বলেন, ‘আমায় তো বড় ভাবিয়ে তুললে বিয়াস। পরের বাড়ি গিয়ে কাটানো ওর হয়তো প্রেম হবে।’ শমিতা এতকিছু না বুঝে বলেন, ‘প্রেম সবারই হয়। আমারও কি হয় নি। তুমি ছাড়ো তো এসব অলঙ্কণে কথা।’

কদিন থেকে অকালবৃষ্টির উপদ্রব চলেছে। শুধু বৃষ্টি হলে কথা ছিল, ঝোড়োহাওয়া বইছে শোঁ শোঁ করে। গাঢ় হিমে আচ্ছন্ন দিনরাত্রি। এর মধ্যে শতঙ্গ গাড়ি হাঁকিয়ে ঘুরে আসছে হাইওয়েতে কতদূর। সে বলে, ‘ইলিনয়ে বছরের বোশর ভাগ সময় এরকম। কোনোদিন রোদ উঠলে সাড়া পড়ে যায়। এমন ওয়েদার আমার গা-সওয়া।’ আসলে শতঙ্গ ভীষণ বদলে গেছে। একমুহূর্ত চূপচাপ বসে থাকতে পারছেন। ছোটোছুটি করে বেড়াতে চায়।

দোতলার পূর্ব-দক্ষিণ কোণের ঘরটা বিপাশার। এখন রাত প্রায় এগোরোটা। আজ সন্ধ্যা থেকে বিদ্রোহ বন্ধ। দুর্ঘোণে কোথাও গগুগোল ঘটেছে। এদিকে বাড়ির জেনারেটরও সময় বুঝে রসিকতা করেছে। সকাল না হলে মিস্তিরি পাওয়া যাবে না। বাড়িটা অন্ধকারে প্রকৃতির করায়ত্ত হয়ে গেছে এখন। টেবিলে শেড দেওয়া কেরোসিন বাতি জ্বলছে। বিপাশার আজ কেমন ভয় করছে। কিসের ভয় সে বুঝতে পারছে না। মাঝে মাঝে হাত বাড়িয়ে শতঙ্গর আনা টেপেরেকডারে সিম্ফনি অর্কেস্টার আওয়াজ বাড়িয়ে দিচ্ছে। দূরে কোথাও প্লেন উড়ে চলেছে যেন। মাথার ভেতর সেই সব অলীক প্লেন উড়ে আসার উপক্রম করলেই বিপাশা ফের নব ঘুরিয়ে আওয়াজ কমাচ্ছে।

খট করে একটা শব্দ হল। মশারির ভেতর লেপের আরাম গায়ে নিয়ে শুয়ে আছে বিপাশা। পাশেই টেপেরেকডার চলছে ব্যাটারিতে। ভাবল টেপটা শেষ হবার শব্দ। কিন্তু না তো। সিম্ফনি অর্কেস্ট্রা সমানে বেজে চলেছে। গভীর আচ্ছন্নতার মধ্যে চোখ খুলে বিপাশা দেখল কে যেন দাঁড়িয়ে আছে সামান্য তফাতে। কয়েক মুহূর্ত কেটে গেল নিজেকে সচেতন করতে। ভাবল, শতঙ্গ। হয়তো কিছু কলে গেছে এ ঘরে। দরজাটা তাহলে বন্ধ করতে ভুল হয়েছে। এমন ভুল বিপাশার হয় মাঝে মাঝে। বিপাশা বলল, ‘দাদা?’

এসময় সে শতক্রকে সার্টিলেজ নাম ধরেই ডাকত। আমেরিকা থেকে কেরার পর নিজের অগোচরে দাদা বলতে শুরু করেছে। শেড থাকায় আলোমিশ্রিত ছায়া ওখানে। নীল স্বচ্ছ মশারি ব তাঁজের ভেতর দিয়ে নুঁতিট। বাকচোরা স্থায়বিয়ালিট ছবির মতো দেখাচ্ছে। বিপাশা ফের বলল, ‘কী হল রে দাদা?’

‘আমি অনি।’

বিপাশা চিংকার করে উঠে বসতে চাইল। কিন্তু পারল না। মুহূর্তে তার মনে হল, ঘরে শুয়ে নেই—বাইরে ঝোড়ো বাদলার মধ্যে চলে গেছে কোন অদ্ভুত উপায়ে। শুয়ে আছে ভেজা ঘাসের ওপর। সে অসহায় হাটতে না শেখা শিশুর মতো ছটফট করতে থাকল।

অনি একটু এগিয়ে এসে বলল, ‘বিয়াস কি ভয় পাচ্ছ?’ ওঠ, আমি অনি। বিয়াস! বিয়াস!’ অনির কণ্ঠস্বর কেন অমন বাতাসের মতো শনশন করে উঠছে, বুঝতে পাবল না বিপাশা। এই সময় তার মনে পড়ে গেল, ক’বছর আগে সন্ধ্যায় ছাদে একা পায়চারি করার পর হঠাৎ ঝুড় উঠেছিল। তারপর আলোগুলোও নিতে গিয়েছিল। ভয় পেয়ে নেমে আসার সময় চিলেকোঠার সিঁড়িতে অনি এমনি করে সাড়া দিয়ে বলেছিল, ‘আমি অনি। কথা আছে শোনো।’ অনি তাকে জড়িয়ে ধরেছিল। বিপাশা চিংকার করে উঠেছিল সঙ্গে সঙ্গে। তারপর তাকে খুঁজে পাওয়া যায় অজ্ঞান অবস্থায় সিঁড়ির ওপর। পরে খুব অবাক হয়েছিল বিপাশা। অনির কথাটা যদিও কাউকে বলেনি, কিন্তু অনি কেমন করে চিলেকোঠার সিঁড়িতে আসতে পারল, সে বুঝতে পারে নি। বাড়ির সবার নজর এড়িয়ে কারুর পক্ষে ছাদে ওঠা সম্ভব নয়। তবে অনির মতো ছেলের পক্ষেও কিছু অসম্ভব হয়তো নয়। ও সব পারে। পাইপ বেয়ে ওপরে উঠেছিল সম্ভবত।

বিপাশা অতিকষ্টে উচ্চারণ করল, ‘কা?’

‘ওঠ, আমি কথা বলব। আমার অনেক কথা আছে। ওঠ বিয়াস।’

‘না।’

‘তুমি কি ভয় পাচ্ছ আমাকে।’

‘হ্যাঁ। তুমি চলে যাও।’

‘বিয়াস, আমি বলতে এসেছি তুমি কথা রাখো নি।’

‘কিসের কথা অনি? আমি তোমাকে কোনো কথা দিই নি।’

‘দিয়েছিলে। তুমি আমার সঙ্গে চলে যাবে বলেছিলে।’...

‘মিথ্যা কথা। আমি তোমাকে ঘৃণা করতুম। এখনও করি, অনি।’

‘কেন বিয়াস?’

‘তুমি চলে যাও। নৈলে এখনই সবাইকে ডাকব। তুমি খুনী ডাকাত।
তুমি ফেরারী আসামী।’

অনি হাসতে লাগল। তার হাসির শব্দে ঘরের ভেতর অদ্ভুত শন শন শব্দ
ঘুরণাক ধেতে থাকল। সে বলল, ‘কেন ঘৃণা কর আমি জানি। তোমার
কুমারীত্ব ভেঙেছিলুম বলে। বিয়াস, তোমাকে ভালবাসতুম। এখনও বাসি।
ভালবাসা দিয়ে তোমাকে পূর্ণ নারীত্বে পৌঁছে দিতে চেয়েছিলুম। কেন তুমি
বোঝ না?’

‘চূপ করো। এ আমার লজ্জা, এ তোমার পাপ।’ বিপাশা হুঁপিয়ে উঠল।

‘তোমার লজ্জা, আমার পুণ্য। তোমার সঙ্গে পাপ করেছি সেই তো আমার
পুণ্য।’

‘কী বললে?’

‘তোমার সঙ্গে পাপ করেছি সেই তো আমার পুণ্য।’

বিপাশা কাঁদতে থাকল হু হু করে।

‘ওঠ বিয়াস। এস আমার সঙ্গে।’ অনি হাত বাড়াল। আবছা কালো
একটা হাত মশারি ছুঁল। মশারি থর থর করে কঁপে উঠল।

বিপাশা বালিশ আঁকড়ে ধরে উপুড় হল। সিংফনি অর্কেস্ট্রার আবার দূরের
সমুদ্রের একটা বিশাল ঢেউ এসে তটে আছড়ে পড়ার মতো, কিংবা শত প্লেনের
দিগন্ত জোড়া চাপা গর্জনের মতো স্বর বাজতে থাকল। বিপাশা কাঁদতে
থাকল।

‘বিয়াস। আমার বিয়াস!’

অনি কি তাকে ছুঁল? অনি যেন তাকে তুলে নিয়ে যাচ্ছে ঘরের বাইরে
হিম হাওয়া ও বৃষ্টির মধ্যে। বিপাশা অবচেতনার অন্ধকার তলদেশে মাটি
আঁকড়ে ধরে নিজেকে লুকোতে চাইল।

সকালে ঘুম ভেঙে সে দেখল ওপাশে জানলার একটা পাট খোলা। উজ্জল
রোদ এসে পড়েছে ঘরে। সে উঠে বসল আন্তে আন্তে। মাথার ভেতরটা
শূন্য লাগছে।

মশারি তুলে দিয়ে সে পা বাড়াতে গিয়ে হঠাৎ দেখল, মন্ডল মোজেকের
চিত্রিত মেঝের কয়েক টুকরো শুকনো কাঁদা বাস আর ছেঁড়াপাতার কুচি।

সঙ্গে সঙ্গে সে চমক খেল। রাতের ঘটনা মনে পড়ে গেল। ক্ষত দরজার দিকে তাকাল। কিন্তু দরজা তো ভেতর থেকে বন্ধ।

খর খর করে কেঁপে উঠল বিপাশা। যদি স্বপ্ন হয়, তাহলে কাদা ঘাস ছেঁড়াপাতা এল কীভাবে? সে কল্পিত হাতে সেগুলো কুড়িয়ে জানলার বাইরে ফেলে দিল।

রাতে অনির উচ্চারিত বাক্যটা কবিতার লাইন হয়ে ঘরের ভেতর জেগে উঠল আবার। ‘তোমার সঙ্গে পাপ করেছি সেই তো আমার গুণ্য...তোমার সঙ্গে পাপ করেছি...তোমার সঙ্গে পাপ করেছি...’

বিপাশা চঞ্চল হয়ে ঘরের ভেতর চোখ বুলোতে থাকল। মাথার কাছে টেবিলে একটা বই খুলে কখন সে উগুড় করে রেখেছিল মনে পড়ছে না। বইটা তুলতেই লাইনটা চোখে পড়ল, ‘তোমার সঙ্গে পাপ করেছি...’ কিন্তু...

ফুল-ফলের সংসারে

শীতের শুকনো বাতাসে মইয়েপড়া উদ্ভিদের বিবর্ণতা কদিনের অকালবৃষ্টিতে যুচে গেছে। আবার পড়েছে সজীবতার উজ্জ্বল প্রলেপ শিম-লাউ শশার মাচানে, পেয়ারা গাছে, জবাফুলের ঝাড়ে। কুড়ানি ঠাকরনের মনেও ওইরকম এক বর্ণাঢ্য চঞ্চলতা। বৃদ্ধা দিনমান নড়বড় করে ক্রাচ খটখটিয়ে উঠোনে ঘোরেন। আর মাঝে মাঝে দোরে গিয়ে দাঁড়ান। কখন গোসাইবাবু আসবেন। গোসাইবাবু রেলের লোক ছিলেন। পৃথিবীর কোন ঠাই তাঁর অচেনা আছে? রঙ্গনা অবাক হয় ঠাকুমার এই চাঞ্চল্য দেখে। সে ছুটু মি করে বলে, ‘আর এসেছেন গাঁজাবাবু। তোমার টাকাটা গচ্ছা গেল ঠাকুমা!’ বৃদ্ধা বলেন, ‘আসবেন, আসবেন। না এসে গারেন নাকি? বুঝি ঠাণ্ডায় জর-জ্বর বাধিয়ে ফেলেছেন। ও রনি, একবার খোঁজ নে গা ভাই!’

রঙ্গনা ও-বাড়ি একসময় যেত। এখন যায় না। বাড়ির লোকগুলো কেমন দৃষ্টে তাকাত তার দিকে। চোখে কেন অল্লীল প্রপ্নের পোকা কিলবিল করত। তবে কমলাক্ষবাবু লোকটা রঙ্গনার মতে খুব ভাল। কত বই গুঁর ঘরে। দোষের মধ্যে এক, বই চাইলেই রেগে যেতেন। তারপর মধুরবাবুর কাছে গুঁর চুরি করা বই গোপনে কেনার পর থেকে রঙ্গনা আর ও-বাড়ির জিসীমানা মাড়ায় না। বড্ড ভয় করে তার, যদি সব জানাজানি হয়ে থাকে। বাঁধানো প্রবাসী পত্রিকাটা

সে ঠাকুরদার সিন্দুকে পুরনে' কাপড়চোপড়ের তলায় লুকিয়ে রেখেছে। অপরাধকেও জানায় নি কিছু। অপরাধ বেরুলে লুকিয়ে পাতা ওড়ায়। কিন্তু কান বাইরের দিকে। মধুরাবুর জগে কুড়ানি ঠাকরন বাড়ির দরজা প্রায় খুলেই রেখেছেন। তবে ভাগিন রঙ্গনাদের বাড়ি সচবাচর কেউ আসে না। পারতপক্ষে আসতেও চায় না' নেতাং যাতঃ দরকার হয় কুড়ানি ঠাকরনের ফলফল কিনতে তারাই আসে। এলে বাইরে থেকে তাকে ঠাকরনকে।

এদিকে অপরাধ চাকরির জগৎ পাগল হয়ে উঠেছে দিনের অধিকাংশ সময় সে গাইবে থাকছে। তার কলে রঙ্গনাব পাড়াবেড়ানো বন্ধ হয়ে গেছে। ঠাকুমাকে একা রেখে যেতে ভয় পায় 'যস হয়ে গেছে ঠাকুমার, হঠাৎ যদি কিছু ঘটে যায়। আসলে মৃত্যুকে বড় ভয় পায় রঙ্গন' মায়ের কথা মনে নেই, কিন্তু চোখের সামনে বাবাণে মরতে দেখেছে। মৃত্যু বড় কষ্টদায়ক। মৃত্যু বড় ভয়ংকর। একটা মৃত্যু একটা সংসারকে কীভাবে তছনছ করে দেয়, কী বিস্ত্রি দারিদ্র্য দিয়ে যায়, রঙ্গন হাড়ে-হাড়ে বুঝেছে। দিদির ওপর তার এতটুকু ভরসা নেই, যেমন ছিল না দাদার প্রতি অপরাধা নিজেকে নিয়েই থাকে। স্বার্থপর ধরনের মেয়ে। আর অনিবাণ তো ছিল বাড়িগুলো, নষ্ট ছেলে। আজ সাতবছর তার কোনো পাতা নেই। তাহ' বলে তা' জন্ম কারুর মাথাব্যথাও নেই। অপরাধার তো নেই-হ' সে বলে, 'মরেছে। আপদ গেছে।' রঙ্গনা প্রথম-প্রথম একটু বিচলিত বোধ করত। এখন যেন সয়ে গেছে। সেও ধরে নিয়েছে, দাদা কোথাও মার পড়েছে জেলে-টেলে থাকলে নিশ্চয় কোনোভাবে খবর পাওয়া যেত। বাঁচা গেছে বাবা। আর এ বাড়ি রাতবিরেতে পুলিশ এসে জালাতন করে না।

অনির জন্ম এবাড়িতে শুধু একজনই মাঝে মাঝে চোখের জল ফেলেন। কুড়ানি ঠাকরন একবার অনি তাঁকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছিল। একবার নিষ্ঠুরের মতো দড়ি বেঁধে মেঝেয় ফেলে রেখে ও'র পয়সাকড়ি ছিনতাই করে পালিয়েছিল। তবু রঙ্গন কান পেতে থাকেন তার জন্ম রাতবিরেতে। কোনো শব্দ কানে এলেই চঞ্চল হয়ে ওঠেন—'গই। অই। এল নাকি?'

এসব সময় অপরাধা ঠাকুমার ওপর অনেকদিনের রাগটা প্রচণ্ড বেড়ে নেয়। ছোটলোকের মতো ফলফল-তরকারি বেচেন কুড়ানি ঠাকরন, এতে প্রচণ্ড লজ্জা অপরাধার। তার সামনে কেউ খন্দের এ- সে ভাগিয়ে দেবেই দেবে। রঙ্গনা অতটা পারে না। তবে তারও ভারি লজ্জা হয় এতে। এমন ভাব দেখায় যেন ওসব ঠাকুমার বাপার। 'পয়সা তাঁরই নিজের কাজে লাগে। যেন

তাদের খাওয়া-পরা জোটে অল্প উপায়ে, যেভাবে আরও পাঁচটা ভ্রম পরিবারের জোটে। হঁ, বাবা বুঝি টাকাকড়ি রেখে যাননি কিছু? পোস্টোপিসে, ব্যাংকে বাবার টাকা আছে জমানো। সেজন্তই না দিদি অথবা তাকে পোস্টোপিসে যেতে হয়। ব্যাংকে যেতে হয়। কোন ব্যাংক? না—শহরের ব্যাংকে। বসন্তপুরের ব্যাংকে টাকা রাখে নাকি মামুষে?

রঙ্গনার এসব কথা কানে এলে কুড়ান ঠাকুর মনে মনে হাসেন। একটু পরেই তো অপকৃপা রঙ্গনাকে পাঠাবে পয়সা চাইতে। 'ঠাকুমা, পাঁচটা টাকা হবে গো?' দিদি বলল, খুব দরকার।' চাল ডাল হুন তেল কম পড়লে সে দায়ও কুড়ানি ঠাকুরনেব। নাতনিরা না খেয়ে থাকবে, সেও ভাল। পাশের বাড়ির দোরে গিয়ে ঠাকুরন তখন ডাকবেন, 'অ ছোটবউ। ছোটবউরে। একবার পেনীকে পাঠিয়ে দে না মা।' ছোটবউ মানে মধু ছুতোরের বউ। পেনী তার মেয়ে। বছর দশেক বয়স। দুটো ফলমূলের লোভে কুড়ানিঠাকুরনের বাজারটা করতে তার আপত্তি নেই। মেয়েটি বড় চৌকস। ওজন বোঝে। হিসেব বোঝে। আর ঠাকুরন বোঝেন পেনা পয়সা মারে। তা মাকক। দ্বিজ মেয়ে দুটো যে না খেয়ে থাকবে।

গোসাইবাবুর প্রত্যাখ্যান কুড়ানি ঠাকুরনের অস্থির কয়েকটা দিন কাটল। তারপর এক বিকেলে টিনের কপাটে মূছ চৌকার শব্দ হল। বৃদ্ধা টেচিয়ে উঠলেন, 'অই! অই।

বঙ্গনা বোঁরিয়ে এসে বলল, 'কা?'

'দোর খুলে দে'লিনি। ওই বুঝি গোসাইবাবু এল। বৃদ্ধার মুখ খুশিতে উজ্জল হয়ে উঠল।

রঙ্গনা ঠোঁট উন্টে 'হঃ' বলে দবজা খুলতে গেল।

শতদ্রু এবং রঙ্গনা

শতদ্রুকে দেখে রঙ্গনা ভীষণ অপ্রস্তুত বোধ করছিল। সে ভাবতে পারে নি, শতদ্রু তাদের বাড়ি এসে হাজির হবে। রঙ্গনার পরনের শাড়িটা যথেষ্ট ভদ্র নয়। ছেঁড়া কাটা এবং মলিন। ব্লাউসটাও বেরঙা। যত কম দায়ের হোক, সোয়েটারটা চাপালেও পারত। বেশ তো শীত করছিল।

আব খালি পা এখন। শীতে প্রচণ্ড পা কাটে রঙ্গনার। তাছাড়া রোজ

জ্ঞানের অভ্যাসও নেই তার। এ শীতে তো সপ্তায় ছুদিনের বেশি জ্ঞান তার পক্ষে অসম্ভব। চুলগুলো রক্ত, এলোমেলো। চোঁট শুকিয়ে কেটে একাকার। ক্রিম ফুরিয়ে গেছে। যেটুকু ছিল চেঁছেমুছে নিয়ে গেছে অপরাধ। তাকে বাইরে ঘুরতে হচ্ছে।

শতদ্রু মিষ্টি হেসে বলল, ‘কী হল? ট্রেসপাস করলুম বুঝি?’

মুখ নামিয়ে রক্তনা আস্তে বলল, ‘না না। আসুন।’

‘অস্থবিশ্ব্ব করেছেন নাকি?’

রক্তনা অগত্যা হাসল। ‘না। ঘুমোচ্ছিলুম।’

দরজাটা ভাল করে বন্ধ করে এসে সে দেখল শতদ্রু উঠানে দাঁড়িয়ে চারপাশটা দেখছে। বারান্দায় টেরচা হয়ে পশ্চিমের যেটুকু রোদ পড়েছে, তাই গায়ে নিয়ে একটুকরো চটের ওপর পা ঝুলিয়ে বসে আছেন কুড়ানি ঠাকরুন। পাশে দাঁড় করানো ক্রাচটা। কেমন বিভ্রান্ত চাউনি—নিম্পলক। শতদ্রু বলল, ‘বুড়িমা ভাল আছেন তো?’ বুদ্ধা নির্বিকার। জবাব দিলেন না।

অভিজ্ঞতা হচ্ছে দেখে রক্তনা বলল, ‘ঠাকুমা চিনতে পারছ না? সেদিন যার গাড়িতে এসেছিলে করালীর খান থেকে।’

কুড়ানি ঠাকরুন এবার অশ্রুটস্বরে শুধু বললেন, ‘ভাল তো?’

শতদ্রু বলল, ‘আপনাদের বাড়িটা তো ভারি সুন্দর।’

রক্তনা সপ্রতিভ হবার চেষ্টা করছিল। বলল, ‘বিয়াসদি কেমন আছে? ওর কাছে যাওয়া হয় না।’

শতদ্রু বলল, ‘ইস! কত সব গাছ! ওগুলো বুঝি শশা? জানেন, আমেরিকায় ট্রিক একইরকম শশা পাওয়া যায়। তবে সাইজে একটু বড়ো। আর...’

রক্তনা ঘর থেকে একটা জীর্ণ কল সাবধানে ভাঁজ করে এনে ঠাকুমার সামান্য তফাতে পেতে দিল, যাতে শতদ্রু পা ঝুলিয়ে বসতে পারে। বলল, ‘এখানেই বসুন।’

শতদ্রুর হাতে একটা ইংরিজি বই। এতক্ষণে চোখে পড়ল রক্তনার। শতদ্রু বইটা দিয়ে বলল, ‘খ্রীলার পড়তে আপনার কেমন লাগে? স্টেটসে থাকতে আমার অবশ্য সময় হয় না। সকাল আটটায় বেরিয়ে পড়তে হয়। ওস্তার ডিউটি করি ল্যাবরেটরিতে রাত আটটা অবধি। টেরিফিক লাইফ।’

আড়ষ্ট হাতে বইটা ধরে রইল রক্তনা। ‘কী বলবে, খুঁজে পায় না কথা।’

শতদ্রু বলল, ‘আপনার দিদির সঙ্গে দেখা হয়েছিল সকালে। বাবার কাছে গিয়েছিলেন।’

‘দ্বিদি এখনও করে নি।’

‘একেবারে নেচারের মধ্যখানে’ থাকেন দেখছি।’ শতদ্রু আবার চারপাশে চোখ বুলিয়ে বলল। তারপর তাকাল রঙ্গনার দিকে। রঙ্গনা চোখ নামীল। ‘উইদাউট এ্যাপয়েন্টমেন্ট এসে পড়লুম বলে রাগ করেন নি তো? ওদেশে কিন্তু এ্যাপয়েন্টমেন্ট না করে কারুর বাড়ি যাওয়া যায় না। এমন কী প্রেমিকও প্রেমিকার সঙ্গে এ্যাপয়েন্টমেন্ট করে তবে যায়।’

ঠাকুরার দিকে আড়চোখে চেয়ে রঙ্গনা বিব্রত বোধ করল। তার এখন ভাবনা, কতক্ষণে আপন বিদেয় হবে। এ সময় কেউ লাউশাক কিনতে এলেই সমস্তা হবে।

শতদ্রু বলল, ‘আমার অবস্থা বড় করুণ। বুঝলেন? ওদেশে থাকতে এদেশের জন্ত মন কেমন করত। আবার এখন ওদেশের জন্ত অস্থির হয়ে উঠেছি। কী ভয়াবহ অবস্থা এখানে! আমার ক্রমশ অসহ্য লাগছে। ভেবে-ছিলুম মাস দুই থাকব। মনে হচ্ছে, সেটা অসম্ভব। একেকটা দিন আর রাত্রি কীভাবে যে যাচ্ছে বোঝাতে পারব না। মনোটনি এ্যাও মনোটনি। ওঃ।’

রঙ্গনা আস্তে বলল, ‘কেন? এ তো আপনার জন্মভূমি।’

শতদ্রু হাসল। ‘ওসব সেন্টিমেন্ট যেভাবেই হোক, হারিয়ে ফেলেছি। এখন আমি টোটালি এ্যাপয়েন্টেড—উম্মূল অবস্থা যাকে বলে। তবু তো ওদেশে লাইফ আছে। কাজে নিজেকে জড়িয়ে ফেলার স্বপ্ন আছে। কিরে, এসে আমার খালি অবাক লাগছে, কীভাবে জীবনের অতগুলো বছর আমি নষ্ট করে-ছিলুম।’

রঙ্গনার মনে হল, বসন্তপুরে কিছু ভাল লাগছেন—একখাটা জানাতেই বুঝি শতদ্রু এসেছে। সে একটু হেসে বলল, ‘বসন্তপুরে আপনার ভাল না লাগারই কথা। কলকাতায় হলে ...’

কথা কাড়ল শতদ্রু। ‘কোরে মাথা নেড়ে বলল, ‘সে তো আরও টেরিফিক। কলকাতায় যাই নি বুঝি? কী দেখে গেছি আর কী হয়েছে। একেবারে জঘন্ত নোংরা কর্দম। আমার এটাই ভীষণ অবাক লেগেছে, তবু লোকেরা বিনাপ্রতিবাদে দ্বিদি কাটাচ্ছে ওখানে। ওয়েন্টের লোকেরা হলে কী করত ভাবুন।’

শতদ্রু অনর্গল এইসব কথা বলতে থাকল। রঙ্গনা অস্থির। হুড়ানি ঠাকরুন হাঁ করে তাকিয়ে আছেন কেণ্টাসজির ছেলের দিকে। মনে আকাশপাতাল চিন্তা। বিলেড-ফেরত ছেলেটা এবাড়ি এসে রঙ্গনার সঙ্গে কথা বলছে, মন্দ না। ভালই লাগে এসব। কায়েতের মেয়েকে লুঠ করে এনে বউ করেছিল বামুনের ছেলে। তাতে যদি দোষ হয়ে থাকে, তো কায়েতের ছেলে এই বামুনের মেয়েকে নিয়ে

গেলে শোধবোধ। মন্দ কি ? বন্ধার ঠোঁটে আশ্চর্য হাসি ফুটে উঠল। তারপর বললেন, ‘অ রনি, এটুকুন চায়ের যোগাড় কল্লৈ পাতিস ভাই ! ছেলোটার গলা বে শুকিয়ে গেল।’

কুড়ানি ঠাকরন খুক খুক করে হেসেও ফেললেন রসিকতার দরুন। শতজ্জ বলল, ‘না—প্লীজ ! আমি বহুকাল আগে চা-খাওয়া ছেড়েছি। তবে কফি খাই—উইলডট মিঙ্ক। আমেরিকানরা, জানেন ? পট-পট কফি খায়। ব্রেকফাস্ট লাক ডিনার সবসময় আগে কয়েক কাপ খেয়ে নেবে। তারপর অন্ত কিছু।’

রঙ্গনা কাঁচুমাচু মুখে বলল, ‘কফি তো নেই। আমরা একটু চা খাই। কফি...’

‘কফি পেলোও এখন খেতুম না। মেজাজ ভাল নেই।’ শতজ্জ বলল। ‘বাই না বাই, যে জরুরী কথাটা বলতে এসেছিলুম—ফ্র্যাংকলি বলি। অগ্রভাবে নেবেন না প্লীজ।’

রঙ্গনা দুঃস্থুর বুক বলল, ‘বলুন।’

‘বহু বছর আগে, মনে পড়ছে না ঠিক—আপনি তখন জাস্ট টিন-এজার...’

রঙ্গনা দ্রুত বলল, ‘এখনও আমি টিন-এজার। নাইনটিন।’ বলেই সে লজ্জায় পড়ে গেল। কেন বলতে গেল বয়সের কথা। ঠিক হল না।

শতজ্জ লাকিয়ে উঠল, ‘ইজ ইট ? তাই সম্ভব। কমা চাইছি।’ সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রঙ্গনার দিকে তাকাল। সুন্দর চোখ শতজ্জর। স্কের বলল, ‘আমি টোয়েন্টি দেভেন। সামনে মাঠে আমার বার্থডে পড়বে। জানিনা ততদিন থাকব কিনা এখানে।’

‘কী যেন বলছিলেন ?’ রঙ্গনা মনে করিয়ে দিল।

‘স্কুলে একটা ফাংশান হয়েছিল। স্টেজের পেছনে একটা চেয়ারে বসে আপনি বই পড়ছিলেন। পরনে লাল ছিটের ফ্রক। চুলগুলো ছাঁটা ছিল। আমার কী দারুণ ভাল লাগছিল।’

রঙ্গনা বলল, ‘মনে নেই।’

‘আমার মনে আছে। এতবছর পরে সেদিন সন্ধ্যায় বিয়াসের ঘরে আপনাকে দেখেই চিনতে পেরেছিলুম।’ শতজ্জ একটু আবেগ মেশাল গলায়। ‘আমার কিন্তু যখন-তখন মনে পড়ত দৃশ্যটা—ভীষণ সেটিমেন্টাল হয়ে উঠতুম।... আপনি কিছু মনে করছেন না তো ?’

‘নাঃ। মনে করার কী আছে !’

‘কোনো-কোনো দৃশ্য কীভাবে যে মনে থাকে। একবার ডেনভারে ভন স্ত্রাস

পার্কের রেলিঙে ভর দিয়ে ঠিক ওইরকম টিন-এজার—বয়স ধরুন হার্ডলি চোদ্দ, একটি মেয়েকে বই পড়তে দেখে গাড়ি থামিয়ে ছিলুম। চমকে গিয়েছিলুম একেবারে। এ কেমন করে হয় ?’

‘আমি তো কালো—বিশি্র চেহারা।’ রঙ্গনা একটু হাসল।

‘কী বলেন !’ শতদ্রু মুগ্ধ দৃষ্টি তাকিয়ে বলল। ‘আপনি অসাধারণ সুন্দর। অন্তত আমার চোখে।’

রঙ্গনা ফের আড়চোখে কুড়ানি ঠাকরনের দিকে তাকাল। ঠাকরন তেমনি ক্যাল ক্যাল করে তাকিয়ে আছেন শতদ্রুর দিকে—তবে ঠোটের কোণায় কেমন হাসি লেগে রয়েছে।

শতদ্রু বলল, ‘মেমসারয়েবদের রঙ কিন্তু আমার অপছন্দ। তবে আপান ডার্ক নন, উজ্জ্বল ব্রাউন। এদেশে আপনাকে ফর্সাই বলবে সবাই। বলে না ?’

রঙ্গনা ঠোঁট কামড়ে ধরে মুখ ঘোরাল অগৃহদিকে ! রোদ্দটা কখন সরে গেছে। শীতের হিম গাঢ় হয়েছে। বাড়ির ওপর শেষবেলার ছায়া ঝন ঝছে। শতদ্রু উঠবে কখন ?

সে আবার আমেরিকা এনে ফেলল। তারপর বাইরের দরজায় কেউ কড়া নাড়ল। রঙ্গনা ভারি পায়ে এগিয়ে দরজা খুলে দেখল, অপরূপা।

অপরূপা শতদ্রুকে দেখেই চমকে উঠেছিল। তারপর সারা মুখ হাসিতে ভরিয়ে দিয়ে বলল, ‘আরে ! সার্টিলেজদা ! কতক্ষণ ?’

শতদ্রু হাসতে হাসতে বলল, ‘দারুণ। ওই নামে কেউ না ডাকলে খুব আনইজি ফিল করি। করছিলুম এতক্ষণ।’

অপরূপা চোখ কটকটিয়ে রঙ্গনাকে বলল, ‘এই হিমের মধ্যে ওকে বাইরে বাসয়ে রেখেছিস ? কী আকেল তোর ! আমার ঘরটা খুলে দিস নি কেন ?’

সে হস্তদস্ত গিয়ে ঘর খুলল ও ঘরটা কোনরকমে ভদ্রতারক্ষার মতো সাজানো আছে। পুরনো একটা জীর্ণ পালংকও আছে। তার গদীতে একশো বছরের ধুলো আর পোকামাকড়। কিন্তু রঙীন বেডকভারে ঢাকা। তার বয়সও অনেক হল। দেয়ালে ঝোলানো গোল মাঝারি আয়তনের একটা আয়না আছে। আলনা নেই—কাপড় চোপড় দড়িতে টাঙানো। তবে একটা টেবিল আছে, চেয়ার না থাক। টেবিলটা এমনভাবে রাখা, যাতে বিছানায় পা ঝুলিয়ে বসে পড়াশোনা করা যায়।

লঠন জেলে বিছানা ঠিকঠাক করে অপরূপা ডাকল, ‘রনি ! সার্টিলেজদাকে নিয়ে আস।’

শতদ্রু বলল, 'খাঁক। আজ চলি বরং।' 'আবার আসব খন।'

অপরূপা মাথা ছুলিয়ে মিষ্টি হেসে বলল, 'উহ। কী ভাগ্যে এসেছেন, এত শিগগির যেতে দিচ্ছি না। আস্থন। বাইরে হিম পড়ছে।'

শতদ্রু বলল, 'দ্রীজ।'

অপরূপা শুকনো মুখে বলল, 'গরীব মানুষ আমরা আটকানোর ক্ষমতা নেই। কী বলব?'

'আপনি রাগা করছেন। আচ্ছা, চলুন—একটু বসে যাই। বন্ধনা, এস।'

অপরূপা জিত্ত কেটে বলল, 'এরাম। রীহকেও আপনি আমাকে কক্ষণে আপনি বলবেন না। ভীষণ রাগ করব কিন্তু।'

'বলব। রন্ধনা, বস্থন।' শতদ্রু সরে বসল।

অপরূপা জিত্ত কেটে বলল, 'এরাম। রনিকেও আপনি বলছেন সাটলেজদা। ওকে তুই বলুন।'

'বলব।'

রন্ধনা বলল, 'আসছি। ঠাকুমার ঘরে আলো জ্বলে আসি।' সে বেরিয়ে গেল। কুড়ানি ঠাকরণ তেমনি বসে ছিলেন। রাগা ঘর থেকে লক্ষ জ্বলে এনে রন্ধনা ঠাকুমাকে উঠতে সাহায্য করল। একটু পরে পাশের ঘর থেকে তার কানে এল, অপরূপা বলছে, 'আচ্ছা সাটলেজদা, একটা রিকোয়েস্ট করব? আমি তো আর্টস গ্র্যাজুয়েট—আমার করেনে কোনো কাজের ব্যবস্থা করে দিতে পারেন না? আপনার নিশ্চয় কত জানা শুনা ওখানে। পারেন না সাটলেজদা?'

শতদ্রু কী বলল, শুনেতে পল না। কিন্তু রন্ধনা নিঃশব্দ হাসিতে ভেঙে পড়ল। কী বলছে দিদি! ওর কি মাথাখারাপ হয়ে গেছে? কুড়ানি ঠাকরণ সন্নেহে একটা খান্নাড় মেরে চুপ করাতে চাইলেন রন্ধনাকে। অত হাসতে আছে আইবুড়ো মেয়ের?

শতদ্রু ডাকছিল রন্ধনাবে কয়েকবার ডাকলেও রন্ধনা গেল না। কিছুক্ষণ পরে ওরা বেরুল। অপরূপা বলল, 'একটু মিষ্টিমুখ করাতে চাইলুম করলেন না। একদিন কিন্তু খেতে হবে আমাদের বাড়ি।'

শতদ্রু ডাকল, 'রন্ধনা। যাচ্ছি।'

রন্ধনা বেরিয়ে বলল, 'আচ্ছা। আবার আসবেন।'

অপরূপা এগিয়ে দিতে গেল শতদ্রুকে। গেল তো গেলই। রন্ধনা বলল, 'ও ঠাকুমা। দিদি কেলেংকারি না করে ছাড়বে না। কোনো মানে হয়? বিদ্যাসদির কানে গেলে কী বলবে? ছি:।'

অপরাধা কিরল যখন, তখন বেশ অন্ধকার। রক্তনা বীকা মুখে বলল, 'বাড়ি অন্ধ এগিয়ে দিয়ে এলি নাকি রে?'

অপরাধা আনমনে বলল, 'হুঁ।' তারপর নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকল। তাকে বিবর্ণ দেখাচ্ছিল।

রক্তনা লম্পের আলোয় শতক্ষর দেওয়া বইটা খুলেই বন্ধ করল। বলল, 'ঠাকুমা! তোমার মধুরচন্দ্র গোসাই তো এলেন না। টাকাটা গচ্ছা। তার বদলে আমাদের নিয়ে চলো, কোথায় যাবে।'

কুড়ানি ঠাকরুন ছুঁথের হাসি ফুটিয়ে বললেন, 'তোমার বরের সঙ্গে যাব, তাই। তুই মেয়ে, তুই কি বীকা-ছিরামপুরের হদিস কত্তে পারবি? পারবি না। তোমার বর নিয়ে যাবে আমরা।'

রক্তনা চুপ করে আছে দেখে কুড়ানি ঠাকরুন কের বললেন, 'ছেলেটি ভালই। দয়াদায়ক আছে মনে হল। তোকে গছন্দও হয়েছে। বাড়ির আপত্তি হলে বলব, বামুনের মেয়ে নিয়ে জাতে উঠবে—আবার অত কথা কিসের বাপু?'

রক্তনা প্রায় চোঁচিয়ে উঠল, 'কী, হচ্ছে কী ঠাকুমা? গাঁট্টা খাবে বলে দিচ্ছি।'...

মধুরবাবুর সাধুসঙ্গ

রত্নভক্তার ডিসপেন্সারির দরজা খোলেন সাতটা নাগাদ। কম্পাউণ্ডার কানাই কোনো কোনো দিন আগে চলে আসে। তাই বলে তাকে ডিসপেন্সারির চাবি দেবার পাত্র নন রতিকান্ত। বাড়ির দরজা দিয়ে বেরিয়ে যদি দেখতে পান কানাই বারান্দার সিমেন্টের বেঞ্চে বসে আছে, ডেকে বলেন, 'আয় কানাই! দাদাভাই মিলে বাজারটা সেরে আসি।' বাজারে লোভনীয় কিছু কিনতে দেখলেও কানাই আশা করে না যে ভক্তারবাবু তাকে এবেলা খেতে বলবেন।

আগের কম্পাউণ্ডার হরেন চুরি করে ওষুধ বেচত। সেই থেকে বিশ্বাস ঘুচে গেছে। তবে কানাই ছেলেটির স্বভাবচরিত্র ভালই মনে হয়। রতিকান্ত রায় সে আমলের এল এম এক। কালক্রমে পসার কিছুটা কমে গেছে। বসন্তপুরে এখন দুজন এম বি বি এস প্রাইভেট প্র্যাকটিস করে দেবার কামাচ্ছেন। ওদিকে সরকারী হাসপাতাল, ক্যামিাল প্ল্যানিং-কাম-মাতৃসদনেও অনেক কজন ডাক্তার।

ভবু রোগীর সংখ্যাও দিনে দিনে বেজায় বেড়ে চলেছে। তাই রক্তিকান্তের ডিসপেন্সারি একবারে ফাঁকা পড়ে থাকে না, পয়সাওলা রোগী না আহুক।

এদিন বাজার সেরে এসে চা-কা খেয়ে ডিসপেন্সারির দরজা খুলে রত্নভক্তার কানাইয়ের বদলে মধুরবাবুকে দেখে অবাক হলেন। দরজা থেকে উকি মেরে বললেন, ‘কে হে? মধুরকেষ্ট নাকি? ও কি খাচ্ছ ওখানে বসে?’

মধুরবাবু লাজুক মুখভংগি করে বললেন, ‘এই একটু ব্রেকফাস্ট করছি আর কী!’

হা হা করে হাসলেন রত্নভক্তার। ‘ব্রেকফাস্ট করছ? ওইখানে বসে? রাধেমোবব! ওখানে রাজ্যের রুগী এসে বসে থাকে। তোমার আর কাণ্ডজ্ঞানের বালাই নেই।’

মধুরবাবুর কপালে আর চোঁটের নিচে কালো ছোপ। ঘা শুকিয়ে গেছে প্রায়। কোয়ার্টার পাউণ্ড শক্ত ইট পাউরুটি চিবুচ্ছেন আর হাতে ছোট্ট প্লাস্টিকের মগে খানিকটা চা। বললেন, ‘ভারর দোকানে ভীষণ ভিড়। বসার জায়গা পেলাম না। দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে তো খাওয়া যায় না। তাই এখানে এসে বসলাম। আদ ভক্তার, রুগীর কথা বলছ? রেসিড্যান্স পাওয়ার আমার বরাবর ভেরি ভেরি স্ট্রং।’

অকারণ একবার জিভ চুক চুক করে মাথা নাড়লেন রত্নভক্তার। বারান্দায় গিয়ে এদিক-ওদিক তাকিয়ে কানাইকে খুঁজলেন। এখানে-ওখানে চায়ের আড্ডা চলেছে শীতের সকালে। নামেই সকাল, এখনও রোদ্দুরকে কুয়াসা থেকে আলাদা করে চেনা যায় না। হাইওয়ে এখানে খুব চওড়া হয়ে বসন্তপুরে ঢুকেছে। রাস্তায় গাড়ির ভিড় নেই। এখন শীতকাতুরে লোকেরা একটু কুঁজো হয়ে হাঁটছে। মুখ দিয়ে ভাপ বেরুচ্ছে শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে। কিছুটা দূরে বাজারের দিকটা য় ভিড় জমতে শুরু করেছে। চাপা গুঞ্জন কানে আসে।

রত্নভক্তার বললেন, ‘কানাইটার কাণ্ড দেখছ?’

মধুরবাবু বললেন, ‘ঊ?’

‘হ্যাঁ হে মধুরকেষ্ট!’ রক্তিকান্ত ঘুরালেন ঊঁর দিকে। তারপর আরও অবাক হয়ে বললেন, ‘ও কিসের ওপর বসে আছ? কী ওটা?’

মধুরবাবু হাসবার চেষ্টা করে বললেন, ‘বেভিং।’

‘বেভিং!’

‘হ্যাঁ। আমার আজকাল ভোজনং যত্রতত্র শয়নং হট্টমন্দিরে। তাই সঙ্গে নিয়েই ঘুরি।’

‘সে কী! কমলাক্ষের বাড়িতে আর থাকো না তুমি?’

মধুরবাবু গোলামী জোরে মাথা নাড়লেন। ‘নাঃ! কী দরকার ভাই পরের দোরে থেকে? ওতে লিবার্টি থাকে না। এশপ্‌স্‌ ফেবলস পড়েছ তো? ঘরের কুকুর আর রাত্তার কুকুরে দেখা হল—ঘরের কুকুরের গলায় চেনের দাগ।’ মধুরবাবু প্যাউন্টির শেষ ডেলাটা মুখে পুরে প্ল্যাস্টিকের মগে চুমুক দিলেন। গলার নলী কাঁপতে থাকল।

রতিকান্ত ততক্ষণে একটু সতর্ক হয়েছেন। এসব ক্ষেত্রে গায়ে পড়ে খবরা-খবর না নেওয়াই ভাল। উদাস দৃষ্টি কানাইকে খুঁজতে থাকলেন রাজপথে। কানাই এসে বাঁদ্র দেবে মেঝেয়। জীবাণুনাশক ওষুধ-মেশানো জল ছড়াবে। ধূপ-ধুনো দেবে। প্রেসক্রিপশানের কাগজ কেটে হুতোয় গাঁথবে। এখন কত কী খুচরো কাজ। নীতকাল বলে রুগী আসতে একটু দেরি হবে। ততক্ষণে তৈরি হওয়া দরকার।

মধুরবাবু চা খেয়ে ঢোলা কোটের পকেট থেকে সিগারেট-দেশলাই বের করে বললেন, ‘চলবে নাকি ডাক্তার?’

রতিকান্ত গুম হয়ে বললেন, ‘থাক। পরে।’

‘রাত্তিতে আজ মন্দিরতলায় ছিলুম। চারদিক ঘেরা জায়গা।’ মধুরবাবু বললেন। ‘ভাগ্যানুমে সাধুসঙ্গ পেয়েছিলুম, বুঝলে ডাক্তার? গঙ্গাসাগর থেকে পায়ে হেঁটে আসছে। সেই হিমালয়ে ফিরবে। বোঝো অবস্থা। ভোরবেলা চলে গেল লোটাকম্বল গুটিয়ে। আমায় জাগিয়ে দিয়ে গেল। তখন বেরিয়ে পড়লুম।’

রতিকান্ত হাসলেন অনিচ্ছাসহেও। ‘তাহলে রাত্তিরে শিবের প্রসাদ ভালই জুটেছিল?’

‘হ্যাঁ।’ খুশি মুখে জবাব দিলেম মধুরবাবু। ‘দবিমচ্ছব যাকে বলে। এখনও চোখের অবস্থা দেখছ!’

‘মারা পড়বে মধুরকেষ্ট!’ রত্নডাক্তার শাসনের স্বরে বললেন। ‘তোমার লাংসের অবস্থা তো তুমি টের পাচ্ছ না, আমি পাচ্ছি।’

‘তা তো পাবেই। তুমি ডাক্তার।’ গলগল করে ধোঁয়া ছাড়লেন মধুরবাবু।

‘তোমার ব্রেন পর্যন্ত শুকিয়ে যাক্ সাবধান। এরপর ইঁকানি ধরবে। তারপর বন্ধ উন্মাদ হয়ে যাবে।’

‘হোক না।’ থিকথিক করে হাসতে লাগলেন মধুরবাবু। ‘উন্মাদের বড় হুখ। যাকে খুশি ঢিল মারব। আমায় পায় কে?’

রতিকান্ত ভেতরে ঢুকলেন। কানাইয়ের জন্ত অপেক্ষা করা আর

উচিত নয়। বিকে গিয়ে বলতে হবে। গলা চড়িয়ে ডাকলেন, ‘রাহু!
ও রাহু!’

রাহু রত্নডাক্তারের মেয়ে। তিন বোনের ছোটটি। বড় দুটিকে পার
করেছেন। ছোটটি এখনও ফ্রকের বয়স পেরায় নি। ভেতর দিয়ে উকি দিয়ে
রাতকান্ত বিকে পাঠিয়ে দিতে বললেন। আর ঠিক সেই সময় কানাই হাজির।
কানাই কাঁচুমাচু হেসে বলল, ‘পথে একজায়গায় একটু দেরি করে কেললুম
ডাক্তারবাবু। মন্দিরতলার ওখানে গুণ্ডগোল দেখে...’

ডাক্তার গম্ভীর মুখে বললেন, ‘এখনও ছেলেমি তোমার যায়নি বাপু। কী
গুণ্ডগোল?’

‘তিনচারজন সাধু এসেছে। রাত্তিরে কে ওদের কাছে শুয়েছিল। সাধুরা
লোক জড়ো করেছে—সেই লোকটা নাকি টাকাকড়ি চুরি করে পাশিয়েছে।’

রতিকান্ত দরজার ভেতর দিয়ে দৃষ্টি চালিয়ে মধুরবাবুকে বিধলেন। ‘পুলিশে
যাক না। অত কথা কিসের? যতঃ সব। নাও, নিজের কাজ করো।’

মধুরবাবু তড়াক করে লাকিয়ে উঠেছেন সঙ্গে সঙ্গে। ‘শালারা তাই বলছে
বুঝি? রাঙ্কেল কাঁহাকা! রোস, গিয়ে মজাটা দেখাচ্ছি। ইস। সাধু হয়েছে
তো মাথা কিনে নিয়েছে।’

বুদ্ধিমান কানাই টের পেয়েই মুচকি হেসে বলল, ‘যান না। পুলিশে খবর
চলে গেছে।’

মধুরবাবু বৌচকা আর মগ নিয়ে একলাকে নিচে নামলেন। তারপর
ডাক্তারের উদ্দেশ্যে বললেন, ‘এ কি বিশ্বাসযোগ্য কথা হল? তুই ব্যাটারা
সংসারভ্যাগী পুরুষ। তোদের আবার টাকাকড়ি? কৈ সে গুথেকোর ব্যাটারা?
একটা-একটা করে চুলদাড়ি উপড়ে বুদ্ধাবনে পাঠিয়ে দেব।’

বলেই তিড়িং বিড়িং করে হাটতে লাগলেন মধুরকৃষ্ণ। কানাই হাসতে
হাসতে বলল, ‘গেলে বিপদ বাধবে ওনার। ঠাকুরঘরে কে রে, আমি তো কলা
খাইনি—সেইবকম হল। তাই না ডাক্তারবাবু?’

রত্নডাক্তার বললেন, ‘নিজের চরকায় তেল দাও। যাও, নিজের চরকায় তেল
দাও।’...

ঘন্টা দুই পরে রোগীর ডিড় ঠেলে কমলাক্ষের কনিষ্ঠপুত্র অরুণি হাজির।
‘ডাক্তারকা, মধুরদা আসেনি আপনার এখানে? শুনলুম সকালে...’

ডাক্তার দ্রুত বললেন, ‘হ্যাঁ। তারপর তো মন্দিরতলায় যাচ্ছি বলে গেল।
কী হয়েছে?’

অরুণি ক্রুদ্ধভাবে বলল, ‘পুলিশ গিয়েছিল আমাদের বাড়ি ওর খোঁজে। সাধুবাবাদের টাকা চুরি করেছে নাকি। ছ্যা ছ্যা, লোকটার জন্ত আর মানসন্মান রইল না আবাদের।’

রতিকান্ত নির্বিকার মুখে প্রেসক্রিপশান লিখতে লিখতে রুগীর পেট ধামচে ধরে বললেন, ‘বাখা ?’...

যার প্রতীক্ষায় কুড়ানি ঠাকরুন এতদিন অস্থির, সেই মাছুষটি সাতসকালে এসে হাজির। একেবারে সেজেগুজে তৈরি হয়েই। ঢোলা কোট, পায়ে জুতোমোজা, মাথায় হুহুমান-টুপি এবং বগলে কম্বলপত্র। রক্তার শীত চলে গেছে। মুখে অনর্গল বাঁকা-ছিরামপুরের কথা।

মধুরকৃষ্ণ একেবারে ঘরের ভেতর ঢুকে বসে আছেন। বলেছেন, ‘কমলমামারা কেউ জানলে বাগড়া দেবে। যেতেই দেবে না। বদ্দ ভালবাসে কি না। ভাই বলছি, রনি মা আর অপু মা, যেন কাউকে বলো না আমার কথা। কেমন?’

অপক্লপার চায়ের নেশা আছে। বাজারে ডেয়ারির একটা খুচরো দোকান হয়েছে। সেখান থেকে দুধ এনে ঠিঠোনের রোদে বসে চা খাচ্ছিল। কুড়ানি ঠাকরুনও একটু খান কদাচিৎ। রজনী পিঠে রোদ নিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল একটা ইংরেজি পত্রিকার ওপর। হাতে চায়ের গেলাস। আগের পত্রিকাটা ফেরত দিয়ে বিপাশার কাছে আরেকটা এনেছে। ভাগিাস, শতজু কলকাতা গেছে। কদিন থাকবে সেখানে। সিঙ্গিবাড়ি অনেক দোনাযনা করেই ঢুকেছিল রজনী। পত্রিকাটা তো ফেরত দিতেই হত। তবে শতজুর তাদের বাড়ি যাওয়ার কথা বলেনি বিয়াসদিকে। গিয়েই বুকেছিল, শতজুও কথাটা বলেনি বোনকে।

মধুরকৃষ্ণ খিড়কির দোর দিয়ে চুপিচুপি ঢুকছিলেন। এরা হতচকিত একেবারে ...।

রাতের ট্রেনে নিমতিতে রওনা হবেন ঠাকরুনকে নিয়ে। দিনসবরে গেলে মামাবাড়ির লোকের চোখে পড়ে যাবেন যে। রজনী আপত্তি করে বলল, ‘এই শীতের রাতে? ঠাকুমা। তোমার মাখা খারাপ?’

মধুরবাবু বললেন, ‘কিছু অস্বস্থি হ-ব না রে পাগলী মেয়ে। আমি রেলের লোক ছিলাম না বুঝি? বুড়িমা গিয়েই দেখবেন। ট্রেনে টিকিট পর্যন্ত কাটতে হবে না। নিমতিতেই নেমে বাকি রাত্তিরটা থাকবা অগস্ত্যবাবুর কোয়ার্টারে।’

রজনী সন্দ্বিষ্ট হয়ে বলল, ‘কে সে?’

‘স্টেশনমাস্টার। আবার কে? আমার বুজম ফ্রেণ্ড। ভাবিস নে। কোনো

কষ্ট হবে না তোর ঠাকুয়ার।’ মধুরবাবু সহান্তে বললেন। ‘ওঠা-নামার রেলের লোকের সাহায্য পাব। আর আমি তো আছিই।’

অপরূপার ভাল লাগছিল না ব্যাপারটা। বলল, ‘ঠাকুয়ার সবটাই মিস্ট্রিয়াস। না জেনে শুনে আন্দাজে কোথায় গিয়ে হতো হবে—বুঝবে ঠ্যালা। সেখানে এবয়সে আর না গেলেই নয়? এ্যাদিন যেতে কী হয়েছিল?’

বৃদ্ধা এককথায় বললেন, ‘আমি যাব।’

রজনী বলল, ‘মধুরকাকা। ঠাকুমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যে যাচ্ছেন, পৌছে দেবে কে?’

মধুরবাবু এবার চিন্তিত-হয়ে বললেন, ‘বাপের বাড়ি এতকাল পরে যখন যাচ্ছেন, বাবা না থাক, আত্মীয়স্বজন বংশধর সবাই আছে। তারা তো সহজে ছাড়বে না মা। কদিন থাকতে বলবে। এখন, আমি হচ্ছি গে আউটসাইডার। আমি কোন মুখে থাকব সেখানে—সেটাই প্রব্রেম।’

কুড়ানি ঠাকরুন বললেন, ‘যাব, আর তক্ষুণি চলে আসব।’

রজনী বলল, ‘সে কী! তাহলে যাওয়া কেন?’

‘একবার চোখের দেখা দেখব।’

‘ভ্যাট!’ রজনী বিরক্ত হল। ‘কাকে দেখবে শুনি? কে আছে তাও তো জানো না।’

বৃদ্ধা আন্তে বললেন, ‘ভিটেটুকুন দেখব। তাতেই পূর্ণা ভাই।’

অগত্যা রজনী বলল, ‘মধুরকাকা, তাহলে কিন্তু আপনার সব দায়িত্ব নিয়ে যাবেন, আবার সঙ্গে করে নিয়ে আসবেন। কেমন?’

মধুরবাবু বললেন, ‘তাহলে আর কথা কী? প্রব্রেম ইজ সল্ভড্।’

রজনী বলল, ‘লাউশাকে মটরডাল রাঁধব। অবশ্য ফুলকপির সঙ্গে কইমাছও আনবি। ঠাকুমাকে ভাল করে থাইয়ে দাইয়ে ব্রাইট করে বাপের বাড়ি পাঠাই। কী বলিস? আজ ঠাকুমাকে আমরাই রেঁধেবেড়ে থাওয়াই।’

অপরূপা অত্মদিকে তাকিয়ে বলল, ‘আমার কাছে পয়সা নেই।’

‘কবেই বা থাকে।’ রজনী রেগে গেল। ‘টিউশনি করিস যে বড়। কী হয় সেগুলো?’

অপরূপা বলল, ‘বাঃ! আমার খরচা নেই? কত জায়গা ছোট্টাছুটি করতে হয় না আমাকে?’

‘বেশ। আমিই টিউশনি ধরব এবার।’

‘ধরিস না কেন? তোকে কেউ মানা করেছে? এ্যাদিন ধরা-উচিত ছিল।’

‘তুই বকবি ভেবে ধরিনি ।’

অপরূপা রেগে বলল, ‘আমি বকব ? আমার বকার ধার ধরিস খুব ! দিনরাত তো এপাড়া-ওপাড়া টোটে করে ঘুরে বেড়াস ।’

বোনে-বোনে মাঝে মাঝে বেধে যায় । কুড়ানি ঠাকরুন হাসতে হাসতে ক্রাচ তুলে বললেন, ‘অ লা মুখপুড়ীরা ! এবার খাম দিকিনি । এক ভদ্রলোক ঘরে বসে রয়েছে, খ্যাল নেইক তোদের ?’

ভদ্রলোকটি শুনছিলেন । বেরিয়ে এসে বললেন, ‘বাজার করা নিয়ে ঝগড়া । আমার যে উপায় নেই, নৈলে যেতুম । বাজারে আজ প্রচুর মাছের আমদানি দেখে এসেছি । তবে যাই বলো, এ শীতের সময়টা ভেজটেবেলসের স্বাদ অমৃত । পালংশাকে বড়ি, লাউশাকে মটরডাল—ইস ! অবশ্য ফুলকপির সঙ্গে কইমাছও জমে ভাল । শীতের কই চর্বিতে জ্বজ্ব করছে ।’

রঙ্গনা গুম হয়ে গিয়েছিল । এবার বলল, ‘ঠাকুমা আমি যাচ্ছি । পয়সা দেবে ?’

কুড়ানি ঠাকরুন পেটের ভেতর থেকে একটা পাঁচটাকার নোট বের করে কিসকিসিয়ে বললেন, ‘সব খচা রিস নে যেন । দূরের পথ । আমার কাছে বেশি পয়সাকড়ি নেই ।’

অপরূপা ভুরু কুঁচকে দেখছিল । বলল, ‘রেখে দাও । আমার কাছে আছে ।’ সে তার ঘরে গিয়ে একটা পাঁচটাকা এনে রঙ্গনার হাতে গুঁজে দিল ।

রঙ্গনা টাকাটা হাতে ধরে বলল, ‘আমি পারি ওসব ? করেছি কোনোদিন ?’

‘তুমি কিছুই পারো না ।’ অপরূপা টাকাটা কেড়ে নিয়ে খলে আনতে গেল । গজ গজ করে বলল ফের, ‘পারো শুধু ইয়ে করতে ।’

রঙ্গনা আহত দৃষ্টে তাকিয়ে রইল । দিদি কী বলতে চাইছে তার মাথায় ঢুকল না । মধুরবাবু ডেকে বললেন, ‘অপুমা ! যাচ্ছিস যখন, এক প্যাকেট সিগারেট আনবি । কেমন ? আহা, পয়সা আমি দিচ্ছি । এই নে ।’

মধুরবাবুর তুই-তোকারি শুনতে রাজি ছিল না অপরূপা । ভাল করে চেনেও না ভদ্রলোককে । শুধু জানে কমলাক্ষবাবুদের বাড়িতে থাকেন । মাঝে মাঝে বই বেচতে আসেন রঙ্গনাকে ।

কিন্তু এ মুহূর্তে তার মনে অগ্র ভাব । ঠাকুমার জন্যে মনটা কেমন করছে । এতদিন সে তো ঠাকুমাকে এভাবে ভাবে নি । ভাবে নি ঠাকুমারও বাপের বাড়ি বলে কিছু থাকতে পারে—কতকাল সেখানে যাওয়া হয়নি ঠাকুমার ।

ঝোঁকের মাথায় অপরূপা আরও কয়েকটা টাকা সঙ্গে নিয়ে বেরল ।

অনেক—অনেকদিন পরে এই সজ্জলতা সংসারে। এতরকম তরকারি, সত্যি সত্যি ফুলকপির সঙ্গে কই মাছ, কাটা রুই। কুড়ানি ঠাকরুন কবে হবিষ্টি এবং পালন-টালন করতেন, সবাই ভুলে গেছে। পেটের জ্বালা বড় জ্বালা। তাঁর জন্মে আলাদা করে নিরিম্বিষ রান্নার প্রস্তুতি ওঠে না। গৌরবাবু যতকাল বেঁচে ছিলেন, সে একরকম গেছে—কালক্রমে অল্প একরকম অবস্থা সংসারে। নিয়ম মানা কঠিন। তবে তার মধ্যে যতটুকু পারা যায়। মাছ বাদ দিয়ে একটুকরো ফুলকপি মুখে করতেনই হল। নাতনিরা নাছোড়বান্দা আজ। ঠেসে খাওয়ার তালে ছিল। মুখে আর রোচে না কিছু, দাঁত অবশ্য আছে। প্রকৃতি একটা পায়ে ঘা মেরেছেন, কিন্তু অঙ্গদিকে যেন পুষিয়ে দিয়েছেন। এবয়সে চিবিয়ে খেতেও পারেন।

মধুরবাবুর খাওয়ার বহর দেখতে হয়। খেয়ে সটান অপরাধের খাটে গিয়ে গড়িয়ে পড়লেন। নিজের কঞ্চলটি চড়াতে ভুললেন না। একটু পরে নাক ডাকিয়ে ঘুমোতে শুরু করলেন। রাতে ঘুমটা ভাল হয়নি—শিবের প্রসাদেও।

দুই নাতনি বৃদ্ধাকে এবেলা পিঙ্গির মতো শিরে রেখেছে। কুড়ানি ঠাকরুনের চোখে জল এসে গেল। এত ভালবাসা তো টের পাননি এতকাল। তাঁরই পয়সায় সংসার চলেছে। অথচ উন্টে তাঁকেই পাঁচকথা শুনিয়ে ছেড়েছে অনেক সময়।

শীতের বেলা পড়ে এল হ হ করে। রাত আটটা পাঁচের আগে চাপতে হবে। পাছা ঘষটে এটা-ওটা নাড়াচাড়া করে বেড়ালেন কুড়ানি ঠাকরুন। পুরনো কাঠের সিন্দুকে কতবার হাত ভরে কত কী বের করলেন। আবার রেখে দিলেন। দুই বোন ঠাকুরমার কাণ্ড দেখে হেসে খুন।

সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় রিকশা ডেকে আনল অপরাধ। কাচা খান পরে গায়ে গুটি হুটি একটা প্রাচীন কান্দীর আলোয়ান জড়িয়ে কুড়ানি ঠাকরুন তৈরি। তাঁর মুখখানা শঠনের স্নান আলোয় আজ রকমকর করছিল। বোঁবনে দারুণ ক্ষুদ্রী ছিলেন তাহলে—নাতনিরা অবাক হয়ে ভাবছিল।

রিকশায় মধুরবাবু কঞ্চল মুড়ি দিয়ে বসলেন। শুধু নাকটুকু জেগে রইল। ওঠার সময় হঠাৎ কুড়ানি ঠাকরুন দুহাতে দুই নাতনিকে জড়িয়ে হুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন। ক্রাচ পড়ে গেল। রক্তনা না ধরলে আছাড়ই খেতেন।

রক্তনার হাতে একটা গ্রাকড়ায় বাঁধা কিছু টাকাপয়সা ঝঞ্জে দিয়ে বৃদ্ধা বললেন, ‘বাব—আর আসব। বৃদ্ধি করে চালিয়ে নিও। গাছপালাগুলান দেখো। বাড়ি ছেড়ে কোথাও বেরিও না। আর অপু, রনিকে একলা রেখে

কোথাও যেওনা। পই পই করে বলে যাচ্ছি। দুবোনে একত্তর থাকবে। একত্তর শোবে। আর অনি যদি আসে, তাকে আটকে রাখবে। আমার দিবিয় দেবে।’

রজনী ভিজ়ে চোখে বলল, ‘আমি যাই বরং টেশনে।’

মধুরবাবু জন্ত বললেন, ‘কী দরকার? রিকশোয় জায়গা হবে না।’

বৃদ্ধা বললেন, ‘অপু একলা থাকবে।’

অপক্লপা বলল, ‘মধুরকাকা, প্রাজ লক্ষ্য রাখবেন।’

মধুরবাবু বললেন, ‘কিছু বলতে হবে না। কিছু বলতে হবে না। রেসপন-সিবিলাটি আমার।’

কুড়ানি ঠাকরন বললেন, ‘ভোরবেলা ছকু পাঙা পুজোর ফুল নিতে আসবে। নিজে হাতে পেড়ে দিও। ওকে গাছে হাত দিতে দেবে না। তছনছ করবে। পয়সা চেও না। মাসকাবারি দিয়ে যায়। আর কেউ লাউটা শশাটা কিনতে এলে বুদ্ধি করে বেচো। না পারলে বলো, ঠাকুমা আস্থক।’

দুইবোনে একসঙ্গে বলল, ‘ছাড়ো তো ওসব কথা। দুর্গা দুর্গা দুর্গা।’

রিকশা অন্ধকারে মিশে গেল ঘণ্টি বাজাতে বাজাতে। দুইবোন তবু কতক্ষণ ধাড়িয়ে আছে।

শতক্রুর পাত্রী দর্শন

বাবাকে শতক্রু কোনোদিন তত আমল দেয় নি। এখনও তাই। কিন্তু মামাকে বড় সমীহ করে চলে। মামা ব্রজেন্দ্র দেখতে রাশভারি মাফুষ হলেও অমায়িক প্রকৃতির। বি এন বোস এন্টারপ্রাইজের মালিক তিনি। এক্সপোর্ট-ইমপোর্টের দালালী, সরকারী এবং বেসকারী কোম্পানিতে অর্ডার সাপ্লাই, কখনও মাঝারি ধরনের কনসট্রাকশানের কাজে জীবন কাটিয়ে এখন অবসর নেবার তালে আছেন। তিন ছেলে চুটিয়ে বাবার কোম্পানি চালাচ্ছে। এখন দেশে ও বিদেশে নানা জায়গায় ব্রাঞ্চ খুলেছে। সদর অফিস চৌরঙ্গীতে এক বহুতল প্রাসাদের নবম তলায়। পাঁচবছর পরে শতক্রু এতটা উন্নতি দেখে অবাক হয়েছে। তার মনে হয়েছে, এদেশে কিছু-কিছু লোক যেন একেকটি লাখে পাহাড় ডিঙিয়ে চলেছে

এবং বাকি লোকেরা সমতলে জল-কাদায় পড়ে হাত-পা ছুঁড়ছে। এ এক উদ্ভট অবস্থা।

ব্রজেন্দ্র আসলে ভায়েকে ডেকেছিলেন কনে দেখতে। শতজ্বর প্রকৃত গার্জেন তিনিই। স্থল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজা পার করে মার্কিনমূলকে পাঠানো পর্যন্ত সবচেয়ে তাঁর হাত আছে। এবার একখানা উৎকৃষ্ট জীৱন্ত ভায়েকে জুটিয়ে দিলেই তাঁর দায়িত্ব শেষ।

ইংরেজি পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেবার উদ্দেশ্য ছিল উচ্চবিত্ত অত্যাধুনিক পরিবারের কনভেন্টপড়া পাত্রীর সন্ধান। ব্রজেন্দ্র নিজের ছেলেদের বেলায় একাই করেছেন। কিন্তু তারপরই তিনি মত বদলেছিলেন। পরিবারের কর্তাহিসেবে তাঁর অভিজ্ঞতা তত সুখের হয় নি। জীৱাতি সম্পর্কে তাঁর অবচেতনায় যে আদর্শ ছিল, তার সঙ্গে মেলেনি বলে মনে মনে ক্ষুব্ধ ছিলেন। ধোঁকের বেশে বা পূর্বঅভ্যাসে ভায়ের বেলায় তাই করতে গিয়ে সামলে নিয়েছেন দ্রুত। সনাতন ভারতীয় আদর্শটি অবচেতন থেকে এই কয়েকটা দিনে চেতনে ফুটে বেরিয়েছে। তখন বিজ্ঞাপনের জবাবে যত চিঠিপত্র এসেছিল, ওয়েস্টপেপার বাস্কেটে ছুড়ে ফেলেছেন। একালে শুধু উচ্চবিত্ত নয়, মধ্যবিত্ত পরিবারেও যে এত ইংরেজি মাধ্যমে পড়া পশ্চিমী এটিকেট-দুরন্ত মেয়ে আছে, তলিয়ে ভাবেন নি ব্রজেন্দ্রনাথ।

বিশ্বস্ত লোকজনের স্বত্রে তিনটি পাত্রীর সন্ধান এসেছে। একটা ভাটপাড়ায়, একটা চুঁচড়ো অগুতা বারাসতে। বনেদী রাঢ়ী কায়স্থ পরিবার সবাই। মোটামুটি পয়সাকড়ি আছে। পাত্রীরাও অসাধারণ সুন্দরী। দেবধিজে ভক্তিপরায়ণা। রজনপটিয়সী, গৃহকর্মনিপুণা ইত্যাদি ইত্যাদি।

প্রারম্ভিক যোগাযোগের পর শতজ্বকে ট্রাংককল করেছিলেন ব্রজেন্দ্র। বসন্ত পুরে বছর দুই হল টেলিফোন এক্সচেঞ্জ হয়েছে।

শতজ্বর আসার পর ব্রজেন্দ্র ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলেছেন। ‘দেখ বাপু, জীৱাতি, জীৱাধীনতা এসব কথা মুখে যতই বলি, তবুহিসেবে মনেতে যতই ভাল লাগুক, মাহুষের বাস্তব জীবনটা সম্পূর্ণ অগ্ররকম। প্রকৃতি এমন অসম করে সৃষ্টি করেছেন। মাহুষ নাচার। জীৱালোকের শিক্ষা বলা, স্বাধীনতা বলা, তার রীতিটা পুরুষের নকল হবে কোন মুক্তিতে? পুরুষের শিক্ষার লক্ষ্য হবে আদর্শ পুরুষ হওয়া আর মেয়েদের শিক্ষার লক্ষ্য হবে আদর্শ মেয়ে হওয়া। তেমনি উভয়ের স্বাধীনতাও থাকবে ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে। পুরুষ মজ্জপান করে রাস্তায় মাতলামি করতে পারে, মেয়েদের তা সাজে না। পুরুষ প্রয়োজনে মাহুষ খুন করতে পারে। মেয়েরা তা করবে কোন মুখে? তাছাড়া একেকজনের শারীরিক শক্তি সামর্থ্য একেক ক্ষেত্রে

প্রকাশ পায়। মেয়েদেব পুরুষ হয়ে ওঠাটা বড় বিপত্তিকর। জীবনে দুঃখকষ্ট আসে ওতে।...

বক্তৃত্যটি অনাবশ্যক রকমের দীর্ঘ হল। শতজ্ঞ মামার মুখের ওপর কথা বলতে পারে না। কিন্তু তার সায় ছিল। ফাঁক পেয়ে সে বলল, ‘আমি সম্পূর্ণ একমত মামাবাবু। এতদিন ধরে চোখের সামনে ওয়েস্টের লাইফ তো দেখলুম। ট্র্যাজিক। এখন ওরা—মানে পুরুষরা দুঃখ করে বলছে, এটা ঠিক হয়নি। কিন্তু সমাজের গতি তো উন্টোদিকে ঝোরানো যাবে না। ওদের পারিবারিক এবং দাম্পত্য জীবন একেবারে দেউলিয় হয়ে গেছে।’

ব্রজেন্স বললেন, ‘আমাদের শাস্ত্রে জীবনকে ভয়ংকরী বলা হয়েছে।’ বলেই গলার স্বর চাপলেন। শতজ্ঞর মামা সবিতা অদূরে বসে বাসি কাগজের পাতা ওন্টোচ্ছেন। এক নাভনি পিঠে সেটে দুহাতে গলা জড়িয়ে রয়েছে। ব্রজেন্স বললেন, ‘এখানেও ওয়েস্টের বায়ু প্রবল। মফস্বলে এখনও সেটা কম। গ্রামে তো নেই-ই। তবে তোমার সঙ্গে মানসিক আদানপ্রদানের ক্ষমতাটা দেখতে হবে। একেবারে গ্রামা হলেও চলবে না, আবার

শতজ্ঞ ঝটপট বলল, ‘গ্রামেও আছে। মানে থাকতে পারে আজকাল তো আর সেরকম গ্রাম নেই। আমাদের বসন্তপূরের কথাই ভাবুন না।’

মামা-ভাগ্নেয় এ নিয়ে অনেকক্ষণ কথাবার্তা চলতে থাকল সে-বোনা।

পরদিন থেকে পাত্রীদর্শন শুরু হল শতজ্ঞর। প্রথমে ভাটপাড়া, তাবপর বারাসত, শেষে চুঁচুড়া। ব্রজেন্সর এক হিতৈষী বন্ধু এক বেয়াই এবং তাঁর কোম্পানির ধোঁ কর্মচারী-ভরলোক এসব সন্ধান দিয়েছেন, তিনি—এই তিনসঙ্গী এবং স্বয়ং পাত্র শতজ্ঞ,

গার্জেনরা তাড়া দিলেও কোনো পাত্রীকে কোনো প্রপ্নই করল না শতজ্ঞ। সে মিটিমিটি হাসছিল শুধু। চুঁচুড়া থেকে শেষ দেখাব পর রাত্রে ব্রজেন্স ভাগ্নেকে মতামত জানতে চাইলেন।- মামীর সামনে সংকোচ হতে পারে ভেবে ব্রজেন্স শতজ্ঞকে একান্তে নিয়ে গিয়েছিলেন।

শতজ্ঞ হেসে বলল, ‘আচ্ছা। ভেবে দেখি।’

‘দেখি কোরো না।’ ব্রজেন্স বললেন, ‘তোমার ছুটি ফুরিয়ে যাবে। তার আগে শুভকাজ শেষ করা চাই। বউমা না হয় পরে যাবে। সব ব্যবস্থা করে পাঠিয়ে দেব’খন। নিউইয়র্কে আমাদের নতুন অফিস হচ্ছে শিগগির। সেখানে লোক যাবে। ছোটকুও যেতে পারে। তার সঙ্গে বউমা যাবে। অস্থবিধে কিসের?’

শতক্ষ শুধু হাসল।

ব্রজেন্দ্র বিরক্ত হয়ে বললেন, ‘এ হাসিতামাশা নয় বাপু। এ লাইক এ্যাও ডেথ কোশেন। নাকি কোনোটাই পছন্দ হল না? তাও বলো খুলে। আবার খোঁজখবর নেব বরং।’

এবার শতক্ষ আশ্তে বলল, ‘ধরুন, যদি গ্রামেই পছন্দমতো মেয়ে থাকে, আপনি কি আপত্তি করবেন?’

ব্রজেন্দ্র ওর চোখে চোখ রেখে বললেন, ‘গ্রামে। কোন গ্রামে? কোথায়?’
‘বসন্তপুরে।’ বলে শতক্ষ চোখ নামাল নিজের হাঁটুর দিকে।

ব্রজেন্দ্র চেয়ারে সিঁথে হয়ে বসলেন। ‘তোমাদের বসন্তপুরে? সে কী। কোন বাড়ির মেয়ে? কেমন অবস্থা?’

শতক্ষ সংকোচে হাসল। ‘অবস্থা ভাল না। ভীষণ গরীব।’

ব্রজেন্দ্র হো হো করে হেসে উঠলেন। ‘তা ভাল। গরীবের কন্ডাদায় উদ্ধারে আপত্তি নেই। কিন্তু শিক্ষাদীক্ষা?’

‘শুনেছি কলেজে বছরখানেক পড়েছে।’

‘হঁ। তোমার সঙ্গে শিক্ষাগত ব্যবধান বড় বেশি হয়ে গেল না?’

‘না।’ শতক্ষ তার স্মার্টনেস ফিরে গেল। মুখ তুলে ফের বলল, ‘না। শি ইজ অলরাইট। ইংরেজি বইটাই পড়াশোনা করে। মেরিটোরিয়াস স্টুডেন্ট ছিল।’

‘তোমাদের ক্যামিলির দিক থেকে অসুবিধে হবে না তো? শুনেছি গ্রামাঞ্চলে বড় দলাদলি। তোমার বাবার আপত্তি না থাকলেই হল।’

শতক্ষ গলার ভেতর হেসে বলল, ‘ভীষণ হবে। তাছাড়া...’

‘তাছাড়া?’ ব্রজেন্দ্র তাক দৃষ্টি ভায়েকে দেখতে থাকলেন।

‘ওরা কুলীন ব্রাহ্মণ। মুখার্জি।’ শতক্ষ শুকনো হাসল। ‘আমরাও তো কুলীন কায়স্থ।’

ব্রজেন্দ্র গম্ভীর হয়ে গেলেন। ‘কলকাতা মেট্রপলিটন সিটি। এখানে আজকাল এসব জলচল। কিন্তু বসন্তপুর তো আদতে গ্রাম। মেয়ের গার্জেন কে?’

‘গার্জেন তেমন কেউ নেই। এক বৃদ্ধা ঠাকুরমা আছেন। ভদ্রমহিলার একটা ডিক্টে আচে। ক্রাচে চলাফেরা করেন। তবে তাঁর আপত্তি হবে বলে মনে হয় না।’

‘দেখ বাপু। গ্রামসমাজ সম্পর্কে আমার কোনো অভিজ্ঞতা নেই। জানাশোনা যেটুকু, তা কতকটা ইনডিপেন্ডেন্ট। কতকটা তোমাদের বাড়ির লোকের কাছে।’ ব্রজেন্দ্র উদ্বিগ্ন হয়ে বললেন। ‘তোমাদের বসন্তপুরে আমি,

বন্ধুর মনে পড়ে, সর্বসাকুল্যে বারতিনেক গিয়ে থাকতে পারি। তার বেশি নয়। এখন ধরো, তোমায় মেয়ে দিয়ে ওদের ক্যামিলি বিপদে পড়লেন। তখন ? তুমি তো বাইরে সাতসমুদ্র তেরনদীর পারে রইলে। ধরো, বুজা ওই ঠাকুরমা মারা গেলেন। তখন ?

শতদ্রু আঙুল খুঁটতে খুঁটতে বলল, ‘হ্যাঁ—সেসব কথাও ভেবে দেখেছি। আরও একটু খুলে বলি আপনাকে। মেয়ের দিদি আছে—সে গ্রাজুয়েট। এখনও বিয়ে হয় নি।’

ব্রজেন্স বললেন, ‘তাহলে তো আরও প্রব্লেম। তার বিয়েতে অসুবিধে হতে পারে।’

‘সে আমি দেখব। স্টেটসে আমার জানাশোনা অনেক বাড়ালী ছেলে আছে। একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে।’

‘কে জানে বাপু। আমার তো ভাল ঠেকছে না। পাত্রীর বয়স কী রকম ?’

‘নাইনটিন।’

‘হঁ।’ ব্রজেন্স একটু চুপ করে থাকার পর বললেন, ‘আমার দিক থেকে বাধা নেই। থাকা উচিত না। বাধা যদি আসে তো দেখবে তোমার বাবার দিক থেকে। তোমরা একসময়কার জমিদার ক্যামিলি। তোমার বাবার যথেষ্ট মানমর্যাদা আছে ওই অঞ্চলে। তুমি তাঁর একমাত্র ছেলে। হাইলি কোয়ালিফায়ড। তোমার সম্পর্কে কেউদা আর শমুর একটা বড়রকমের এ্যামবিশান থাকা স্বাভাবিক। এ অবস্থায় তুমি ওখানে বিয়ে করে বসলে...’

কথা কেড়ে শতদ্রু বলল, ‘প্রীজ মামাবাবু! আপনি বাবা-মাকে বুঝিয়ে বলুন না। আপনার কথা ওঁদের অস্বীকার করা একেবারেই অসম্ভব। আপনি তো জানেন সেটা।’

ব্রজেন্স বারবার গৌঁফে হাত বুলোতে থাকলেন।

শতদ্রু বলল, ‘মামাবাবু!’

ব্রজেন্স একটু হাসলেন। ‘রোসো! দেখি কী করা যায়।’

শতদ্রু উঠে পড়ল। তখন ব্রজেন্স তাকে ডাকলেন। ‘তুমি কি পাত্রী কিংবা তার ঠাকুরমা কিংবা তার দিদি—কাউকে কিছু বলেছ ইতিমধ্যে ? কোনো কথা দিয়েছ কি ?’

শতদ্রু বলল, ‘না।’

ব্রজেন্সও উঠলেন। ‘এসব কথা বললেও গারতে আমাকে। খামোকা

অত ছুটোছুটি করলুম। ঠিকের মনে আশা জাগালুম। তুমি বাপু এখনও আলো স্মার্ট হতে পারো নি। শহরে কাটালে ছেলেবেলা থেকে। তারপর সান্নেয়দের দেশে এতগুলো বছর থাকলে। তবু গেলো রয়ে গেলে মনে মনে। তুমি ভারি অদ্ভুত ছেলে সার্টলেজ।’...

মামার প্রতি বরাবর আস্থা আছে শতদ্রু। মামাকে সে স্ববিবেচক এবং স্নেহশীল বলে জানে। এও লক্ষ্য করেছে, নিজের ছেলেদের তুলনায় তার প্রতি ব্রজেন্দ্রের ঈর্ষা পক্ষপাত আছে যেন। তাই সে ধরেই নিল, ব্রজেন্দ্র মুখে যাই বলুন, তার ইচ্ছাপূরণে পিছপা হবেন না শেষ পর্যন্ত। যা বলবেন, তা মেনে নিতে দেয় করবেন না।

বিকলে ব্রজেন্দ্রের কনিষ্ঠ পুত্র অপূর্ব কোন করল শতদ্রুকে।... ‘সার্ট, কী করছিস এখন?’

শতদ্রু সমবয়সী এবং সহপাঠী সে। চার্টার্ড একাউন্ট্যান্ট। মামাতো ভাই হলেও যে বন্ধুত্ব হবে না এবং পরস্পর কষ্টনিষ্ঠ, এমন কী অস্বাভাবিকতাও চলবে না পরস্পর, তার মানে নেই। দুজনেই ছাত্রজীবনে পরস্পরকে জানিয়ে একটু-আধটু প্রেমের ভান করেছে কিছু-কিছু বোকা ও আবেগ সর্বস্ব মেয়ের সঙ্গে। শতদ্রু অবশ্য অপূর্বের মতো চোঁকস ছিল না। যাবড়ে যেত এবং পিছিয়ে আসত। অপূর্ব ছিল বেপরোয়া।

শতদ্রু বলল, ‘কিছু না। ভাবছি, কী করব।’

‘কাছাকাছি পিতৃদেব আছেন নাকি?’

‘না। কেন?’

‘কতগুলো মাল দেখলি বে?’

‘এই। কী মাস্তানি করছিস। চেষ্টারে তোর পি এ মডিলাটি নেই বুঝি?’

‘আছে। গুনছে এবং হাসছে।’

‘ইনভিয়ানরা যথেষ্ট এগিয়েছে বোঝা যাচ্ছে।’

‘শোন। আর একটু এগোনো যেতে পারে। এক্ষুনি চলে আয়।’

‘কী ব্যাপার?’

‘তোকে নিয়ে এক জায়গায় যাব। দারুণ জমবে।’

‘কোথায় রে?’

‘তোরা জন্ম মা—সরি, মেয়ে দেখতে।’

‘কী যাতা বলছিস।’

‘বাবার কেলোর কীর্তি তো দেখলি। এবার আমার পেঁচোর কীর্তি দেখে নে। আয় শিগগির।’

‘আঃ, খুলে বল না বাবা।’

‘একটা ককটেল পার্টিতে যাব। সন্ধ্যাসহ নেমস্তন্ন। কাজেই তোর...’

‘তোর পি এ-কে নিয়ে যা।’

‘বুদ্ধু কাঁহেকা। চলে আয় বলছি। গাড়ি যাচ্ছে, রেডি হ।’ অপূর্ব ফোন রেখে দিল।

মিনিট কুড়ি পরে শতদ্রু অপূর্বর চেয়ারে পৌঁছল। পাঁচটা বেজে গেছে। অকিস প্রায় ফাঁকা। অপূর্ব চেয়ারে বসে আরাম করে কান চুলকোচ্ছিল। হুন্দরী পি এ-কে দেখতে পেলনা শতদ্রু।

অপূর্ব ঘড়ি দেখে বলল, ‘আর মিনিট কুড়ি পরে বেরুব। বস। কক্ষি খা।’

শতদ্রু বলল, ‘আমাকে খামোকা কোথায় নিয়ে যাবি? তুই বরাবর বড্ড মিসট্রিয়াস অপু।’

অপূর্ব মূচকি হেসে বলল, ‘তোর মাইরি কোনো কাণ্ডজ্ঞান নেই। তোকে ওইভাবে বাদর নাচিয়ে বেড়ালেন বাবা, আর তুইও দিবি নাচলি। কোনো মানে হয়?’

‘ছাড়্ ওসব কথা।’

অপূর্ব বলল, ‘এই সিসটেমটাই যাচ্ছেতাই অড। ভেরি ক্রুড অলসো। সেজেগুজে একটা মেয়ে এসে বসে থাকবে। তাকে চারদিক থেকে একদল ওল্ড হ্যাগার্ড খামচাবে। কাতুকুতু দেবে। আর তুই ভ্যাবলার মতো তাকাবি। পুরো ব্যাপারটা তোর ইনহিউম্যান মনে হয় নি?’

‘হয়েছে তো।’ শতদ্রু একটু হাসল। ‘তাই মামাবাবুকে জানিয়েও দিয়েছি, চলবে না।’

‘পেরেছিস? অসম্ভব।’

‘বিশ্বাস কর।’

অপূর্ব হাত বাড়িয়ে বলল, ‘হাতে হাত দে। তুই তাহলে নমস্ত।’ অপূর্ব হো হো করে হাসতে লাগল।

শতদ্রু বলল, ‘কে পার্টি দিচ্ছে রে? কোথায়?’

‘পার্টি আসলে আমরা দিচ্ছি—বেনামে। গ্যাঙ্গেস এডভারটাইজিংয়ের নামে। সেন্ট্রাল মিনিষ্ট্রির এক বড় চাইকে-কিঞ্চিং পিচ্ছিল করার চেষ্টা আর কী—হাতে সময়মতো ব্যাণ্ডিট প্রদান করা যায়।’

অপূর্ব কথাবার্তার ধরণই এরকম। শতজ্বর মনে হল, অপূর্ব আরও খুঁত হয়েছে। চোখে-মুখে ধার চকচক করছে। বড় ভাইয়ের তুলনায় এবারসেই দারুণ মুটিয়েও গেছে সে। সেই সঙ্গে নিজের স্ত্রী রুমাকেও খানিকটা গোলগাল করে ফেলেছে যেন। আমেরিকা থেকে কলকাতা পৌঁছেই আমার বাড়ি উঠেছিল শতজ্বর। তখন দেখেছে। এবার এসে দেখল রুমা নেই। গোয়া বেড়াতে গেছে সন্তা কোন আত্মীয় বাড়ি। অপূর্ব জন্ত মেয়ের বাপ হয়েছে দেখে শতজ্বর অবাক লেগেছিল।

কাছাকাছি একটা বড় হোটেলে ককটেল পার্টি। শতজ্বর হতাশ হল পার্টির হালচাল দেখে। মহিলার সংখ্যা আঙুলে গোণা যায়। বেশির ভাগই মধ্য-যৌবন। যুঁহু অর্কেস্ট্রার শব্দ। কেউ নাচে না। হাতে গ্লাস আছে, হাসিও আছে—কিন্তু সবমিলিয়ে ধমধমে গুরুগম্ভীর পরিবেশ। শতজ্বর দিকে সবারই চোখ পড়ছে অবশ্য। অপূর্ব আলাপ করিয়েও দিচ্ছে। কিন্তু শতজ্বর কথা বলতে ভাল লাগছে না। স্তরং তার হাতকরই লাগছে। পশ্চিমের এই নকলিয়ান। তার পক্ষে সহনীয় ও আনন্দদায়ক হতে পারে, যার জীবনে 'আসলটা দেখার' সুযোগ হয় নি। মনে পড়ছিল, আরবানায় এক মার্কিন বুড়ো তাকে হাসতে হাসতে বলছিল, 'ইওর গ্র্যাণ্ড হোটেল ইজ নট সো গ্র্যাণ্ড।'

ককটেল পার্টি মানেই উদ্দাম নাচ, বাজনা, হাসি। অবাধ চাঞ্চল্য। প্রচুর স্বাধীনতা। রাত যত বাড়বে, তত উদ্দীপনা বাড়বে। সত্ত্বচেনা যুবতীর গওদেশে আচমকা চুষনে ছড়িয়ে গড়বে ঘরভরা হাসির ফুলিল। কেউ কার্পেটে পা ছাড়িয়ে আধশোয়া অবস্থায় হাত রাখবে কোনো মহিলার উরুদেশে। তাই বলে কেউ মাতলামি করবে না। মাতলামির জন্ত কেউ পার্টিতে যায় না। পার্টিতে কিছু-কিছু শিষ্টাচার আছে। সবাই তা মেনে চলবে। কিন্তু এ সব কী?

শতজ্বর মত্তপানের অভ্যাস নেই। তবে একটু-আধটু খেতে আপত্তি করে না। লাইম দেওয়া জিন নিয়েছিল। একটু পরেই মাথা ধরেছে মনে হল। অপূর্ব চরকির মতো এখান থেকে সেখানে ঘুরছে। শতজ্বর এককোনায় গিয়ে একা দাঁড়িয়ে আছে, তখন সে এক যুবতীর কাঁধে হাত রেখে তাকে নিয়ে এল। 'এর কথা তোকে বলেছিলুম—সোমা সিন্‌হা। কথক নৃত্যে এখন ইন্টারগ্যাশানাল কেম—মাইণ্ড ছাট, এ বয়সেই।' অপূর্ব জঁমৎ মাতাল হয়েছে।

এর কথা অপূর্ব তাকে আদৌ বলেনি। তবু শতজ্বর বাধা দিল না। সোমা তাকে মার্কিন চণ্ডে 'হাই' সম্ভাষণ করল। শতজ্বরও বলল, 'হাই!'

অপূর্ব বলল, 'শতজ্বর সিন্‌হা। আমার পিসতুতো ভাই। কিন্তু ছাত্রজীবনে আমরা একসঙ্গে প্রেম করতুম।'

সোমা বলল, 'প্রেমিকা নিশ্চয় একজনই ছিল ?'

অপূর্ব বলল, 'তা আর বলতে ?'

শতদ্রু লক্ষ্য করল সোমা অদ্ভুত উচ্চারণে বাংলা বলছে ঠোটের ডগায়। এটাই এদেশে রীতি অবশ্য—সে জানে। অপূর্ব তক্ষুনি অন্য কোণে দৌড়ে গেল। তখন শতদ্রু বলল, 'দেন ইউ আর এ ড্যান্সার !' সে ইচ্ছে করেই মারকিন ঢঙে ইংরেজি বলতে থাকল। পান্ট্ কে প্যান্ট, কিংবা ফান্ট্ কে ফ্যান্ট।

সোমা ইংরেজি বলতে পেরে যেন স্বস্তি অনুভব করল। অপূর্ব তাকে শতদ্রুর পরিচয় আগেই দিয়েছে। সে জানাল, আমেরিকার কোথায়-কোথায় নেচেছে। আরবানার কাছে চিকাগোতে গত সেপ্টেম্বরে নেচেছে শুনে শতদ্রু খুশি হল। আসলে সে আমেরিকার প্রেম পড়ে গেছে। সেখানকার কথা পেলে জমে ওঠে।

রাত আটটায় ছাড়াছাড়ি হল অপূর্বের পুনরাবির্ভাবে। পাটি শেষ হয়েছে। সোমা বলল, 'খুব ভাল লাগল আপনার সঙ্গে কথা বলে। আবার দেখা হতে পারে—ইক ইউ উড লাইক ইট। অপূর্বদা, শিগগির ওকে নিয়ে আসুন না আমাদের বাড়ি। ফেব্রুয়ারির ফান্ট্ উইক পযন্ত আইন্স এ্যাম ফ্রি। তারপর খাচ্ছি জ্যাপ্যান।'

শতদ্রুর মনে পড়ল, তার জাপানী বন্ধু মিনাকোর সামনে যতবার জ্যাপ্যান বলেছে, ততবার মিনাকো হেসে ঘুসি পাকিয়ে বলেছে, 'আই মান্ট কিল ইউ। নট জ্যাপ্যান, বাট জা-পা-ন।'

কেরার পথে গাড়িতে অপূর্ব বলল, 'কী ? পছন্দ হল ?'

শতদ্রু তাকাল ওর দিকে। 'কাকে ? কিসের পছন্দ ?'

'বুদ্ধ,' সোমাকে।'

শতদ্রু হাসতে লাগল। 'বৈশ্ব স্মার্ট আর কী। স্লিম গড়নের মেয়ে আমাদের দেশে খুব কম চোখে পড়ে। রঙটাও :ন্দ না। গায়ের রঙের বাপারে আমি কিন্তু মেমসাইয়েবদের বেজায় অপছন্দ করি।'

অপূর্ব চোখ নাচিয়ে বলল, 'নাচের জগৎ ওকে ফিগার ঠিক রাখতে হয়। তাকে জানিস ? নাচিয়েদের নিচের দিকটা সবসময় একটু মোটা হয়ে যায়—বিশেষ করে কথক জাতীয় নাচ যারা নাচে। ৬৭নকার সব মাংস যেন ঝাঁকুনির চোটে নিচে এসে জড়ো হয়।'

শতদ্রু হাসতে হাসতে বলল, 'না বলেছিস। গুড অবজার্ভেশন !'

'যাই হোক, ছুঁ ডিটাকে নিবি ?'

'মাতলামি করিস না অপূর্ব।'

অপূর্ব বলতে থাকল, ‘বনেদী বংশ। তোদের মতোই। ও কে জানিস তো? বলেনি সোমা? গ্যানজ্‌স এডভার্টাইজিংয়ের মালিক মাখনলাল সিনহার মেয়ে। ওর মাও এসেছিল—লক্ষ্য রাখলে চিনতে পারতিস। শুনেছি ওই ভদ্রমহিলাই এ কনসার্নের উন্নতির মূলে। সোসাইটি লেডি বলতে যা বোঝায় আর কী।’

শতদ্রু চুপ করে থাকল।

অপূর্ব বলল, ‘বাবা তো বাইরের ব্যাপার নিয়ে থাকে। মা মেয়ের জন্তু চিন্তিত। দেশে-দেশে ধেই ধেই করে মেয়ের নেচে বেড়ানো পছন্দ নয়।’

শতদ্রু বলল, ‘মায়ের কথায় নাচ ছাড়বে বলে মনে হল না।’

‘না। নাচুক না।’ অপূর্ব সিরিয়াস ভঙ্গিতে বলল। ‘নাচুক। কিন্তু কোমরে দড়ি বাঁধা থাক।’

‘বান্দর নাচ।’ শতদ্রু বিরক্ত হল। ‘সোমা তা চাইবে কেন?’

অপূর্ব বাঁকা ঠোঁটে বলল, ‘আরে ভাই, কত সোমা দেখা হয়ে গেল। মিসেস সিনহার সঙ্গে সামান্য কথা হয়েছে আমার। আভাস পেয়ে উনি পাঙ্কিয়ে উঠেছেন। বেশ তো! সোমা টেটসে থাকার সুযোগ পেলে ওখানে একটা অরগ্যানাইজেশন গড়ে তুলবে। কত স্লোপ পাবে। তারপর বুলি? মিসেস তোর সঙ্গে আলাপ করতে এগিয়ে গিয়ে পিছিয়ে গেলেন। তুই তখন সোমার সঙ্গে জমে আছিস। বললেন, এখন ওদের ডিসটার্ব করব না। পরে একদিন বাড়ি নিয়ে এস ছেলেটিকে।’

শতদ্রু নড়ে বসল। ‘মাই গুডনেস! তাহলে সেই পেণ্টেড মহিলা! আমার দিকে বারবার তাকাচ্ছিলেন।’

‘কী বললি? পেণ্টেড মহিলা!’ অপূর্ব ঝিকঝিক করে হাসতে লাগল। ‘দারুণ বলেছিস সাটু! অ্যামেরিকা গিয়ে তোর ব্রেন শার্প হয়েছে। বাঃ!...’

সে-রাতে ভায়েকে নিয়ে খেতে বসলেন ব্রজেন্দ্র। অপূর্বও বসল। ব্রজেন্দ্রের খাওয়া সবার শেষে। এতবড় সংসারের খাওয়া-দাওয়া হতে সময় লাগে। সুপ্রশস্ত ডাইনিং হলে দুটো প্রকাণ্ড টেবিল, বারোটা স্ফুদ্র চেয়ার। বাণীব্রত এং স্কুমার—অপূর্বর বড়দা ও মেজদা সঙ্গীক এবং পুত্রকন্যাদের নিয়ে খাওয়া-দাওয়া আগেই সেরেছেন। রাতে এইরকম জমাট আসর বসে। দিনে এ সুযোগ হয় না। তাঁদের মা সবিতা নিরামিষ খান বলে আলাদা ব্যবস্থা। নিজের ঘরে বসেই খান। একটু একা থাকতে ভালবাসেন ইদানিং।

খেতে খেতে অপূর্ব শতঙ্গুর দিকে একবার তাকিয়ে বলল, ‘বাপী, একটা কথা ছিল। বলতে পারি?’

ব্রজেন্দ্র সহাস্তে বললেন, ‘আপত্তি কিসের?’

‘সাঁটু তোমাকে বলেছে কি ওর কোনো পাঞ্জী পছন্দ হয় নি?’

ব্রজেন্দ্র একটু গম্ভীর হয়ে আনমনে বললেন, ‘হঁ।’

‘গ্যানজেসের মিসেস সিনহার মেয়েকে আশা করি তুমি চেনো।’

ব্রজেন্দ্র তাকালেন কনিষ্ঠপুত্রের দিকে।

অপূর্ব বলল, ‘শতঙ্গুর তাকে পছন্দ। ক্যান আই প্রসিড টু...’

শতঙ্গুর কী বলতে যাচ্ছিল, ব্রজেন্দ্রের কথায় থেমে গেল। ‘সেই নাচুনী!’

অপূর্ব হাসতে লাগল ‘বাপী, প্লীজ! অমন করে বলো না! শি ইজ চার্মিং!’

ব্রজেন্দ্র ঘাড় বাঁকা করে পাশে শতঙ্গুর দিকে ঘুরে বললেন, ‘কী হে? অপু কী বলছে?’

অপূর্ব কড়ামুখে বলল, ‘সাঁটলেজ! মুখ খুলবিনে। ঘুঁসি মারব। লেট মি ফেস বাপী।’

ব্রজেন্দ্র বললেন, ‘তোমাদের জেনারেশনকে, সত্যি বলছি, আমি বুঝতে পারি নে। তোমরা কী ভাবো, কী করো, কী চাও—হোপলেস। আমাকে জিগ্যেস করার কী দরকার তাহলে?’

‘বাপী। বাপী। প্লীজ। ইউ আর ডিসটার্বড।’

ব্রজেন্দ্র কনিষ্ঠপুত্রের কথার ভংগিতে হেসে ফেললেন। ‘আই অ্যাম অলরাইট। দেখ বাপু’ ভাগ্নের উদ্দেশ্যে বললেন, ‘যা করার ঝটপট করে ফেলো তাহলে। মাখন সিন্ধির পয়সা আছে। আমার চেয়ে তালেবর লোক। কেট সিঙ্গিও কম যায় না। সব দিকেই উত্তম জুটি। কিন্তু মাইণ্ড জাট, শি ইজ নাচুনী।’

‘আর্টিস্ট বাপী, আর্টিস্ট! সোমাকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করো না। ইন্টার-ব্রাশানালি রিপুটেড...’

অপূর্বর কথা কেড়ে শতঙ্গুর বলল, ‘আমায় কিছু বলতে দিবি অপু?’

‘শাট আপ! যার বিয়ে, তার কিছু বলার নেই। দিস ইজ আওয়ার ইণ্ডিয়ান কর্মালিটি। না বাপী?’

ব্রজেন্দ্র গম্ভীর মুখে বললেন, ‘হুম!’

শতঙ্গুর বলল, ‘কাল আমি বসন্তপুর যাচ্ছি, মামাবাবু।’

ব্রজেন্দ্র বললেন, ‘সে কী!’

‘আপনাকে যা বলার বলেছি। আর কিছু বলার নেই। এখন সবকিছু আপনার হাতে।’

ব্রজেন্দ্র কিছু বললেন না—কারণ, কথাটা বুঝলেন। অপূর্ব রাগ করে বলল, ‘ইডিয়ট। পস্তাবি।’...

অপমানিতার অভিমানে

অপরূপা বাইবে না গেলে চলে না। রঙ্গনা একা থাকলে এই নিরিবিলি বাড়িতে—তাঁই মধু ছুতোরেব বউকে বলে যায়। ছুতোর বউয়ের কাজের শেষ নেই। সে পেনীকে পাঠিয়ে দিয়ে বলে, ‘ত্যা গো বাবুদিদিবা! ওকে একটুখানি ছাকাপড়া শিখিও না বাপু। ওর মতন কত মেয়ে ইন্সুলে পড়ছে আজকাল।’

রঙ্গনা একা থাকতে ভয় পায়। কিন্তু পেনীকে পড়ানোই হচ্ছে এতটুকু নেই। পেনীরও নেই। রঙ্গনা নিজের পড়া নিয়েই বাস্তু। পেনী বারান্দার মেঝেয় কাঠি-কাঠি দুই পা ছড়িয়ে অ-আ ক-খ থলে বসে থাকে শুধু। ওর মা এসে উঁকি মেরে দেখে যায়। ওই দেখেই সে খশি। কুড়ানি ঠাকরন তাড়াতাড়ি যাবার সময় তাকে কিছু বলে না গেলেও সে জানে তাকে কী করতে হবে। দু’বোনের খোঁজখবর নিয়ে যায় খিড়কির পথে। ঠাকরনের মতো দর করে লাউ বেচে দেয়।

কিন্তু সাত-সাতটা দিন চলে গেল। কুড়ানি ঠাকরনের খবর নেই। রঙ্গনা উদ্বেগে কাঁদো-কাঁদো মুখে বলে, ‘কিছু গোঝা যাচ্ছে না। কী হতে পারে বল তো দিদি?’

অপরূপা বাগ’ করে বলে, কী হবে? বাপের বাড়ি এনজফ করছে। আর আমরা ভেবে সারা হই না কেন?’

‘একটা চিঠি দিলেও তো পারত।’

‘লেখাপড়া জানলে তো? বাঁকা-শ্রীরামপুর নাম শুনেই লোকা যাচ্ছে, গোমুখ্য ইডিয়টদের দেশ।’

‘ও দিদি, মধুরবাবু?’

‘কী হল মধুরবাবুর?’

‘সে তো কিরে আসবে। তার পাত্তা নেই কেন রে?’

অপরূপা খান্না হয়ে বলে, 'আমি কেমন করে জানাব গাঁজাখোর কোথায় গাঁজা খেয়ে পড়ে আছে।'

দিনে কিছু বোকা যায় না অতটা। রাত এলেই এই পুরনো এতকালের চেনা বাড়িটার চেহারা যেন বদলে যায়। বড় গা ছমছম করে দু'বোনের। উঠোনের দিকে তাকাতে পৰ্বস্তু ভয় করে দু'বোনের। তারপর সারাটা রাত বারবার ঘুম ভেঙে যায়। একটু শব্দ হলেই এ ওকে ডাকে। অত যে কাঠ হয়ে এষরে একা ঘুমোত অপরূপা, তার অবস্থা শোচনীয়। রক্তনা ঘুমজড়ানো গলায় বিরক্ত হয়ে বলে, 'নিজেও ঘুমোবে না—আমাকেও ঘুমোতে দেবে না।'

'কা একটা শব্দ হচ্ছে।' অপরূপা কান পেতে বলে।

রক্তনা ভীষণ ভয় পেয়ে তাকে ছড়িয়ে ধরে থাকে।

এক বাহাত্তরে বুড়ি—যার একটা পা থেকেও নেই, সেই ছিল এবাড়ির শক্তি আব সাহসের উৎস। আশ্চর্য লাগে অপরূপার, এই বরে এ খাট সে একা শুয়েছে এতকাল। এখন রাতবিরেতে এ ঘরের সব জীর্ণ ও ভুচ্ছ আসবাব যেন জ্যান্ত হয়ে দাঁত কটমট করে। আয়নার দিকে তাকালে মনে হয়, আরও কাউকে দেখতে পাবে। আর সারা রাত খাটটার তলায় ঘূণপোকাকর কুট কুট ধর ধর অদ্ভুত সব শব্দ। মাথার ভেতর ঢুকে যেতে থাকে শব্দগুলো।

সাক্ষ্য থাকার সময় কোথায় ছিল এসব শব্দ আর স্পন্দন, এত নড়াচড়া, উপদ্রব। রক্তা যেন সব অলৌকিক অনিষ্টকারীকে শাসনে বাখতেন। আমড়া গাছটায় পেঁচা এসে ডাকলেই ক্রাচ হুঁকে টেঁচাতেন, 'ঘাঃ ঘাঃ' দূর। দূর।' শরৎকালে পেয়ারা ভাগর হলে বাতুড়ের উৎসাহ হত খুব। কুড়ানিষ্টাকবনের ক'বুদ্ধি' একটা ভাঙা টিনের ভেতর একটুকরো ইট পেনডুলামেব মতো ঝুলিয়ে গাছের ডালে লটকে দিয়েছিলেন। তা, সঙ্গে লম্বা একটা দড়ি। দড়ির ডগাটা চৌকাসেব কোনার ফুটো দিয়ে ডান পায়ের গোড়ালিতে বেঁধে শুতেন। বাতুড়ের শব্দ পেলেই পা নাড়তেন। ঢং ঢং করে শব্দ হত পেয়ারা গাছে। একেবারে নাকেব ডগায় ওই বিচ্ছিরি আওয়াজে ভডকে যেত বাতুড়গুলো। তক্ষুনি ডানা শনশন করে পালিয়ে যেত। শীতের সময়টা বাতুড়ের উপদ্রব আর নেই।

কিন্তু রাতের কিছু-কিছু শব্দ অলীক নয়, কোনো-কোনোদিন তা বোঝা যাচ্ছে। চোর এসে সেরা লাউটিকে মুচড়িয়ে ছিঁড়ে নিয়ে গেছে। এক কাঁদি কলাও কে কেটে নিয়ে গেছে খিড়কির খাট থেকে। মধুর বউ এসে পস্তায়। গলা তুলে

শাসায় চোরকে।...‘কার বাড়ি তা জানো না খালভরার? তোমাদের এত সাওস যে কালু মুখুয়োর ভিটেয় পা ফেলো?’

সে অদূরে লোকজন দেখলে গুনিয়ে গুনিয়ে আকাশচেরা গলায় বলে, ‘জানিনে বুঝি কোন নামুনের কাজ? সব জানি। ঠাকরুন্দি নেই—কিরক। তা’পরে অনিবাৰু কিরক। তখন বুঝবে। ছি ছি ছি, এই করে মাহুবে?’

তারপর একই সুরে রক্তনার উদ্দেশ্যে চৈচিয়ে বলে, ‘অনিবাবুর আজকালই ফেরার কথা না গো? হ্যাঁ—অপু তো বলছিল, আজ নয় তো কাল দাদা এসে পড়বে। কলকেতায় আছে।’...

হু’বোনই বিরক্ত হয়। আবার মজাও পায়। তারপর দুজনেরই মনে হয়, ঠাকুমা যখন আসবে আসুক, দাদা যদি হঠাৎ এসে পড়ে, কী ভাল না হবে! অনি থাকতে আর কিছু না হোক, সাহস ছিল প্রচণ্ড। রাস্তা দিয়ে হাঁটার সময় কোনো ছেলে ভুলেও ফচকেমির সাহস পেত না। এখন পেছনে শিস দেয়। কখনও টিপ্তনি। অপক্লপার বেলায় যতটা না, রক্তনার বেলায় বেশি। রক্তনা মুখ নামিয়ে হন হন করে হেঁটে যায়। কান পাতে না।...

সেদিন বিকেলে অপক্লপা বাড়ি ফিরে দেখল, পেনীকে নিয়ে রক্তনা খিড়কির ডোবা থেকে জল এনে গাছ-গাছালিতে সেচ দিচ্ছে। কোমরে আঁচল জড়ানো। পায়ে কাদা। উঠোনও ভিজিয়ে প্রায় কাদা করে ফেলেছে। সারা উঠোন কবে একসময় লাইমকংক্রিটে পোক্ত ছিল। কালক্রমে চাবড়া উঠে মাটি বেরিয়ে পড়েছিল। খজ মাহুস—আছাড় খেতেন কুড়ানি ঠাকরুন। তাই মুনিস ডেকে হরমুস করা হয়েছিল। তার ফলে উচু-নীচু গড়ানে হয়ে আছে অনেক জায়গা। বর্ষায় আর জল জমে না একটুও।

অপক্লপা তার দিকে তাকিয়ে আছে দেখে রক্তনা হাসল।...‘কী রে? কী দেখছিস?’

‘তোমার কীতি। এই অবেলায় জল বেঁটে জর বাধালে দেখার সময় পাব না বলে দিচ্ছি।’

‘সব শুকিয়ে চিমসে হয়ে গিয়েছিল যে!’ রক্তনা আঙুল তুলে শিমের মাচান দেখাল। ‘দেখছিস না, কেমন মিইয়ে গেছে। হরগৌরীর গাছটা পর্যন্ত নেতিয়ে গিয়েছিল। ঠাকুমা এলে কী বলবে বল তো দিদি?’

অপক্লপা হঠাৎ নড়ে উঠল। এই রনি! বলতে ভুলে গেছি।’ সে চোখ বড় করে খাসপ্রখাসের সঙ্গে বলল। ‘জানিস? হরেনদা বলল মধুরবাবুকে নাকি কাল সন্ধ্যায় দেখেছে।’

রক্তনা বালতি হাতে ধমকে দাঁড়াল। ‘মধুরবাবু কিরেছে?’

‘তাইতো বলল হরেনদা।’ অপরাধী করুণমুখে বলল। ‘কিন্তু আমার অবাক লাগছে, তদ্রলোক এসে বলে যাবেন তো!’

রক্তনা চোঁট বঁাকা করে বলল, ‘ইমপসিবল। হরেনদাটা গুলবাজ জানিসনে? স্বক্কুরি করেছে।’

‘না রে! সিরিয়াসলি বলল। ষোঁতনের দোকানে চা খাচ্ছিল মধুরবাবু! হরেনদা দেখেছে।’

রক্তনা এবার উদ্ভিগ্ন হয়ে বলল, ‘তুই ভাল করে জিগ্যেস-টিগ্যেস করলিনে কেন হরেনদাকে?’

‘করলুম। একই কথা বলল।’ অপরাধী নাক খুঁটতে থাকল।

রক্তনা বালতি রেখে বলল, ‘আমি একবার যাই দিদি। হরেনদাকে ভাল করে জিগ্যেস করে ষোঁতনের কাছে খোঁজ নিই গে।’

অপরাধী আস্তে বলল, ‘থাক গে। সন্ধ্যার মুখে আর বেরুস নে।’

পেনীর ক্রকে জলকান্না লেগেছে প্রচুর। সে নিষ্ঠার সঙ্গে হামাগুড়ি দিয়ে মাচানের তলায় ঢুকে জল ঢেলেছে। অপরাধী হঠাৎ বলল, ‘পেনী, তোর পিঠে ওটা কী রে? কাছে আয় তো!’ পেনী কাছে এলে সে একটা কাঠি কুড়িয়ে পেনীর পিঠ থেকে পোকা কেলে দিল। পোকাটা দেখতে দেখতে বলল, ‘রনি! এটা শুয়োপোকা নাকি দেখ তো!’

রক্তনা একবার দেখেই বলল, ‘নাঃ!’

পেনী পোকাটাকে পায়ের বুড়ো আঙুলে ষষটে মেয়ে ফেলল। পেনী পোকা মারতে পেলে আর কিছু চায় না। এবাড়ি এলেই সে পোকা খুঁজে বেড়ায় গাছপালা লতাপাতায়। কুড়ানি-ঠাকরনের সেটা অপছন্দ। তাড়া করে বলেন, ‘অই! অই! আবার ওই নষ্ট স্বভাব?’ পেনী যদি বলে, ‘ও ঠাকরন, পাতা খাচ্ছে যে,’ ঠাকরন বলেন, ‘ধাবে না? তুই ধাসনে লা? থাক।’ এ কয়েকটা দিন কুড়ানি ঠাকরন না থাকায় পেনীর খুব আনন্দ। পোকামাকড় খুঁজে বের করে মনের স্বখে মেয়েছে। বাসকড়িং গাঙকড়িংকেও রেহাই দেয় নি।

রক্তনা মুখ মুছতে মুছতে ঘরে ঢুকল। চুল আঁচড়াল।

একটু ক্রিম ষষবে ভেবে হাত বাড়াতে গিয়ে দেখল অপরাধী দাঁড়িয়ে আছে। একটু হাসল অপ্রস্তুত হয়ে। অপরাধী বলল, ‘হরেনদাকে কি এখন পাবি? নতুন কথাই বা আর কী শুনবি ভাবছিস?’

রঙ্গনা সেই অশ্রুসিক্ত হাসি মুখে রেখেই বলল, 'বিয়াসদির কাছ হয়ে আসব। পত্রকাগজো পড়া হয়ে গেছে। বইটাও দিয়ে আসব রে দিদি।'

অপরূপা ওর আপাদমস্তক লক্ষ্য করে বলল, 'এ বাম। তুই কি এই কাপড়েই বেরাবি নাকি?'

'ভ্যাট্ট।' রঙ্গনা বলল। 'কাপড় বদলাব তো। তুই যেন কী।'

শাড়ি বদলে মোটামুটি ভদ্র হয়ে রঙ্গনা পেনীকে নিয়ে বেরুল। অপরূপা পহ পই করে বলে দিল যেন শিগগির ফিরে আসে। দরজায় গিয়ে ফের টেঁচিড়ে বলল, 'বিয়াসের ওখানে কখনো আদ্যা দিবি নে।' রঙ্গনা জানে, দিদি একা থাকতে ভয় পাচ্ছে আসলে।

চব্বন জয়কালী ট্রান্সপোর্টের অফিসে কাজ করে। সেখানে গিয়ে রঙ্গনা শুনল, এইমাত্র কোথায় গেরিয়েছে। কখন ফিরবে কেউ বলতে পারল না। অগত্যা কিছুক্ষণ পথ তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল রঙ্গনা। তাবপর টের পেল, ওপাশে পেট্রল পাম্পের সামনে নচ দেয়ালে এসে কয়েকটি ছেলে তাকে লক্ষ্য করবে ক' বলছে আর হাসছে।

রঙ্গনা হন হন করে হাঁটিতে থাকল। পেনী বলল, 'ও দিদি। স্বাভাবিক কোথা যাচ্ছ?'

রঙ্গনা ধমকাল। 'তুই থাম তো। চূপচাপ সঙ্গে আয়।'

অনেকটা হেঁটে ঘোঁতনের চায়ের দোকান। দোকান শুধু নামেই। একটা প্রকাণ্ড শিবিস গাছের গুঁড়ি নোঁষে কানের টব। তাব ওপর চায়ের সরঞ্জাম। পাশে কয়লার উন্ন। সামনে ও একপাশে দুটো কাঠের বেঞ্চ মাঝে মাঝে বোঁহা দফতরের লোকেরা এসে এ দোকান হটিয়ে দেয়। অন্যায়স্বায়ী ঘোঁত-ফের সাজিয়ে বসে। গুঁড়িতে অনেকগুলি টিনের টকবো পোবেক দিয়ে আঁট তাতে নানারকম বিজ্ঞাপন।

তব দেখে রঙ্গনা একটু তফাতে দাডাল। পেনীকে বলল, 'ঘোঁতনের ভিগোস করে আয় তো পেনী, মধুরবাবুকে দেখেছে নাকি। শোন দেখেছে বলে জিগোস করবি, এখন দেখেছে।'

পেন চলে গেল। রঙ্গনা দেখল, পেনী ঘোঁতনের সঙ্গে কথাবারাট্টা কবছে। কিন্তু ঘোঁতন তাব দিকে ঘুরেও তাকাচ্ছে না। অনেক চেষ্টার পব পেনী তার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। তখন ঘোঁতন দাঁতমুখ খিঁচিয়ে কিছু বলল। পেনী দৌড়ে চলে এল।

রঙ্গনা রুদ্ধস্বাসে বলল, 'কী বলল বে?'

‘বলল, আমি কি জানি নাকি ?’ অপমানিতা পেনী করুন মুখে বলল।

‘তুই বললি কেন, আমি জিগোস করতে পাঠিয়েছি ?’

‘কথা কানেই নিচ্ছে না খালভরা।’

মায়ের গালটা বেশ রক্ত করেছে মেয়েটা রক্তন। একটু ইতস্তত করে নদিকে তাকাল। পা বাড়াতে গিয়ে বলল, ‘তোমার বলল জানেন না ?’ মানে মধুববাবুকে দেখে নি ?’

পেনী বলল, ‘ত জানি না। বলল, আমি কি জানি নাকি ?’

রক্তনা বলল, ‘বলেছিলুম না তরেনদাটা গুলবাজ। ঘোঁতনের কাছে চা খেপে বলবেন কেন ?’ আর পেনী, আমবা একটু সিজিদের বাড়ি যাঠ। তুই গেটের কাছে দাঁড়িয়ে থাকবি আমি যাব আর আসব। কক্ষনো চলে যাবিনে ঘেন ?’

আরও কিছুটা এগিয়ে খানিকটা ফাঁকা ছায়গা। সেখানে আগাছার ভেতর একটা ভাঙা মোটর গাড়ি পড়ে আছে। তার ওপাশটা সাফ করে একদল ছেলে বাডমিণ্টন খেলছে। ওন ওন করে পাশ কাটিয়ে ছোট একটা রাস্তায় পৌঁছল ওরা। তারপর সিজিবাড়ির উঁচু পাঁচিল একটানা রাস্তায় সমান্তরালে চলেছে।

গানভিলিয়ার ঝালরে ঢাকা সুন্দর ওড়ার রেলিং দেওয়া গেট। একটু ফাঁক হয়ে আছে পাশে টুলে বসে আছে ওদের দায়োয়ান বাহাদুর। রক্তনাকে দেখলে সে হেসে বলে, ‘এস এস দিদি।’ কিছু আঙ্গ কেমন নির্দিকারভাবে তাকাল। রক্তনা হাসিমুখে বলল, ‘বয়সাদি নেহ ?’

বাহাদুর উঠে এসে বলল, ‘নেই। কলকাতা এসে। কিছু দরকার থাকে তো বলো।’

‘এই বই কাগজগুলো দিতে এসেছিলুম।’

বাহাদুর হাত বাড়িয়ে বলল, ‘তো দেও।’ আমি দিয়ে দেব।’

রক্তনা বই আর পত্রিকাগুলো নিয়ে প্রাঙ্গণের দিকে জানমনে তাকাল একবার। ছড়ি-বিছানো গনের দুধারে ফলবাগান ডাইনে অনেকটা ফাঁকা ছায়গায় টেনিসকোর্ট করা হয়েছে। শতরু বোলের সঙ্গে টেনিস খেলে। রক্তনা খেলাটা দেখেনি, শুনেছিল বিয়াসের কাছে। তার ওধারে বাড়ির পেছন দিকটার একটা চারকোনা সুইমিং পুল মতো জলাশয়। বাধানো ঘাট। ভারি সুন্দর পরিবেশ।

রক্তনা চমকে উঠল। দূরে ঘাটের ওপর বিপাশা এদিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে। সে হেসে উঠল, ‘বাহাদুরদা ! তুমি কেন মিথ্যে বললে গো ?’ এই তো বিয়াসদি !’

বাহাদুর ঘুরে দেখে গুম হয়ে গেল। তারপর ভাবি গলায় বলল, ‘বিয়াসদিদির শরীর আচ্ছা নেই, বৃথাই হয়েছে। তাই মাইজী মানা করেছে, কারও সঙ্গে দেখা হবে না।’

‘ভ্যাট। ডাকো না তুমি। নৈলে আমি ডাকছি।’ রক্তনা পা বাড়াল।

বাহাদুর গেটের ফাঁকে পথ আটকে বলল, ‘নেই দিদি। মানা আছে। তুমি এখন এস।’

রক্তনার দুই চোখ জলে উঠল। ‘আমারও যাওয়া মানা?’

‘হাঁ। ওহি বাত।’

‘আমার?’ রক্তনার গলা শুকিয়ে গেল। শরীর ভাবি মনে হল।

বাহাদুর কথা বাড়াল না। গেট টেনে বন্ধ করে দিল। তারপর টুলে গিয়ে বলল।...

কিছুটা চলার পর পেনী অক্ষুটস্বরে গাল দিল, ‘খালভরা!’

পেনীও বুঝেছে—অতটুকু মেয়ে। বঙ্গনা অনেক কষ্টে আত্মসম্বরণ করল। রাগে দুঃখে অপমানে তার মাথা ঘুরছিল। এমনটি স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারে নি। তার বারবার মনে হল, বিয়াসদি জানলে এভাবে তাকে অপমানিত হতে হত না। বিয়াসদি কিছুর জানে না হয় তো।

কিন্তু কেন বিয়াসদির সঙ্গে দেখা করা বারণ, কিছুতেই রক্তনার মাথায় ঢুকল না। কিছুদূর যাওয়ার পর সে অনেকটা ধাতস্থ হল। শতদ্রু যদি তাদের বাড়ি আসে, ঠিক এমনি অপমান করবে। শতদ্রু কারণ জানতে চাইলে তখন মুখের ওপর জবাব দেবে। তবে বিপাশা তাদের বাড়ি কখনও যায় নি। তাকে অপমান করার সুযোগ হয়তো পাবে না। পথে দেখা হলে অল্প কথা। কিন্তু বিপাশা পথে ঘাটে বেরোয় খুব কদাচিৎ। যখন বেরোয়, বেশির ভাগ সময় গাড়ি করে যায়। গাড়ি থামিয়ে কথা শোনাবে রক্তনা—সে সহজ মেয়ে নয়।

কল্পনায় একবার শতদ্রু একবার বিপাশার সঙ্গে কথা বলতে বলতে তাদের যাচ্ছেতাই অপমান করতে করতে রক্তনা বাড়ি পৌঁছল। পেনী একদোড়ে সজ্জাড়া হল।

অপরূপা শেষবেলার দূসর উঠোনে বোনের মুখের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠেছিল। সে বলল, ‘কী রে?’

রক্তনা সঙ্গে সঙ্গে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। তারপর দৌড়ে অপরূপার ঘরে ঢুকে খাটের ওপর উপুড় হয়ে পড়ল। তার শরীরের অর্ধাংশ ঝুলে রইল।

অপরূপা ঘটনার আকস্মিকতায় বোবা হয়ে গিয়েছিল। তারপর বুঝল, তাহলে ঠাকুমারই কিছু দুঃসংবাদ আছে। সে দ্রুত ঘরে ঢুকে কাঁপাকাঁপা গলায় বলল, 'রনি! ঠাকুমার কিছু হয়েছে!'

রজনী উঠে দাঁড়াল। তার নাসারক্ত ক্ষুরিত। হিস হিস করে বলল, 'ওই ছোটলোক সিঁদুরা দাবোয়ানকে বলেছে আমাদের চুকতে দেবে না। এবার যদি শুনি, তুই ওদের ছায়া মাড়িয়েছিস দিদি, দেখবি তোব কী হয়!'

'রজনী হাঁকাচ্ছিল। অপরূপা স্তম্ভিত হয়ে বলল, 'তোকে চুকতে দিল না?'

'না।' রজনী চোঁচিয়ে উঠল, 'তুই! তুই তো গায়ে পড়ে ভাব জমাতে গিয়েছিলি লোকটার সঙ্গে!'

'রনি।' অপরূপা ধমক দিল। 'কী বাজে বলছিস!'

রজনী ভেংচি কেটে বলল, 'আমায় আমেরিকা যাবার ব্যবস্থা করে দিন না শাটলেজ্জনা, না কাটলেটনা।' কে পটাচ্ছিল? আমি, না তুই?'

অপরূপা ওর গায়ে চড় মারল। 'অসভ্য! ইতব মেয়ে কোথাকার!'

রজনী চুপ করে গেল।

অপরূপা হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, 'কেবল যদি আজ্ঞেবাজে একটা কথা বলেছিস, তোকে শাস করে দলব। আমি পটাচ্ছিলুম, না তুই? কার বাজে এসেছিল? হতচ্ছাড়ী বান্দব মেয়ে কোথাকার!'

রজনী বেবিয়ে গিয়ে বারান্দার পালস্তারা ওঠা থামটা আঁকড়ে দাঁড়াল। পশ্চিম আকাশে লালচে আভা ফুটে রয়েছে। চারপাশে গাছ-গাছালিতে পাখির তুমুল চোঁচামেচি করছে। দিন শেষ হয়ে গেল। হিম বনিয়ে আসছে। অপরূপা বেরিয়ে রান্নাঘরে গেল হেরিকেন জালতে।

হেরিকেনটা বারান্দায় রেখে নিজের ঘরে লম্পটা নিয়ে গেল। তারপর ফিরে এসে শান্তভাবে বলল, 'বৎ লাকের সঙ্গে এডভেই তো ভাব করতে নেই। বিয়াসের সঙ্গে কি আমি কখনও ভাব করেছি? দেখে ছস আমায় ভাব করতে? গায়ে পড়ে কথা বলত বলে আমিও বলতুম। ঠিক আছে। কাকে অপমান করেছে, এখন তে' টের পাচ্ছে না। পাবে, দাদা যখন ফিরে আসবে। কালু মুখ্যোর নাতনিকে অপমান করার শাস্তি কী, তখন জানবে।'

বিপাশা ও অনি

শতদ্রু সঙ্গ বিপাশার সম্পর্ক বরাবর একটু ছাড়া-ছাড়া। স্বাভাবিকভাবে শতদ্রু সঙ্গ সে ছোটবেলা থেকে খুব কম পেয়েছে। শতদ্রু অতকাল বিদেশে ছিল, তাতেও বিপাশার কিছু যায়-আসে নি। বিপাশার স্বভাব হল একলা থাকার। শতদ্রু বিদেশ থেকে ফিরলে সে কিছুদিন হইচই করতে চেয়েছে দাদাকে নিয়ে। তারপর আবার যেমন ছিল তেমনি।

কেন যেন রাগ করেই শতদ্রু আবার কলকাতা চলে গেল। এহ তো ক'দিন আগে গিয়েছিল, ফিরে এল হাসি মুখে। রাত্তিরটা আর সকালটা থাকল। আবার চলে গেল। বিপাশার মনে হয়েছিল, ওর বসন্তপুরে থাকতে ভাল লাগে ন'। একেবারে মন ঢেকে না বলেই বাববাব কলকাতা পালায়।

কিন্তু বাড়িতে কিছু একটা ঘটেছে, বিপাশা পরে আঁচ করল। এমনিতে এতবড় বাড়িটা ভুতুড়ে লাগে। ওপরে-নিচে এতগুলো ঘর। বাস করার মানুষ নেই। মাঝে মাঝে আত্মীয়স্বজন এলে যা একটু ভিড়, হইচই তারপর আগার সব নিঃশব্দ। চণ্ডা কাঠের সিঁড়িতে পুরনো আমলের কাপেট পাতা আছে। দেয়ালে ঝুলছে বড় বড় বিলিতি পেটিং। অনেক রাতে বিপাশার মনে হয়, সেই সিঁড়িতে ছবির লোকেরা হাঁটছে। হাঁটতে হাঁটতে হলঘরে, হলঘর থেকে আবার ওপরে। তাবপব খালি ঘরগুলোর ভেতর কেমন চাপা শব্দ। রাতে হাওয়া দিলে বাড়িটার ভেতর অদ্ভুত শব্দ হতে থাকে। বিপাশা বাববার চমকে ওঠে। তবু প্রশ্ন গেলেও বলবে না সে ভয় পাচ্ছে।

শতদ্রু ফের কলকাতা গেলে বাড়ির গুমোট ভাবটা আরও ঘন হল যেন। বাশার মুখ গম্ভীর। একটুতেই চাকর বাকর লোকজনকে তিরিফি মজা দেড়ে যাচ্ছেন। মায়েব চালচলনও তেমনি হঠাৎ বদলে গেছে। মুখে হাসি নেই। কথা বলছেন কম। বিপাশার চোখে পড়ল এদটু কবে ভাবল মাকে জিগ্যেস করবে কী হয়েছে। কিন্তু পরে মনে হল, কী দবকান কাথায় কী ঘটেছে, তার সঙ্গে বিপাশার সম্পর্ক কিসের ?

রাতে বিপাশা শুনেছিল কলকাতা থেকে মামাবাবু কোনে বাবার সঙ্গে কথা বলছেন। বাবাকে খুব উত্তেজিত মনে হচ্ছিল। বিপাশা বিরক্ত হয়ে টেপ-রেকর্ডারের আওয়াজ বাড়িয়ে দিয়েছিল। কিছুক্ষণ পরে দরজার বাইরে শমিতা ডাকছিলেন, ‘বিন্নাস! ঝুমোলি নাকি ?’

বিপাশা সাড়া দেয় নি।

মাঝে মাঝে মা বাবা, সংসারের সব মানুষজনের বিরুদ্ধে বিপাশার একটা তীব্র ক্রোধ জেগে ওঠে। কী বিরক্তিকর ঠন্দের আচরণ! কী একঘেষে জীবনযাপন! খাওয়া দাওয়া ঘুম টাকা—বড় উত্তট এই জীবনধারণ! কাকেও খ্যা খ্যা করে হাসতে দেখলেই বিপাশার পিঠি জলে যায়। কখনও মনে হয়, বিশ্ব-স্বচ্ছ লোক যেন তাকে ইশারা করেই কিছু বলছে—অথবা কিছু করার তাগে আছে। প্রতিটি মুখে ষড়যন্ত্রের ক্রকট। চারদিকে চক্রান্ত।

চক্রান্ত।

মা ও বাবা চাপা গলায় কীসব আলোচনা করছিলেন। বিপাশাকে দেখে থেমে গেলেন। কৃষ্ণনাথ বললেন, ‘বাইরে বেরুচ্ছিস নাকি?’ ঠাণ্ডা লাগবে যে। গায়ে কিছু জড়িয়ে নে।’

মা বললেন, ‘মালাকে খবর দিলে এসে খেলত। টেনিসকোর্ট করা হল অত যত্ন করে, খালি পড়ে আছে।’

বিপাশা চুপচাপ নেমে গেল।

চারকোনা পুকুরটাকে কেন মা সুইমিং পুল বলে, বিপাশার রাগ হয়। আগের আমলে নাকি কলকাতা থেকে ঠাকুরদার সায়েব বন্ধুবা বেড়াতে এসে সাতার কাটত। পুকুরে এখন ঘন দাম, শাদুক আব পদ্মও ফোটে। জলটা ভারি স্বচ্ছ। লাট আছে। কিন্তু কারুর ও জলে নামা বারণ। একবার রান্নার ঠাকুর মাধবের ভাইপো মনের স্বখে সাতার কাটতে নেমেছিল। শেষে মাধবের চাকরি যাবার দাখিল। এর ভাইপো ওড়িশার ছেলে। বড়বাড়ির রীতিনীতি জানে না। দারোয়ানের ‘গাড’ খেয়ে প্রায় কাপড়েচোপড়ে হয়ে গিয়েছিল বেচাবার।

পুকুরঘাটে বিকেলে চুপচাপ দাঁড়িয়ে বা বসে সময় কাটায় বিপাশা। নীত তীব্র হলে চলে আসে। দিনে দিনে শীত কমে যাচ্ছে ক্রমশ। এবেলা সে সিঁড়িতে বসে জলের দিকে তাকিয়ে এলোমেলো নানা কথা ভাবতে লাগল।

একটু পরে তার যেন মনে হল, পেছনে কে এসে দাঁড়িয়েছে! ঘুরে দেখল, কেউ নেই। অথচ তার দৃঢ় ধারণা কেউ এসেছিল। তার খাস প্রখাসের শব্দও যেন শুনতে পাচ্ছিল। সিঁড়িটা উঠ করে বাঁধানো। গোলাকার বেঞ্চ আছে। দুধারে দুটো লাইমকংক্রিটের পরীমূর্তি। শ্রাওলায় কালো হয়ে গেছে। সে উঠে পড়ল। পেছনে গুঁড়ি মেরে বসে আছে কি কেউ?

কেউ না। বিপাশার একটু গ-ছমছম করল। বাগানের গাছে-গাছে নীলচে কুম্বাসার স্তর ভাসছে। দূরে গেটের ওদিকে সূর্য ডুবে গেছে। চারপাশে কোনো

লোক নেই। বিশাল বাড়িটা কালো হয়ে থাকিয়ে আছে তার দিকে। বিপাশা একটা শক্ত হল। জেদ করে আবার বসে পড়ল। একটা অলীক ভয় তাকে সারাক্ষণ ভাড়া করে বেড়াচ্ছে যেন। এই ভয়কে ভয় না করতে পারলে তাঁর বেঁচে থাকা অসম্ভব হবে হয়তো। এই গোপন ভয় তাকে বেঁচে থাকার আনন্দ ছুঁতে দিচ্ছে না। অথচ মরে যাওয়ার কথাও ভাবা যায় না। বিপাশার খালি মনে হয়, একটা কিছু জরুরী উদ্দেশ্য তার জীবনে আছে এবং তাই তাকে বেঁচে থাকতেই হবে। সে বুঝতে পারে না কী সেই উদ্দেশ্য, খালি মনে হয়—একটা কিছু ঘটবে—গোপন অথচ বিরাট কিছু, যা তার জীবনকে ভয়হীন ও সুন্দর করে তুলবে।

আর এই কথাটা যখনই ভাবে, অনির কথা মনে পড়ে যায়। নিজের বেঁচে থাকার সেই রহস্যময় উদ্দেশ্যের সঙ্গে অনি কী ভাবে জড়িয়ে গেছে, বিপাশা বোঝে না।

অনি বড় দুর্বল ছেলে ছিল। তখন বসন্তপুর জুলে কো-এডুকেশন ছিল। অনি তার দু ক্লাস ওপরে পড়ত। ক্লাস নাইনে হঠাৎ পড়াশুনা ছেড়ে দেয় অনি। অনি বরাবর বলত, ‘খুং! পড়ে কি আমার দুটো মাথা গজাবে?’ অনিকে ভাল লাগত বিপাশার। গরীব পরিবারের ছেলে। কিন্তু তার দাপটটা ছিল বড়লোকের ছেলের মতোই। বড় অহংকারী আর দুর্দান্ত প্রকৃতিব ছিল অনি। কক্ষ চেহারা, কপালে একটা ক্ষতচিহ্ন, শক্ত গড়ন। ফুটবল খেলাতে কত ছেলেকে সে জখম করত তার সংখ্যা নেই। মারকুটে স্বভাবের জন্য কেউ তার সঙ্গে মিশতে চাইত না। বসন্তপুরে তার বন্ধু বলতে কেউ ছিল না।

অপক্লপার সঙ্গে বিপাশার খানিকটা বন্ধুত্ব ছিল। তাই বলে বিপাশা ওদেব বাড়ি যেত না। অপক্লপাই আসত তাদের ‘সিংহভবনে।’ অপক্লপার দাদা বলে অনিকে একটু খাতির কবে চলত বিপাশা। কিন্তু অনি সবতোতেই বাড়াবাড়ি। দূর থেকে দেখেই অনি টেঁচাত, ‘বিয়াস! বিয়াস! বিয়াস!’ খুব নিব্রত বোধ করত বিপাশা।

কৃষ্ণনাথের কেন যেন পছন্দ ছিল অনিকে। সে পড়াশুনা ছেড়ে দিলে কৃষ্ণনাথ তাকে ডেকে নিজের কন্ট্রাক্টারির কাজে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। অনির এই স্বভাব—যেটা পছন্দ হবে, সেটা নিয়ে একেবারে পাগলের মতো লেগে থাকবে। তারপর খেয়াল ভেঙেও যেত রাতারাতি। বড়ো গড়া ধুলোর ঘর যেমন করে লাখি মেয়ে বালকেরা ভেঙে দেয়, অনি সব ভাঙত। এলাকার রাস্তাঘাট, সরকারী প্রকল্প অনুসারে ঘরবাড়ি তৈরি—কৃষ্ণনাথ সবকিছুই করতেন। অনি সেই নৃত্যে

বিপাশাদের বাড়ি আসত সবসময়। বাড়ির একজন হয়ে উঠেছিল সে। বিরক্ত হলেও সবাই তাকে পাত্তা দিত। বিপাশার সঙ্গে ঝাঁপিয়ে এসে মিশত স্ববোণ পেলে। বিপাশাও যেন তাকে প্রজ্ঞয় দিতে শুরু করেছিল। বিপাশার তাকে ভাল লাগতে শুরু করেছিল। তখন কৈশোর-যৌবনের সন্ধিকাল বিপাশার। অনি তাকে পেয়ে বসেছিল। অনেকসময় নিজেরই ধারণা লাগত, একটা আজেবাজে ছেলের দিকে কেন এত টান তার? কিন্তু অনি যেন ভূতের মতো বিপাশার আঁখায় ঢুকে পড়েছিল।

তারপর অতর্কিত একটা সাংঘাতিক ঘটনা ঘটে গেল।

কৃষ্ণনাথ সেদিন কলকাতা গেছেন। তাঁর কাজের দায়িত্ব নিবারণ দত্তের ওপর। নিবারণবাবু একসময় সরকারী ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। কোথায় রাস্তার ওপর ব্রিজ তৈরি হচ্ছিল। কী একটা কথায় অনির সঙ্গ দত্তবাবুর ঝগড়া বেধে যায়। দত্তবাবু এ ছোকরাকে সহ্যে পারতে না। অনি তাঁর মাথা কাটিয়ে দেয়। তখন দত্তবাবুর হুকুমে মজুররা ঝাঁপিয়ে পড়ে অনির ওপর। অনিরও মাথা কাটে।

অনি কৃষ্ণনাথকে বলতে এসেছিল, চাকরি ছেড়ে দিচ্ছে। কিন্তু কৃষ্ণনাথ নেই। শমিতাও তাঁর সঙ্গে গেছেন। অনি চিৎকার করছিল হলঘরে। বিপাশাকে সিঁড়ির ওপর দেখে সে দৌড়ে গিয়েছিল। বিপাশা ভয় পেয়েছিল তার মূর্তি দেখে।

কিন্তু বিপাশার মুখোমুখি দাঁড়িয়েই অনি হঠাৎ শান্ত হয়ে গিয়েছিল। কিক করে হেসে বলেছিল, ‘একটু ডেটল লাগিয়ে দাও তো!’

বিপাশা চুপচাপ ডেটল এনে লাগিয়ে দিয়েছিল। কোনো প্রশ্ন করে নি। তারপর তুলো আর একটুকরো কাপড় দিয়ে ব্যাণ্ডেজও বেঁধে দিয়েছিল। অনি বলেছিল, ‘কী হয়েছে জিগ্যাস করছ না দিগাস?’

বিপাশা একটু হেসে বলেছিল, ‘জিগ্যাস করার কী আছে? কোথাও মারামারি করেছ।’

‘এক গ্লাস জল দাও। না—ঠাকুরচাকরের হাতে নয়, তোমার হাতে খাব।’

বিপাশা জল এনে দিলে খাওয়ার পর অনি বলেছিল, ‘এবার একটু চা খেতে ইচ্ছে করছে।’

বিপাশা চা বলে এসে দেখে, অনি তার ঘরে বসে রয়েছে। একটু বিব্রত বোধ করেছিল বিপাশা। বাবা-মার কানে তুললে বকবেন। কিন্তু অনিকে ঘর থেকে নড়ানো তার পক্ষে কঠিন।

নাশক ওর বাবা-মা নেই জেনেই সেদিন অনি অমন সাহসী হয়ে উঠেছিল ? চা দিয়ে গিয়েছিল ভুলো নামে একজন বয়স্ক লোক । সে এবাড়িতে বংশগরম্পরা কাজ করে । একটু গোটকাটা স্বভাবের লোক । বলেছিল, ‘দিদিমণির ধরে বামেল কচ্ছ কেন বাপ ? চা খাবে তো বসার ঘরে বসেই চা খেলে কি শে’ত হত ?’

অনি বলেছিল, ‘আরে যাও, যাও ! কালু মুখুয্যেব নাতি সিঙ্গিবাড়িতে পা রেখেছে, এতেই ধন্য হয়ে গেছে বাড়ি । কা’ বলে বিয়াস ?’

‘ভুলোচা, তুমি যাও তো এখন ।’ বিপাশা রাগ করে বলেছিল । লোকটা ফোপরদালালী করতে পেরে ছাড়ে না । আসলে বিপাশা অনির অপমানে ভয় পাক্ছিল সেদিন । অনিকে ভয় পেত সে । বোশেখ মাসের বিকেল । তারপর কখন আকাশ কালো করে মেঘ উঠেছিল । প্রচণ্ড ঝড় এসেছিল । সারা বাড়িটা বাঁপছিল । জানলাগুলো কটপট বন্ধ না করে উপায় ছিল না । একটু পরেই রাজ পড়ার শব্দ, তাবপর টুই, সেই সঙ্গে শিল পড়তে শুরু করেছিল । অনি খুব খুশি হয়ে বসেছিল, ‘দাংগ । জমে গেছে ।’ তারপর সে লাফিয়ে উঠেছিল, ‘বিয়াস । শিল পড়োবে ? দাবল লাগে ঝড়বৃষ্টিতে শিল পড়োতে । ওই শোনে, ছাদে দড়বড় করে শিল পড়েছে । চলো না ছাদে যাই ।’

বিপাশা বলেছিল, ‘না ।’

‘ধুং ।’ সব তাতেই না । এসে দেখ না মজাটা ।’

‘তুমি যাও ।’

‘ছাদে ওঠাব সিঁড়ি কোথায় ?’

‘চলো দেখাচ্ছি ।’

বিপাশা চিলেকোঠায় সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে অনির কাণ্ড দেখছিল । ততক্ষণে অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে বাড়িতে আলো জ্বলে উঠেছে । কিন্তু সিঁড়িতে আলো নেই । একরাশ শিল কুড়িয়ে অনি দৌড়ে এসে বলেছিল, ‘ধরো ধরো ।’

বিপাশা হাত বাড়িয়েছিল । হয়তো সেটাই বড় ভুল হয়ে গিয়েছিল । ঝড় বৃষ্টি বজ্র শিলাপাতের সঙ্ঘাত বৃষ্টি তারও কী টান বেজেছিল মনে । তারপর হঠাৎ অনি ছুহাতে ওকে জড়িয়ে ধরে কিস কিস করে বলেছিল, ‘বিয়াস ! আমার বিয়াস ।’

সিঁড়ির মাথায় পড়ে গিয়েছিল বিপাশা । বাঁধা দেবার শক্তি হারিয়ে ফেলেছিল—কিংবা একটা কিছু ঘটেছিল তার মধ্যে, আজও বুঝতে পারে না । এখনও কোনো নিজস্ব মুহূর্তে সেই চাপা কণ্ঠস্বর তার কানের কাছে এসে পড়ে—

বিয়াস। 'আমার বিয়াস।' বিপাশার মনে হয়, কোথাও লুকিয়ে পড়ার মতো জায়গা খুঁজে পাচ্ছে না। কেন সে নিজেকে রক্ষা করতে চেষ্টা করে নি—কেনই বা এমন অবশ্য হয়ে গিয়েছিল সেদিন?

তারপর কতদিন অনির মুখোমুখি হয় নি সে। অনি এ বাড়ি আসা ছেড়ে দিয়েছিল। একদিন গেটের কাছে সে কুম্বনাথের উদ্দেশে চৌচামেচি করে বলেছিল, 'দিও না শালা। হজম হবে না। এ বাবা কালু মুখুয়ার নাতি। হার্টে হাত তরে পাওনাকড়ি বের করে নেবে।'

বাহাছর বলেছিল, 'ঝামেলা করো না বাবু। চলে যাও।' বহু মুশকিলে পড়ে যাবে।'

অনি বলেছিল, 'তা তো বলবি রে। তুই ছত্রী রাজপুত—আর কেউ সিঁকিও ছত্রী রাজপুত। কে জানে না, জাত ভাঁড়িয়ে ওর ঠাকুরদার বাপ কায়েত হয়েছিল। নর্থবিহারে পাহাড়ের কোলে মোষ চরাতে। বসন্তপুরে এসে জমিদারি পেয়ে কায়েত বনে গেল।'

বাহাছর কুকরি বের করেছিল। কুম্বনাথের হুকুমে সুরে আসে। অনিও কেটে পড়ে।

কলেজ যেতে ভয় পেত বিপাশা। ছলছুতো করে গাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার ধুরো তুলেছিল। কিন্তু অনির সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে অনি তার দিকে তাকিয়ে শুধু হাসত। গাড়ি থেকে বিপাশা দেখত, অনি দূরে সরে গেছে—অগ্নিদিকে মুখ। হয়তো সেও অনির এক খেয়াল। পরে যেন ভুলে গিয়েছিল বিপাশাকে।

কিন্তু আশ্চর্য, সে বিপাশার স্বপ্নে বারবার আসে। ভদ্র স্বশিক্ষিত মানুষের কণ্ঠস্বরে কথা বলে। বিপাশা বুঝতে পারে, এ অনি এক অলৌকিক অনি। সত্যিকার অনির সঙ্গে তার আকাশ-পাতাল ফারাক। কিংবা সত্যিকার অনি যা হতে পারত, যা তার হওয়া উচিত ছিল, বিপাশার স্বপ্নের অনি সেই ছেলটি স্বপ্নের একটি সম্ভাবনার পরিণত ফসল। এ ফসল বিপাশার অবচেতনতার ক্ষেত্রে যেন অনেক ভ্রমে সাথে ফলানো। অনেক ইচ্ছায় রাঙানো।

অথচ বিপাশা কিছুতেই ভুলতে পারে না। 'সেই কালবোশেখীর সন্ধ্যায় ছাদের ওপর বিদ্যুতের আলোয় ঝলসে ওঠা এক দুর্দান্ত তরুণ মানুষকে—ঝুটি ও শিলপড়ার মধ্যে যে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে আর চিৎকার করে কী বলছে। তার কতস্থানের ব্যাঙের ভিজে বাচ্ছে। ধুয়ে বাচ্ছে ডেটল ও ব্লক।' সে ঝড়ের সঙ্গে গলা মিলিয়ে বলছে, 'বিয়াস। আমার বিয়াস।'

তখন আঠারো বছর বয়স বিপাশার। ঝড়ের সন্ধ্যায় সেই সাংঘাতিক এবং
হৃদয়ের অন্তিমতা তাকে বয়স বাড়িয়ে দিয়েছিল যেন। এবং ভালবাসার একাকার
একটা আবেগ হঠকারিতায় তার অচেনা এক গ্রহে ঠেলে দিয়েছিল তাকে। সেই
থেকে বিপাশা অল্প এক গ্রহের প্রাণী হয়ে গেছে। সেখানে সে ভীষণ একা।

তারপর অনি একদিন বেপাত্তা হয়ে গেল বসন্তপুর থেকে। অপরাধ বা
রক্তনাকে তাদের দাদার কোনো ব্যাপারে দায়ী করা হত না বলে তারা এ বাড়ি
মারেক্ষে আসতে পারত। দাদার কথা তুলে নিজেরাই নিন্দে করত। কেউ
নিন্দে করলে তাতে সাহায্য দিত। তারাই বলেছিল, ‘কে জানে কোথায় চলে গেছে।
আপদ গেছে বাবা।’ কৃষ্ণনাথ বলতেন, ‘কোথায়-কোথায় খুন-খারাপি আর চুরি
ডাকাতি করে বেড়াচ্ছিল বদমাসটা এখন গাঢ়াকা দিয়েছে। ধরা পড়লে
সাবজীবন জেল কিংবা ফাঁসি।’...

বিপাশার মনে হয়, হঠাৎ অনি এসে তার সামনে দাঁড়াবে। রাতে যতক্ষণ
সুপ না আসে, সে ভয়ে ও ভালবাসায় ভাবে, হঠাৎ কোনো অদ্ভুত উপায়ে অনি
যদি তার ঘরে আসে। যদি কিস-কিস করে ডেকে ওঠে, ‘বিয়াস। বিয়াস।
বিয়াস।’

বিপাশা চমকে উঠল আবার। পুকুরের জলের ওপর, বাগানে কুয়াসা
বনিয়েছে। আবছা আঁধারে কুয়াসার রঙ এখন গাঢ় নীল। কুয়াসাব ভেতর
কোনো পাতায় কার শব্দ শুনল কি? ঘুরে-ঘুরে চারপাশ দেখে নিল সে।
বাড়িতে আলো জ্বলেছে। বাড়ির পেছনদিকে খিড়কির দরজার মাথায় যে
বাঁধটা জ্বলেছে, তার আলো এতদূর পৌঁছয় নি। পুকুরের পর কয়েকটা লিচু আর
আমের গাছ। একটা বর্ষা বাঁশের বাড়ি। কুয়াসা মেশানো আঁধারে সব অস্পষ্ট
হয়ে রয়েছে। হিমে তার শরীর অবশ হয়ে যাচ্ছে। বিপাশা উঠে দাঁড়াবে
ভাবল, পারল না। কেউ তাকে খুঁজতে আসছে না কেন? সে এখানে বসে
আছে—কেউ কি তাকে দেখতে পাচ্ছে না? বিপাশার মনে অভিমান হল।
তাকে কেউ চায় না—কেউ পছন্দ করে না। বাবা না—কেউ না।

‘বিয়াস। বিয়াস। বিয়াস।’

বিপাশা তাকাল। তার সামনে কি অস্পষ্ট একটা মানুষ দাঁড়িয়ে আছে?
বিপাশা অস্ফুটস্বরে বলে উঠল, ‘কে?’

‘বিয়াস। আমি অনি।’

বিপাশা চুপ করে থাকল। দাঁতে দাঁত চেপে বসে রইল।

‘কথা বলছ না কেন বিয়াস? আমি অনি।’

বিপাশা তবু কথা বলল না। অনি তার দিকে খুঁকে আসতেই সে আক্রান্ত জঙ্ঘর মতো ছিটকে সরে গেল। তারপর বোবাবরা গলায় চিংকার করে দৌড়ল। গাঢ় নীল কুরাসা অথবা আঁধারে বিভ্রান্ত বিপাশার মনে হচ্ছিল অনি তাকে তাড়া করেছে। সে বাড়ি খুঁজে পেল না। কোথাও আলো চোখে পড়ল না। গাছপালার ভেতর দিয়ে বারবার আছাড় খেতে-খেতে বিপাশা এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করতে থাকল। যেখানে যাচ্ছে, সেখানেই পেছন থেকে অনি শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে বলছে, ‘বিয়াস। আমার বিয়াস।’ বিপাশা বর্মী বাঁশের ঝোপেব ভেতর হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল।

তখন বাড়ির ভেতর যে-যার কাজে ব্যস্ত। কলকাতা থেকে ব্রজেন্স কোনে আবার কথা বলছেন কৃষ্ণনাথের সঙ্গে। শমিতা পাশে দাঁড়িয়ে জবাব যুগিয়ে দিচ্ছেন। শতক্ষ এমন ঝামেলা বাবাবে, কেউ কল্পনা করতে পারেন নি। ফোন ছেড়ে কৃষ্ণনাথ ক্রুদ্ধভাবে বললেন, ‘ব্রজেনদাই ওর মাথাটি কবে খেয়ে আছে। আমি এখন যাই কী করে বলো তো? জরুরী মিটিং রয়েছে। মিনিট্টার আসছেন। বরং এক কাজ করো। তুমি যাও। হতজ্ঞাডাকে আুগাগোড়া মুখুয্যেদের হিসট্রি বুঝিয়ে দিয়ে এস। কাল সকালের ট্রেনেই যাও—নাকি গাড়ি কবে বাবে? আড়াইশে, কিলোমিটার এমন কিছু লং জার্নি নয়।’

শমিতা গুম হয়ে গুনছিলেন। হঠাৎ বললেন, ‘আচ্ছা! বিয়াসকে তো কিবতে দেখলুম না। এই ঠাণ্ডায় অন্ধকারে এখনও কি স্নাইমিং পুলে বসে আছে নাকি? ও ভুলো? একবার দেখতো বাবা।’

ভুলো টর্চ নিয়ে বেরল। পুকুরের দিকটা অন্ধকার হয়ে আছে।

অবেলায় কিছু পুঁটিমাছ

সকালে টিউশনি করে ফেরার পথে শতক্ষর একটা চিঠি পেয়ে ভারি অবাক হল অপর্ণা। একটা মরা দোতার ওপর গঠের সাকো। ওপারে ব্লক বাবুদের কোয়ার্টার। ঝিম মেরে দাঁড়িয়ে আছে সাহেব সাধুদের মতো একদল ইউ-ক্যালিপ্টস গাছ। ফুল আর সবুজ বীথিতে ওদিকটা চকরা-বকরা। তার মধ্যে হলুদ-হলুদ বাসাধব। বড় লোভে অপর্ণা ওখানে টিউশনি করতে যায়। ফেরার পথে সাকোর রেলিঙে হেলান দিয়ে দ্রুত চিঠিটা পড়ে নিল।

শতক্ষ তাকে আমেরিকায় পৌঁছে দেবেই হবে, প্রথম পাতায় এগুলো পড়তে পড়তে আবেগে তার চোখে জল এসে গিয়েছিল। ভালবাসা না হলে কি এমন কথা জুটে? কিন্তু পরের পাতায় গিয়ে দারুণ চমকাল। তারপর রাগে দুঃখে অপমানে সে লাল হয়ে গেল। রক্তনাকে তার চাই। অপরাধী নয়, রক্তনা! রক্তনাকে লুকিয়ে বিয়ে করার ইচ্ছা। তার দিদির সাহায্য চাই। নির্লজ্জ ছোটলোক কোথাকার! বসন্তপুরে থাকতে লেখার সাহস পায় নি। দূরে কলকাতা গিয়ে এই সাহস হয়েছে।

চিঠিটা কুটিকুটি করে ছিঁড়ে মিচে ফেলেছিল অপরাধী। তার মাথার তেতর সন্দেহ ঘুরপাক খেতে থাকল। তাহলে কি হবে থেকে শতক্ষ ও রক্তনা লুকিয়ে প্রেম করছে—সে একটুও টের পায় নি? রক্তনার পেটে-পেটে এতসব আছে, তার দিদি জানতনা কিছুই। আশ্চর্য এবং আশ্চর্য। রক্তনাকে সে এককাল সরল ভেবে এসেছে।

অপরাধী ভেবে পেল না তাকে পছন্দ না হয়ে শতক্ষের রক্তনাকে পছন্দ হল কোন জুগে? ইংরেজি বই পড়ার চঙ করে বলেই কি? সবাই জানে এবং এতো চন্দ্রস্বর্ঘের মতো সত্য যে অপরাধী তার বোনের চেয়ে হালদ। অপরাধীর মাথায় অনেক বেশি চুল। গায়ের রঙও অনেক ফর্সা। নাকমুখের গড়ন চমৎকার। সেজেগুজে থাকলে তার ওপর চোখ না পড়ে পারে না। তার শরীরটাও রক্তনার মতো কাঠি কাঠি নয়, মেদে নিটোল। তার গাল অনেক বেশি ভরাট। তার বুকের সৌন্দর্য স্ত্রীভোল স্ফীতিতে—রমণীর যৌবনকে যা প্রগলভতায় পুরুষের কাম্য করে তোলে। অথচ রক্তনার মধ্যে এখনও নিবোধ বালিকার আদল। রোগা পাকাটি নিস্ত্র।

শেষে ফাঁস করে নিঃশ্বাস ফেলে একটু ধাতস্থ হল অপরাধী। তাহলে শতক্ষ বাবা-মাকেও নির্লজ্জের মতো ব্যাপারটা জানিয়েছিল। বাবা-মা চটেন আর না-চটেন। বোঝা যাচ্ছে, সেজগ্রেই সিঁজিবাড়ি রক্তনাকে ঢুকতে দেয়নি সেদিন।

আবার আশ্চর্য লাগল অপরাধীর। সে ভেবেই পেল না, রক্তনার মতো মেয়েকে নিয়ে শতক্ষ বাবা-মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করে বসল। কী পেয়েছে সে রক্তনার মধ্যে?

বাড়ি ঢুকেই রক্তনাকে বলল, ‘চিঠি পেয়েছিস?’

রক্তনা এনামেলের বাটিতে মুড়ি খাচ্ছিল। সামনে বাঁধানো ‘প্রবাসী’ পত্রিকা—মধুরবাবু যেটা দিয়ে গেছে বৃষ্টির রাতে। হাঁ করে তাকাল। ‘চিঠি? কার চিঠি রে?’

অপরূপা তেঁচি কেটে বলল, 'জ্বাকা! শতক্ষর চিঠি।'

রজনী হাসল। 'হাঃ! কী বলছিস। আমাকে সে চিঠি লিখবে কেন?'

অপরূপা চোখ পাকিয়ে বলল, 'লুকোস নে রনি। এটা তোর বাঁচা-মরার প্রশ্ন। ওই লম্পট বদমাসটার সঙ্গে এ্যাঁদিন নিশ্চয় তুই ডুবে ডুবে জল খাচ্ছিল। পাপ কখনও চাপা থাকে না, জেনে রাখিস।'

রজনী নিম্পলক তাকিয়ে ছিল ওর মুখের দিকে। ক্রমে তার হাসি মিলিয়ে যাচ্ছিল। ঠোঁটের কোনার মূহু ভাঁজ পড়ছিল। শাস্তভাবে বলল, 'দিদি। তাকে কে বলেছে রে মিছিমিছি?'

অপরূপা শক্ত গলায় বলল, 'কেউ কিছু বলে নি। আমি জানি। আমার গায়ে হাত রেখে বল, বিয়াসের দালা তাকে কলকাতা থেকে চিঠি লেখে নি?'

রজনী উঠে এসে তার গায়ে হাত রেখে বলল, 'বিশ্বাস কর দিদি, আমাকে ও কোনো চিঠি লেখে নি। সত্যি বলছি, তাকে তাহলে লুকোতুম আমি?' রজনী ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলল। 'আমি তো ওর সঙ্গে কখনও মিলিনি, তুই জানিস দিদি!'

অপরূপা ওর হাতটা ঠেলে দিয়ে বলল, 'আমার অসাক্ষাতে কী হয়েছে, আমি কি দেখছি? তুই কতদিন ওদের বাড়ি গেছিস।'

রজনী বাচ্চা মেয়ের মতো কান্নার স্বরে বলল, 'সে কি নতুন যাচ্ছি? বিয়াসদির দালা যখন বাইরে ছিল, যেতুম না বুঝি? তুই খালি মিছিমিছি আমার নামে গ্যাণ্ডাল করছিস!'

'খাম্! আর জ্বাকাকান্না বাদে না আমি সব জানি।' এলে অপরূপা তার ঘরে গিয়ে ঢুকল।

রজনী স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। এই আকস্মিক আক্রমণের কারণ খুঁজে পাচ্ছিল না সে। কিছুদিন থেকে অপরূপা কেমন যেন হয়ে উঠেছে। একটুতেই ঝাঞ্জা মেজাজ। ঠাকুমা যাবার পর কয়েকটা দিন খুব আদর দিচ্ছিল তাকে। তারপর কী হল, সে বদলাতে থাকল যেন। সংসারে টানাটানিটা নিশ্চয় ভীষণ বেড়ে গেছে। ঠাকুমা কোথেকে পয়সাবন্দি পেতেন আর চালিয়ে নিতেন কোনরকমে। কালই তো দুই বোনে স্বর সংসার তন্ন তন্ন হাতড়ে ঠাকুমার লুকোনো টাকাকড়ি খুঁজে হুন্ডে হুন্ডেছে। কোনো পাত্রা পায় নি। অপরূপা বলেছে, কোথাও নিশ্চয় আছে। ঠাকুদার নাকি অনেক টাকাকড়ি লুকোনো ছিল মায়ের কাছে শুনেছি। ঠাকুমাই তার খোঁজ রাখেন।

এদিনটা রজনীর এত দুঃখ হল যে সে দুপুরে ভাল করে খেতেই পারল না। অপরাধীও গীড়াগীড়ি করল না তাকে। বিকেলে মধুর বউ এল গল্প করতে। ‘একবার খোঁজখবর নিলেও পাতে গো বাবুদিকিরা। পেনীর বাবা বলছিল, তাকে সঙ্গে করে বরঞ্চ কেউ যদি বেত। কমলবাবুর ভায়েবাবু তো লোক ভাল না। কিরে যে এল, খবরটা তো দেবে। তা নয়, গা ঢাকা দিয়ে বেড়াচ্ছে। আমার বাপু কুড়ানি ঠাকরনের জন্ত ভাবনা হচ্ছে।’

শুনে-শুনে বিরক্ত লাগে এখন। অপরাধী মুখ খুলতে চায় না। রজনী তাকে সায় দেয়। আজ কিন্তু অপরাধী মধুর বউয়ের সঙ্গে জমিয়ে গল্প জুড়ছে। গল্প মানে বসন্তপুরের কুৎসা। রজনী বলল, ‘আমি আসছি।’

অপরাধী গ্রাহ্য করল না। মধুর বউ বলল, ‘পেনীকে সঙ্গে নেবে নাকি দিদি? ডাকব?’

‘ধাক গে। বলে রজনী বেরিয়ে গেল। অপরাধ একবার তাকিয়ে দেখে ঠোট ওন্টাল শুধু।

রজনীর বাড়িতে থাকতে ইচ্ছে করছিল না। ছোটবেলা থেকেই তো পাড়া-বেড়ানী স্বভাব। সে আনমনে এদিক থেকে সেদিক কিছুক্ষণ তেঁটে হাইওয়ায়েতে গেল। তারপর আচাখি-পাড়ায়।

রমেন মোক্তারের মেয়ে ছন্দা রাস্তা থেকে তাকে বাড়িতে ধরে নিয়ে গেল। ‘কী হয়েছে রে রনি? অনেকদিন তোরা পাত্তা নেই যে? ডুবে ডুবে খুব জল খাচ্ছিস বুঝি? চেহারা দেখেই টের পাচ্ছি।’

রজনী চটে গেল। ‘হঁ, তোরা মতো!’

ছন্দা হাসল। ‘ইচ্ছে তো করে রে! পাচ্ছি কোথায় জল? সবাই তো তোরা মতো লাকি নয় যে অ্যামেরিকা থেকে জেটপ্লেনে সটান উড়ে এসে...’

‘ছন্দা!’ রজনী প্রায় চেঁচিয়ে উঠল।

ছন্দা গ্রাহ্য করল না। হাসতে হাসতে বলল, ‘জাখ্ রনি, আমাকে লুকোনো তোরা উচিত হয় নি। সারা বসন্তপুর জেনে গেল, তখন আমি জানতে পাবলুম। এটা কেমন হল বল?’

রজনী জ্বল কুঁচকে বলল, ‘কী জেনেছিস তুই?’

ছন্দার মা কোথায় ওত পেতে দাঁড়িয়ে ছিলেন। স্বরে চুকে বললেন, ‘এহঁ যে রনি! আর যে দেখি না বড়। থাকো কোথায়-বলো তো?’

ছন্দা বলল, ‘ও এখন সিঁজিবাড়ির বউ হতে চলেছে। আর আমাদের পাত্তা দেবে কেন?’

বন্ধনা ক্যাল ক্যাল করে তাকিয়ে রইল। কী বলবে ভেবেই পেল না। কিছু একটা ঘটেছে যেন, অপরূপার কথায় সেটা আঁচ করেছিল। কিন্তু এরাও তো সেরকম কিছু বলছে। তার মুখ নীল হয়ে গেল।

ছন্দার মা বিভাবতী বললেন, 'তা ভালই তো বাপু। আজকাল ওসব কে আর মানে-টানে। বরং সিঙ্গিরা জাতে উঠবে। শুনেছি ওদের পূর্বপুরুষ নাকি বাইরের লোক। ছত্ৰী রাজপুত। তাই পদ্মবী সিংহ। তাতে আর কী হয়েছে? আজকাল টাকাকড়িই আসল কথা।'

বন্ধনা আন্তে বলল, 'কেন এসব কথা আমাকে বলছেন মাসিমা? আমি তো কিছু জানি না।'

ছন্দা ওকে গুঁতিয়ে দিয়ে বলল, 'গ্রাকামি হচ্ছে ফের।'

কাঁপা-কাঁপা গলায় বন্ধনা করুণ মুখে বলল, 'বিশ্বাস কর, আমি সত্যি কিছু জানি না।'

বিভাবতী তাব মুখেব দিকে তাকিয়ে ছিলেন। বাঁকা গাটে বললেন, 'ছেলে এখন সোমন্ত সাবালক। বিদেশে বড় চাকরি করে। সে যখন জেদ ধরেছে, তখন বাবা-মা কি আর আটকাতে পারবে? ওদের কথী শুনেবে কেন? বিয়ে করে সোজা চলে যাবে বউ নিয়ে আপন কর্মস্থলে। সিঙ্গির তড়পানি খেয়ে যাবে।'

বন্ধনা বেরিয়ে এল সঙ্গে সঙ্গে। ছন্দা তার পেছনে-পেছন দৌড়ুল। 'কী রে! তুই রাগ করে চলে যাচ্ছিস কেন? যা বাবা! এই রনি। শোন, শোন!'

বন্ধনা বলল, 'কেন আমাকে নিয়ে তোর জোক করবি? কী করেছে তোদের?'

ছন্দা অবাক হয়ে বলল, 'এ রাম! তুই যে ভ্যা করে কেঁদে কেললি! রাস্তায় দাঁড়িয়ে সিন ক্রিয়েট করবি কেন? আয়।'

'না। পরে আসব।'

ছন্দা দাঁড়িয়ে রইল। বন্ধনা হন হন করে হাঁটতে থাকল। তাহলে বসন্তপুরে তাকে নিয়ে এইসব কথা রটেছে। তাই শুনেই অপরূপা সকালে তাকে চার্জ করে বসেছিল। কিন্তু বোঝাই যায়, সবটাই একতরফা। শতদ্রু বা কেউ তো এধরনের কোনো কথা বলতে তাদের বাড়ি আসে নি।

'রনি। রনি।'

রিকশায় ভগতী নামে একটা মেয়ে যেতে যেতে তাকে ডাকছিল। বন্ধনা ভাবলে সে মিষ্টি হেসে 'কনগ্রাচুলেশন রনি' বলে উঠল। রিকশাটা জোরে

বেরিয়ে গেল। তপতী বি এ পাশ করে এখন কোথায় যেন বি এন্ড পড়ছে।
গ্রাইমারি সেকশানে শিক্ষিকা হয়েছে। রজনীর কিছু হল না।

আবার কিছুটা এগুতেই একটা ঘরের জানলা থেকে কেউ তাকে ডাকছিল—
'রনি! রনি!' রজনী ঘুরে দেখল সজীতাদি। গার্লসকলেজের বাংলার
লেকচারার। কিন্তু ঠর মুখের হাসিতে কি একই কথা লেখা নেই? রজনী ঘেমে
উঠল শীতের অবেলায়। আসলে সজীতাদির বাড়িতেই সে যাচ্ছিল। কিছু
বট-টাইয়ের আশায়। কিন্তু এভাবে তাকে গলিরাতায় দেখামাত্র ডাক দেওয়ার
মানে একটাই দাঁড়ায়।

রজনী মরীয়া হয়ে বলল, 'আসছি সজীতাদি! একটু পরে আসছি। একটা
আরজেন্ট কাজে যাচ্ছি।'

এরপর রজনী আত্মরক্ষার তাগিদে বিপথ ভেঙে ধোপীপাড়ার মাঠ হয়ে
হাইওয়েতে গিয়ে উঠল কের। লজ্জায় অপমানে সে লুকিয়ে পড়তে চাইছিল।
অপমান বৈকি। সে কি এত শস্তা মেয়ে যে যার খুশি তাকে হাত বাড়িয়ে তুলে
নেবে এবং লোকে তাই নিয়ে যা খুশি রচাবে?

এ বয়সে রজনী নিজের কোনো ভবিষ্যত নিয়ে ভাবতে জানে না। বড় জোর
মনে ভেসে আসে একটা চাকরি-বাকরির কথা। সেও খুব স্পষ্ট নয়। তার
একটা চাকরি থাকলে ভাল হত। কিন্তু দিদিরই হল না তো তার মতো
ছপআউটের কী করে হবে? দিদির একটা জুটুক তো। তারপর তার একটা
কিছু ঘটবে হয়তো।

কৌকের বশে এলোমেলো হাঁটতে স্নিপারের কিতে ছিঁড়ল। কতদিন চালাচ্ছে
হিসেব নেই। ছেঁড়া স্বাভাবিক। খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে কিছুটা এসে নিজেদেব
বাড়ির কাছাকাছি খুলে হাতে নিল। ঠিক সেই মুহূর্তে খুব জোবালোভাবে তাব
মনে এল কুড়ানি ঠাকরনের কথা। বুকের ভেতরটা তুলে উঠল। দিদির কাছে
পয়সা চাইবে না প্রাণ গেলেও—ছিঁড়ুক জুতো। ঘরে চূপচাপ দিন কাটাতে বরং।
ঠাকুমা না কিরে এলে বেরুবার নামও করবে না। ঠাকুমার কাছে পয়সা নেবে।
মুচির কাছে যাবে। আবার মাথা উঁচু করে ঘুরে বেড়াবে বসন্তপুরে।

ঠাকুমার জন্ত চোখে জল এসে গিয়েছিল রজনীর। শিরিস কৃষ্ণজড়ার এলাকা
ছাড়িয়ে এখন বিশৃংখল অযত্নে বেড়ে ওঠা গাছ আর আগাছার জটলা। মধ্যে
দিয়ে এককালি রাত্তা। নির্জন রাত্তায় চোখে জল নিয়ে রজনী খুব আশা করল,
বাড়ি কিরে যেন দেখে ঠাকুমা কিরে এসেছেন। সে মনে মনে মাথা কুটছিল,
যেন কিরে আসেন ঠাকুমা। খোঁড়া মাড়ষ। বত কটে-সিটে ক্রাচটা নিয়ে হাঁটেন

একটুখানি। সেও অভ্যাসের হাঁটাচালা বাইরে পর্যন্ত নয়। বিড়কির ভোবার জল শুকিয়ে আরও খানিকটা নেমে গেলে তাঁর সাধ্য থাকে না আর এমন মাহুয় কোথায়। এতদিন ধরে কীভাবে কাটাচ্ছেন কে জানে। একটা চিঠিই বা কেন কাউকে দিয়ে লেখাচ্ছেন না?

বাড়ি কিরলে অপরাধী তাকে দেখে বলল, ‘ছুতোর বউ অবেলায় পুটিমাছ দিয়ে গেল। বললুম, নেবনা ওসব কামেলা। শুনল না। কে বাছবে ওসব? আমার দ্বারা হবে না।’

রঙ্গনা দেখল কচুপাতার গোটাকতক পুটিমাছ খামের কাছে রাখা আছে। মুহূর্তে তার মুখটা খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে গেল। বলল, ‘খব টাটকা রে দিদি! কোথায় পেল এখন?’

‘জানি না’ বলে অপরাধী ইন্দারাতলায় গেল।

রঙ্গনা জুতো দুটো যত্ন করে রেখে মাছগুলো নিয়ে বলল। কদিন মাছের গন্ধ নেই পাতে। দুপুরে শিম পেড়েছিল কিছু। তার সঙ্গে মাবেগগুলির মতো ছোট কয়েকটা আলু কুচিয়ে বোলমতো একটা তরকারি। রাগ ছিল বলে ষাওয়াটা পেট পুরে হয়নি! এবেলা পুষিয়ে খাবে রঙ্গনা।—ছোট ঝটিতে মাছ বাছতে বাছতে বলল, ‘দিদি! লক্ষ্যটা জেলে দিবি?’

ঠাতের রেখা ঢেকে দিয়ে অঙ্ককার নেমেছে সন্ধ্যায়। একটু পরে অবশ্য বাড়ির পেছনের মাঠে চান্দ উঠবে। চাঁদের কথা ভাবলে আবার ঠাকুরার জন্ত মনটা মোচড় দেয়। শীতের জ্যোৎস্নায় কতক্ষণ উঠোনে ঘুরে ফুড়ানি ঠাকুরন কী সব নাড়াচাড়া করে বেড়াতেন। ক্রাচের খুঁট ষাট শব্দ শোনা যেত। বিছানার ওয়ে বঙ্গনা বলত, ‘ও ঠাকুরা! হল তোমার? আমার ভয় করছে যে!’

অপরাধী লক্ষ্য জেলে এনে পাশে রাখলে রঙ্গনা কাঁচুমাচু হয়ে বলল, ‘একটা কথা বলব? রাগ করিস না দিদি।’

অপরাধী খামের কাছে দাঁড়িয়ে আছে। গলার ভেতর বলল, ‘কী?’

‘আচাষি পাড়ায় গিয়েছিলুম। সঙ্গীতাদিব বাড়ি যেতুম বই আনতে। ছন্দা ধরে নিয়ে গেল ওদের বাড়িতে।’

‘গেলি কেন? একবার ওর মা কী অপমান করেছিল ভুলে গেছিস?’

‘নিজে থেকে বাইনি তো।’ রঙ্গনা দুঃখিত কণ্ঠস্বরে বলল। ‘জোর করে নিয়ে গেল। গিয়ে অনেক কথা শোনাল। ওর মাও সায় দিয়ে বলল...’

অপরাধী বলল, ‘বেশ করেছে। তোমার যেমন লজ্জা নেই।’

‘আহা শোন না!’ রজনী গলা চেপে বলল। ‘কীলব আজবাজে কথা
রুটেছে রে, জানিস? সজীতাদি পর্যন্ত। সিদ্ধিরা লোক ভাল না, তা কি জানি
না, কিন্তু এ কী বিচ্ছিন্নি স্যুগল রে দিদি! আমি তো কিছু জানি না।
তুই জানলেও তো বলতিস আমাকে।’

অপরূপা গম্ভীরভাবে বলল, ‘কী বলল ওরা?’

‘বলল...’ রজনী ঢোক গিলল। ‘বলল যে...ভ্যাট! আমার লজ্জা করছে।
তুই কাল আচার্য্যিপাড়া গেলে শুনতে পাবি।’

‘জ্ঞাকামি করিস নে। কী বলল ওরা তাই বল। তারপর দেখাচ্ছি মজা।’

‘না দিদি। তুই ঝগড়া করতে হাসনে ওদের সঙ্গে।’ রজনী ব্যস্তভাবে
বলল। ‘ওরা নিশ্চয় সিদ্ধিবাড়ি থেকে শুনছে। বিয়াসদির দাদা নাকি
আমাদের বাড়ি বিয়ে করতে চায়। তাই নিয়ে ওদের বাড়িতে গুণ্ডগোল হয়েছে।
এইসব।’

অপরূপা কী বলবে ভেবে পেল না। একটু পরে বলল, ‘আমাদের বাড়ি বিয়ে
করবে মানে কী? তাকে তো? সে আমি জানি।’

‘তুই জানিস?’ রজনী চমকে উঠল।

‘জানি বৈকি। বিয়াসের দাদার তাকে তো খুবই পছন্দ।’

রজনী মুখ নামিয়ে ঝাঁশ ছাড়াতে থাকল। অপরূপা যেন একটা জবাব
শোনার আশা করে আছে। একটু পরে রজনী আন্তে বলল, ‘তাকে বলেছে?’

‘হুঁ।’

‘তাকে বলেছে বিয়াসদির দাদা?’

‘বলেছে।’ অপরূপা ঠোঁটের কোনায় বাঁকা হাসল। ‘কী? তোর
আপত্তি নিশ্চয় নেই?’

‘আছে।’ রজনী ঝাঁশ আর মাঁছগুলো কচুপাতায় মুড়ে ইদারাতলায় গেল।
ওখানে রেখে দৌড়ে এসে লম্পটাও নিয়ে গেল। তারপর বলল, ‘আমাকে
একটু হেলন করবি দিদি? জল তুলে দিবি?’

অপরূপা তেমনি বাঁকা হাসি নিয়ে ইদারাতলায় গেল। বালতি নামিয়ে
বলল, ‘কেন? সায়েবলোকের বউ হবি। প্লেনে চেপে অ্যামেরিকা যাবি।
মেমসারয়েব হয়ে উঠবি পুরোপুরি। আপত্তি কিসের?’

রজনী কথা বলল না। জলের বালতি সামনে এলে সে মাছ ধুতে থাকল।

অপরূপা বলল, ‘ঠাকুমা কিরে আহুক। বিয়াসের দাদা তো গৌ ধরে
কলকাতায় আমার বাড়িতে আছে। এখনও পুরো একমাসের বেশি থাকবে।’

তারপর চলে বাবে আমেরিকা। ঠাকুমা এলে ওকে চিঠি লিখব'ধন। ঠাকুমার আপত্তি হবে না, তা বার্তি রেখে বলতে পারি।’

এতটা শোনান পব রত্ননা ঠোটের ডগায় বলল, ‘আমেরিকার বাবার জগত তুই তো স্বপ্ন দেখিস। আমি দেখি? না হয় ইংরেজি বইটাই একটু পড়ার চেষ্টা করি। বেশ তো। আর পড়ব না।’

অপরূপা শব্দ করে হাসল। ‘কী কথায় কী। তোকেই তো ওর পছন্দ।’

রত্ননা হাসিপ্রস্থাসের সঙ্গে বলল, ‘ও একটা ক্লাউন।’

‘এই। কী বলছিস। কোমালিকারেড ছেলে। দেখতে কত সুন্দর। স্বাস্থ্যবান। কত পয়সা ওদের।’ অপরূপা খিল খিল করে হাসতে লাগল।

‘তোমার যখন অত পছন্দ, তুই বিয়ে কর ওকে।’ বলে রত্ননা বাঁটি, মাছ আর অগ্ন্যহাতে লম্প নিয়ে রান্নাঘরের দিকে চলে গেল। অপরূপা অন্ধকার ঠাণ্ডা ইদাবাতলায় গুম হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

অর্থে সাগরে

‘বাবারা! ওগো আমার বাবারা!’

লোহাগড়া স্টেশনের প্ল্যাটফর্মের বেড়ায় পরনের খান শুকুতে দিয়ে হুড়ানি ঠাকরন বোবাধরা গলায় ডাকাডাকি করছিলেন। এইমাত্র ট্রেন এসেছে। ভিড় করে লোকেরা স্টেশনঘরের গেটের দিকে চলেছে। কেউ কান করে না। একজন যেতে যেতে একটা দশ পয়সা ছুঁড়ে দিয়ে গেল সামনে। বৃদ্ধা ক্রুদ্ধ দৃষ্টে পয়সাটার দিকে চেয়ে থাকলেন কিছুক্ষণ। তারপর গাল দিতে থাকলেন, ‘তোদের পয়সার আগুন লাগুক আটকুড়োরা! মিনসেরা! হতজ্ঞাড়ারা! আমি কি ভিক্ষে চাইছি?’

পাশেই গোড়াবাধানো বকুলগাছ। সেখানে ক’জন লোক বসে আছে। একটু আগে তাদের কাছে কষ্ট করে পাছা ঘষড়ে গিয়ে যেই বলেছেন, ‘বাবারা! ওগো বাবারা’, তার খেকিয়ে উঠেছিল। খেকানি শুনে ভয় পেয়ে সরে আবার

জলকলটার কাছে সরে গেছেন কুড়ানি ঠাকরন। সবখানেই বাবারা বলে ডাকলে লোকেরা খ্যাক করে ওঠে কেন কে জানে। কাল বিকেলে লোহাগড়ায় এসেছেন। আজিমগঞ্জে একটা লোক বলেছিল, 'বীকাসীরা মপুর ? সে তো শুনেছি লোহাগড়ার ওদিকে।' তারাই বুদ্ধাকে টিকিট কেটে ট্রেনে চাপিয়ে দিয়েছিল। ট্রেনের কামরার একজনকে বলে দিয়েছিল লোহাগড়ায় নামিয়ে দিতে। কিন্তু নামার পর আবার একই অবস্থা। জগ্যেসু করলে ভিয়ারিনী ভেবে কেটে পড়ে লোকেরা। কেউ যদি না কান পাতে, বীকাসীরা মপুর সে চেনেই না। আর রেলবাবুদের ডেকে কিছু বলতে গেলে তেড়ে বলে, 'ভাগু! ভাগু!' ভোরবেলা বড় শীত পড়েছিল আজ। স্টেশনঘরে উঁকি মারতে গেলে স্টেশনবাবু 'কী চাই' বলে এমন দাবড়ানি দিলেন যে বুদ্ধার প্রাণপাখি খাঁচা ছাড়া হবার উপক্রম।

জীবনে ছ-ছ'টা দীর্ঘ দশক কাটিয়ে এই প্রথম বাড়ির উঠান পেরিয়ে বাইরের পৃথিবীতে আসা। সবজাতেরই হকচকানি, সব কিছু দেখেই মুখে কথা সরে না। ক্যালক্যাল করে তাকান। কী বলবেন কথা খুঁজে পান না। সব ভালগোল পার্কিয়ে যায়। বোবাধরা গলায় জড়িয়ে-মড়িয়ে কোনরকমে উচ্চারণ করেন, বীকাসীরা মপুর কেউ কিছু বোঝে না। ভিড় করে লোক গেলেই ডাকেন, 'বাবারা! ওগো আমার বাবারা!'

পরনের খান ময়লায় দুর্গন্ধ হয়ে উঠেছিল। কাচটা ধোয়া গেছে। অতি কষ্টে আড়াল খুঁজে জৈবকর্ম সেরে নিতে হয়েছে। অনেক সময় হাতের কাছে জলও পান নি। আজ মরিয়া হয়েছিলেন সামনে জলকল দেখে। একটা হাথরে ছেলেকে দশটা পয়সা দিয়ে জল টিপিয়ে নিয়েছেন। খুপখুপ করে কাপড় কাচতে গিয়েও বিপদ। লোকেরা জল খেতে এসে খুব গালমন্দ করেছে।

কাপড় শুকুলে চান করার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু আশেপাশে কোথাও সেই ছেলেটাকে দেখতে পেলেন না বুদ্ধা! নিচে একটু তাকাতে পুকুর আছে। পুকুরটার দিকে তাকিয়ে রইলেন কাতর দুটে। অতদূর যাওয়ার চেয়ে ভয়ের কথা, ডুবে গেলে কী হবে? পৃথিবীটা বরাবরই হৃদয়হীন লোকে ভরা। ডুবে গেলে কি তাঁকে কেউ ওঠাবে? কেউ ওঠাবে না! দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে মজা দেখবে।

প্র্যাটকর্মের বাডুদারনি এল বাঁটা আর বালতি হাতে। আশাবিজ্ঞা কুড়ানি ঠাকরন করণ হেসে বলতে চাইলেন, 'অ মা। আমার সোনার মেয়ে রে। একটুখানি জল টিপে দে না, মাথায় দি।' কিন্তু বাক্যটা গলার কাছ থেকে জিভ পর্যন্ত উঠে এসে সেটে গেল। বাডুদারনি চোখ কটমটিয়ে তাকাচ্ছিল। জীবনে

কখনও টিউবওয়েল টেপেন নি বৃদ্ধা। ঝাড়ুদারনি চলে গেলে নলের তলার মাথা রেখে হাত বাড়িয়ে চাপ দিলেন হাতলে। কয়েকটা ফোঁটা জল পড়তে না পড়তে ভেঙে এল একটা লোক। ‘এটা কি চান করার জায়গা? এই বুড়ি! ভাগ! পুতুরে বা।’

স্টেশনেই চায়ের দোকানে পাউরুটি-চা খেয়ে আজও অত্মদ্বন্দ্বের মতো দুপুরটা গেল। কতদিন ভাত খাওয়া হয় নি! কোথায় ভাত পাওয়া যায় তাও জানেন না। পরসাকড়ি যেটুকু আছে, খাওয়া কি আর যেত না? কলা খেতে সাধ হয়েছিল। দাম শুনে আঁতকে উঠেছিলেন, একজোড়া ওইটুকুন কলা চার আনা দাম? বসন্তপুরে খিড়িকির ভোবার ধারে কী প্রকাণ্ড কলা ফলে। বস্তায় জড়িয়ে সিন্দুকে পাকাতো দিতেন। কেউ কিনতে এলে দরাদরি করতেন না। গাছের কল নিজের হাতে লাগানো।

বাইরের পৃথিবীর কাণ্ডকারখানা দেখতে দেখতে অবাক হতে হতে কুড়ানি ঠাকরন এখন হতাশ হয়ে পড়েছেন। ধরে নিয়েছেন, এটাই নিয়ম। তিনিই কেবল অগ্রকম মানুষ। বাইরে যতক্ষণ আছেন, তাঁকে তাই ততক্ষণ ওইরকম হয়েই চলতে হবে। কোনো ভিখার তাকে খেতে দেখে ভাগ চাইলে আর দেন না। মুখ গোমড়া করে অত্মদ্বন্দ্ব তাকিয়ে ক্ষত চিবোতে থাকেন। ছাটা হাশ্বরে বাচ্চাগুলো প্যাটপ্যাট করে তাকিয়ে তাঁর খাওয়া দেখে। আড়চোখে দেখতে দেখতে গাল দেন। মনে মনে বলেন, ‘শত্রুর! শত্রুর!’

এত যে কষ্ট, অথৈ সাগর, তবু কুড়ানি ঠাকরন হাল ছাড়েন নি। দিনে দিনে জেদটা বেড়ে গেছে। দেয়ালে যখন পড়েছেন, তখন বাঁকাশ্রীরাংপুরে না পৌঁছে ছাড়বেন না। এ গো তাঁর ছোটবেলায় কি কম ছিল? বাবা রাগ করে বলতেন, ‘ওই গো তোর কাল হবে কনক। বলে দিচ্ছি, ওতেই তোর সর্বনাশ হবে।’ কনক বুঝত না সর্বনাশ নাপারটা কী। আজও কি বুঝল এ ‘গোস্তর বছর বয়সে?’

বিকলে কাচা খান পরে বসে আছেন, এমন সময় একটা লোক এসে স্টেশন-ঘরের সামনে বেষ্টায় বসলেন। রোদ পুইয়ে ঝিমুনি ধরেছিল। খামে হেলান দিয়ে ঝিমুতে এসেছেন কুড়ানি ঠাকরন। লোকটাকে দেখে ঝিমুনি কেটে গেল। পরনে পানজাবি-খুত্তি, গায়ে শাল, হাতে একটা লাঠি। গোঁফ আছে পুরুট্ট। মাথায় টাক। ঠিক যেন বাঁকা-শ্রীরাংপুরের সেই গোমস্তামশাই। লোকটা তাঁর দিকে তাকিয়ে বলল, ‘কোথা যাওয়া হবে বুড়িমা?’

কুড়ানি ঠাকরন এতদিন পরে আর অশ্রু সঞ্চরণ করতে পারলেন না।

লোকটা অবাঁক হয়ে গেল। তারপর পকেট থেকে একটা আয়ুর্লি বের করে দিতে আসছে, তখন বুঝা জোরে হাত নেড়ে বললেন, ‘পয়সা চাইনি বাবা। একটা কথা শুধোব।’

‘বলো বুড়িমা।’

এরপর দুজনের মধ্যে এইসব কথাবার্তা হল।

‘বাঁকা-ছিরামপুর যাব বলে বেরিয়েছিলুম বাবা। আজ কী বার?’

‘শনিবার।’

‘গত মঙ্গলবারের আগের মঙ্গলবার সন্ধ্যাবেলা রেলগাড়িতে চাপলুম। তাহলে কদিন হল?’

‘মঙ্গল-মঙ্গল আট। আজ শনি। বুধ বেস্পতি শুক্র গেল এগারো। আজ নিয়ে বারো।’

‘বারোদিন ঘুচ্ছি এ ইন্স্টেশন থেকে সে ইন্স্টেশনে।’

‘সে কী বুড়িমা? কেন, কেন?’

‘বাঁকাছিরামপুর যাব বলে। আমার কপাল বাবা!’

‘ঠেক, এমন জায়গার নাম তো কখনও শুনি নি।’

‘গায়ের পরে মাঠ। মাঠের পরে যেন আবার গাঁ ছিল। তারপর যেন ইন্স্টেশন।’

‘কী স্টেশন?’

‘সেটাই তো খ্যাল ‘করি নি। তখন ছোট বয়েস। ধল্ল মেয়ে। বাবা কোলে করে নিয়ে গিয়ে...’

‘কী কাণ্ড। কোথেকে আসছ বলে তো আগে!’

‘বসন্তপুর। ওইখানে শউরমশায়ের বাড়ি। আর বাঁকাছিরামপুর আমাব বাপের বাড়ি।’

‘বসন্তপুর! ওরে বাবা! সে তো অল্প লাইনে। অনেক দূর এখান থেকে। এলে কিভাবে? পায়ের অবস্থা তো এই।’

‘দুন্ডে কেরাচ ছিল। আমার স্বামী এনে দিয়েছিল কলকাতা থেকে।’

‘কী? ক্রাচ?’

‘হ্যাঁ বা। তা বার সঙ্গে এলুম রেলেরই লোক ছিল। মধুর গৌসাই নাম। মিনসে আমাকে নিমতিতে এস্টেশনে নামাল। রেতের বেলা বড় শীত। তখন আমার গায়ে ওর কলখানা চাপিয়ে পর্যন্ত দিলে। বুঝতে পারচ বাবা, কী বুঝি ওলাওঠোর? আমি ঘুমোলে ওর চুরি করে কেটে পড়ার সুবিধে হবে।’

‘তারপর, তারপর ?’

‘যুমও এগেছিল অনেককাল পরে। বুড়োবয়সে এতদিনে বাপের বাড়ি
বাড়ি। প্রাণে বড় শান্তি। তখন মিনসে আমার পেটের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে পরস
হাতড়াচ্ছে। ঝপ করে ধরতে গেছি। কেটে পড়ল।’

‘তুমি চোঁচালেনা কেন ? লোকে তাকে ধরে পিটুনি দিত।’

‘ভয় লেগেছিল বাবা। এ বয়সে পরভরসা করে বেরিয়েছি। বিদেশবিশুই
জায়গা।’

‘হঁ। তারপর ?’

‘ওলাওঠো মিনসে কখন বুদ্ধি করে আগে থেকে ভ্রাতার কেরাচখানা
সরিয়েছিল। কেন বুঝলে তো ?’

‘হঁউ। তা আর বুঝলুম না। তুমি ওকে তাড়া করবে বলে। তবে
কম্বলখানা তোমার লাভ হল বলে ?’

‘তা হল। তবে কেরাচখানা আর পেলুম না। শেষে লোকে আমার কথা
শুনবে বলল, বুড়িমা, তুমি কিরে যাও। আমরা গাড়িতে-ভুলে দিচ্ছি। আমি
বাবা মনে মনে পিতিজা করে বেরিয়েছি, বাঁকাছিরামপুরে বাপের ভিটের প্রণাম
না করে কিরব না।’

‘কী মুশকিল ! তারপর কী হল ?’

‘দুদিন ওখানে থাকলুম। শেষে একজন বললে, বাঁকাছিরামপুর সাহেবগঞ্জের
কাছে। সেখানে গেলুম। সেখানে গিয়ে শুনলুম, বাঁকাছিরামপুর লোহাগড়ার কাছে।’

‘বুড়িমা ! আর এমন কবে ঘুরো না। মারা পড়বে। বাড়ি কিরে যাও।’

‘তুমি চেন না বাবা বাঁকাছিরামপুর ?’

‘নামটা শোনা লাগছে। কিন্তু কোঁপায় তা বলতে পারব না।’

‘একবারে আমার হয়ে রেলের শোককে শুধোও না বাবা। আমি শুধোতে
গেলে তেড়ে আসে।’

‘তোমার মাথা ধারাপ হয়ে গেছে বুড়িমা ! বাড়ি কিরে যাও। বাড়িতে
কে আছে তোমার ?’

‘দুই নাতনি আছে বাবা। আর কেউ নেই।’

‘তাদের কাউকে সঙ্গে আননি কেন ?’

‘তারি ছিকিত মেয়ে। আমার সঙ্গে আসবে কেন ? আর আসবেই বা কী
করে ? দুই সোমন্ত মেয়ে। একজন এলে একজন থাকবে কি করে ? আবার
দুজনায় এলে বাড়িতে ফুলফলের গাছটা আছে—সব নষ্ট হয়ে যাবে।’

‘তোমার কাণ্ড দেখে রাগ হচ্ছে, আবার দুঃখও হচ্ছে। হাঁ গা বুড়িমা, নিজের বাপের গা কোথায় তা জানো না—এটাই বা কেমন কথা হল?’

‘বাবা! সেই ছোটবেলায় বিষে হয়েছিল। তারপর আর বাপের খবর পাইনি। কেউ আমারও খবর করে নি। সে কতকাল আগের কথা।’

‘হাতেরি! এতকাল ইচ্ছে করেনি বাপের গা যেতে?’

‘ইচ্ছে তো করত। নিয়ে কে যাবে?’

‘কেন? তোমার স্বামী।’

‘সে বেঁচে নেই, বাবা।’

‘যখন বেঁচে ছিল, তখন নিয়ে যান নি কেন?’

‘সে বড় কড়া লোক ছিল। বড় শক্ত পেরান। হ্যা, দয়াধর্ম না ছিল, এমন নয়। তবে বাবার কথা তুললেই বলত, তুলে আছাড় মারত। চুপ করে থাকো। বাবা, আমি খোঁড়া মেয়েমানুষ। নাচার।’

‘তোমার ছেলেমেয়েবা?’

‘মেয়ে তো পেটে ধরি নি। মেয়ে থাকলে মায়ের দুঃখ বুঝত। একটা ছেলে ছিল। সে আলসে বোমভোলা স্বভাবের। যোয়ানবয়সেই পেটে শূল হয়ে মারা গেল।’

‘শোনো বুড়িমা! আমি আজিমগঞ্জ জংশনে যাচ্ছি। তোমাকে নিয়ে যাই। ওখানে বসন্তপুরের গাড়ি ধরিয়ে দেব। গাড়ির লোককে বলে দেব। নামিবে দেবে। বাড়ি কিরে যাও।’

‘শুধোও না বাবা টেশানবাবুদের বাঁকাছিরামপুর...’

‘হাতেরি! মারা পড়বে—একেবারে মারা পড়বে! আমার কথা শোনো। বাড়ি গিয়ে তোমার সেই শিক্ষিত নাতনীদেব বলো, কোথায় বাঁকাছিরামপুর তারা খুঁজে বের করুক। সদরে ডি এম অফিসে—মানে কালেকটরিতে খুঁজলে পাবে। ল্যাণ্ড রেভিনিউ অফিসে খুঁজলে পাবে। -বালহারি তাদেরও আক্কেল বটে বাপু। বুড়ো ঠাকুমা তার ওপর খোঁড়া মানুষ। তাকে এমন করে... হাঁ গা, তারা এতদিন কি নাকে তেল দিয়ে ঘুমোচ্ছে?’

‘না বাবা! আমার নাতনিরা বড় ভাল মেয়ে। ছোটটা তো ইংরেজি বই পড়ে সারাদিন।’

‘রাখোদিকি। চলো আমার সঙ্গে।’

এইসময় একজন এসে বলল, ‘কী হরিদা! বুড়ির সঙ্গে কী অভ্যর্থনা বকবক করছ? হলটা কী?’

হরিবাবু বললেন, 'এই যে রন্ধাকর, চললে কোথায়?'

'ধুলিয়ান বাব। তুমি?'

'আজিমগঞ্জ।'

'ভালই হল। আজিমগঞ্জ পর্যন্ত একসঙ্গে যাই।'

কুড়ানি ঠাকরুন ওদের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তখন তাঁর কথা ভুলে অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল। কিছুক্ষণ পরে টিকিট কাটার ঘণ্টা বাজল। তখন হরিবাবু বললেন, 'ও বুড়িমা। টিকিটের পয়সাকড়ি আছে তো সঙ্গে? না থাকলে আমি কেটে দিচ্ছি।'

বুড়িমা চুপ করে থাকলেন। চোখে জল পড়তে থাকল। পৌছতে পারলেন না বাপের ভিটেয়। পৃথিবীটা এত বড়, এমন অর্থে সাগর। চেউয়ে নাকানি চুবানি খাওয়াই সার হল।

রন্ধাকরবাবু বললেন, 'কী ব্যাপার?'

'পরে বলছি হে। যাচ্ছ নাকি টিকিট কাটতে? দুটো আজিমগঞ্জ কেটে আনো তো। পয়সা নিয়ে যাও।'

এবার কুড়ানি ঠাকরুন পেটে হাত ভরে কাপড়ের ভেতর ন্যাকড়ার গিট খুলতে থাকলেন। এভাবে বন্দির পয়সা বের করা অভ্যাস আছে। হাত দিয়ে বুঝতে পারেন মুদ্রা বা নোটের অংকটা কত।...

অপূর্বে? ঘটকালি

বিপাশা খুব অসুস্থ খবর পেয়েও শতক্ষণ বসন্তপুরে যায় নি। বাবা-মায়ের ওপর ভীষণ খাপ্লা সে। তার পছন্দ করার মেয়ের সঙ্গে বিয়েতে অমত বলে নয়, ঔদেব মানসিকতার সঙ্গে এতকাল পরে এ ছিল একটা প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ। এমনিতেই বাবা-মায়ের সংসর্গের বাইরে কেটেছে শতক্ষণ। তাছাড়া কখনও এমন কোনো পরিস্থিতি দেখা দেয়নি, যাতে ঔদেব সঙ্গে তার কোনো সংঘাত বাধবে।

অসলে লজ্জা হচ্ছে নিজের কাছেই। বিয়ে কি তার মাথায় চড়েছে? বিয়ে করতেই হবে এমন কোনো ইচ্ছা নিয়ে সে দেশে পাড়ি জমায় নি। নেহাত

কথাটা উঠেছিল এবং তারও মনে হয়েছিল, বিশেষে একজন এদেশী সঙ্গিনী থাকলে মন্দ হয় না।

ব্যাপারটা খুব সহজ পথে চলতে পারত। কিন্তু এ এক অলম্যান্ডমক অবস্থা দাঁড়িয়ে গেল। সবাই ভাবছে মেয়েটির সঙ্গে তার বুঝি দারুণ প্রেম। অপরূপাকে মরিয়া হয়ে একটা চিঠি লিখে কেলোছিল। এখন পত্তাচ্ছে, সেটা বিশিষ্ট হঠকারিতা হয়ে গেছে। ছি ছি, কী ভাববে রত্ননা?

এদিকে বসন্তপুর থেকে দুবেলা ট্রাংককল ব্রজেন্দ্র কাছে কৃষ্ণনাথের। ব্রজেন্দ্র বলেন, 'বুঝতেই পারছ ভায়া, আর সে সার্টলেজ নেই। বিশেষ থেকে কিরে দিনকতক যেটুকু বা গ্রাহ্য করছিল আমায়, এখন আর তাও করে না। কোথায়-কোথায় ঘোরে। করে অনেক রাতে। আমার সঙ্গে বিশেষ দেখা হয় না। বরং তোমাদের ছেলে, তোমরা এসে দেখ কী করতে পার।'

ব্রজেন্দ্রও কৃষ্ণনাথের ওপর চটেছেন। এখনও লোকটা সেই জেদী গোয়া থেকে গেলেন। এখনও হাড়ে-হাড়ে জমিদারী গোয়াতু'মি! দিনকাল কত বদলেছে টের পান না কৃষ্ণনাথ। ব্রজেন্দ্র ভেবে পান না উনি কণ্ট্রাকটোরি করতেন কেমন করে? ও কাজ তো মানুষকে আগাপাছতলা বদলে দেয়। লজ্জা যেমন ভয়, তিন থাকতে কণ্ট্রাকটোরি নয়। প্রয়োজনে অনেক সময় তুচ্ছ লোকেরও জুতো বইতে হয়। তাছাড়া কৃষ্ণনাথ নিরীহ সজ্জন মানুষও নন। যা কবতে চান, করতেই তো পারেন। তাঁকে ঠেকাবে কে? সম্ভবত কৃষ্ণনাথের চরিত্রেরই এ এক অসঙ্গতি। নাকি মক্ষ্মলের মানুষের এটাই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য? ব্রজেন্দ্র ভেবে কুল পান না! ওদিকে বিপাশার কী অভূত অহুত—হিষ্টিবিয়া বলেই মনে হচ্ছে। মেয়েকে এনে কলকাতায় সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে দেখাক। পরামর্শ দিয়েছেন ব্রজেন্দ্র। বুঝতে পারছেন না ওরা কী করবে। কৃষ্ণনাথ বলেছেন, 'দেখা যাক।' তারি অভূত লোক এই কৃষ্ণনাথ।

ভোরে উঠে ব্রজেন্দ্র এক টকর ঘুরে আসেন গঙ্গার ধারে। স্নান সেরে ফেরেন। গাড়ি নিয়েই বেরোন। কিরে এসে দেখলেন শতজ ব্রেকফাস্ট টেবিলে তাঁর জ্ঞান অপেক্ষা করছে। ব্রজেন্দ্র ভুরু কুঁচকে ভায়ের আপাদমস্তক দেখে নিয়ে পললেন, হঠাৎ স্মৃতির উদয় যে '

শতজ আস্তে বলল, 'আপনার সঙ্গে কথা আছে।'

'তাই বুঝি?' ব্রজেন্দ্র একটু হাসলেন। 'আমি ধরেই নিয়েছিলুম তোমার সব কথা আজকাল অপূর সঙ্গে থাকে। আমি এখন ওল্ড হাগার্ড। রট্‌ন পিস। কদিন নাগে কেওড়া তলা চলে যাব।'

শতক্ষ বুলল, আমার অভিমান হয়েছে। বলল, ‘দোষত্রুটি থাকলে নিজস্বগে মার্জনা করে দেবেন। কদিন পুরনো বন্ধু-বান্ধবের খোঁজে ছোটোছুটি করে বেড়াচ্ছিলুম।’

ব্রজেন্দ হো হো করে হাসলেন। ‘নেভার মাইও। তোমার সাতখুন মাক।’

‘আপনার সঙ্গে একটা জরুরী কথা আছে।’

‘খুব বুঝেছি। অপূর মাথায় কুলোয় নি।’

‘না মামাবাবু। কোনো প্রেমে-ট্রেমে নয়।’ শতক্ষ একটু গম্ভীর হল ‘আমি ঠিক করেছি, এ সপ্তাহেই চলে যাব।’

ব্রজেন্দ কিছু না বুঝে খুশি হয়ে বললেন, ‘ভাল কথা। খুবই ভাল।’

‘আমি স্টেটসে ফিরে যাব, মামাবাবু। আমার একেবারে ভাল লাগছে না। মানে, ঠিক অ্যাডজাস্ট করতে পারছি না। দম আটকে যাচ্ছে...’

ব্রজেন্দ তাকিয়ে রইলেন ওর দিকে।

‘আমার জয়েন করার কথা সেভেনথ্ মার্চ। আজ ফেক্সয়ারি দেকেও। এখনও আরবানার রাস্তায় হয়তো বরক গলে নি। ল্যাণ্ডলেডি মিসেস বারবারা লিখেছেন, এবার শীতটা বড্ড বেশি। তুমি গ্রীষ্মের দেশে গিয়ে বেঁচেছ।’ শতক্ষ বলতে থাকল। ‘আমি ঠকে লিখে দিলুম, আরবানা হিলসে ফি করার জন্ম পা হুড় হুড় করছে।’ শতক্ষ শুকনো হাসল।

ব্রজেন্দ গুম হয়ে বললেন, ‘বিয়াস ভীষণ অসুস্থ। তাছাড়া...’

শতক্ষ মুখ নামিয়ে বলল, ‘শি ইজ সাইকিক। ছোটবেলা থেকেই। আমার করার কিছু নেই। সাইকিয়াট্রিস্ট দিয়ে চিকিৎসা করালেও সারবে কি না জানি নে। বাবার যাবতীয় কমপ্লেক্স নিয়ে ও জন্মেছিল।’

ব্রজেন্দ ফোঁস করে উঠলেন। ‘সাহেবদের দেশে থেকে তুমিও দেখছি ওদের মতো দেউলে হয়ে গেছ সার্টলেজ! মূল্যবোধগুলোও হারিয়ে ফেলেছ দেখছি। নিজের বোন সম্পর্কে তোমার এমন কথাবার্তা তো ভাল ঠেকছে না!’

‘সাহেবদের মূল্যবোধ আমাদের চেয়ে অনেক বেশি মামাবাবু।’

মনে মনে আহত হলেন ব্রজেন্দ বললেন, ‘তোমার ব্রেনওয়াশের বাকি রাখেনি দেখছি।’

‘এখানে সবাই তা আমাকে বলছে বটে।’

‘তুমি বাবা-মায়ের একমাত্র ছেলে, মাইও ছাট।’

‘আপনি তো জানেন, ওসব কথা নিয়ে আমি কোনোদিন ভাবি নি।’

‘ভাবা উচিত ছিল।’

শতজ্ঞ একটু চুপ করে থাকার পর বলল, ‘সম্ভবত আপনিই সেকথা ভাবার স্বযোগ দেন নি—মনে করে দেখুন মামাবাবু! বসন্তপুর গিয়ে একদিন দেখি করলে আপনি ব্যস্ত হয়ে উঠতেন। লোক পাঠাতেন। কিরে এলে বলতেন, ওই কুৎসিত গ্রাম্য পরিবেশে বেশদিন থাকলে আমি বিগড়ে যাব। বলতেন না?’

‘সে তো তোমার ভালর জগ্গই বলতুম।’ ব্রজেনের মুখ লাল হয়ে গেল। ‘যতসব ডাকাত আর বদমাসের জায়গা। বসন্তপুরে কে এক ডাকাতসদার ছিল নাকি—মেয়ে লুট করে এনে আটকে রাখত ঘরে। আইনকানুনের বালাই ছিল না তোমাদের গ্রামে। কত কথা শুনেছি। বাঁচুৎস সব ঘটনা।’ ব্রজেন আরও উত্তেজিত হয়ে বললেন, ‘আরও যদি সাংঘাতিক কিছু শুনতে চাও শোনাতে পারি। শুনলে বুঝতে, কেন শমির ছেলেকে এখানে রেখে মানুষ করতে চেয়েছিলুম!’

*তজ্ঞ গতক দেখে সাংধান হল। হাসবার চেষ্টা করে বলল, ‘আমি কিছু জানতাম না মামাবাবু।’

‘বাবা অত জানলে শমির বিয়ে ওখানে দিতেন না। তোমারও জন্ম হত না।’ ব্রজেন হঠাৎ একটু শান্ত হলেন। ‘জমিদারবংশের ছেলে বলে বাবা ওই ভুলটা কবে বসলেন।’

‘কী ভুল?’

‘ওসব কথা তোমার শুনতে নেই। তোমাদের ক্যামিলির স্ক্যাণ্ডাল। আমার এসব আলোচনা করার প্রবৃত্তি হয় না।’

‘বলুন না মামাবাবু। আমার জানা দরকার।’

ব্রজেন আরও শাস্তভাবে বললেন, ‘ছেড়ে দাও। শুধু জেনে রাখো, তোমার মায়ের জীবন খুব স্বখের ছিল না। এতকাল পরে বেচারী সম্ভবত একটু স্তব্ধশাস্তি পেয়ে থাকবে। কারণ তোমার বাবার সে বয়সও নেই—দিনকালও বদলেছে।’

শতজ্ঞ আন্তে বলল, ‘আমারও বরাবর ধারণা, বাবা খুব সচ্চরিত্র মানুষ ছিলেন না। দুএকবার নাকি মার্ডারকেসেও জড়িয়ে পড়েছিলেন।’

ব্রজেন কোনো কথা বললেন না। কক্ষি শেষ করে উঠলেন।

শতজ্ঞ বলল, ‘আমি ভাবছি আজই প্লেনের টিকিট কেটে কেলব। নেক্সট-উইকে রওনা হব।’

‘তোমার ইচ্ছা।’ বলে ব্রজেন করিডোর পেড়িয়ে তাঁর লিভিং রুমে ঢুকলেন।

শতক্ষ বেরিয়ে পড়ল।

এয়ার অফিসে বাবার পথে ভাবল একবার অপূর্বর কাছ হয়ে বাবে।
ট্যান্ডি ছেড়ে দিয়ে সে সাকসেনা বিল্ডিংয়ের চওড়া সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল।
লিফটের সামনে যেতেই সোমার সঙ্গে দেখা। সোমা মিষ্টি হেসে বলল, 'হাই!'

এবারে এসে দুবার সোমার সঙ্গে দেখা হয়েছে শতক্ষর। অপূর্বর সঙ্গে
একটা অহুষ্ঠানে নাচ দেখতে গিয়েছিল সোমার গ্রুপের। সোমা
বলেছিল, 'হচপচ গোছের জাস্ট এ ভ্যারাইটি। শুধু কথকে জমে না।' আবেকদিন
হুট করে একা হাজির হয়েছিল শতক্ষ ওর ক্যামাক ট্রিটের ফ্ল্যাটে। ওখানে সোমা
মাঝে-মাঝে একা এসে থাকে। আসলে ওটাই তার গ্রুপের আড্ডা। প্রশস্ত
একটা লিভিং রুমে শক্ত কাশ্মীরী কার্পেট পাতা। বাগ্‌যন্ত্রে ততি বরটা।
ওখানে দাঁড়ালে পর্দার আড়ালে সোমার শোবার জায়গা নজরে পড়ে। বেডের
দেয়ালে কাঠের থাকে সাজানো তিরিও রেকর্ড প্লেয়ার। ডাইনে ডাইনিং স্পেস।
বেশ চওড়া। টেবিলের ছদিকে কেন ছটা চেয়ার বুঝতে পাবে নি শতক্ষ।
কোণায় টিভি। টিভি দেখার জন্য সোফাও আছে। তার লাগোয়া কুকিং রেঞ্জ।

শতক্ষ মনে মনে হেসেছিল। 'ইওর গ্র্যাণ্ড হোটেল ইজ নট সে গ্র্যাণ্ড!'
মনে পড়ে গিয়েছিল কথাটা। একজন সাধারণ মার্কিনের জীবনযাপনের
উপকরণ এবং গৃহসজ্জা এর চেয়ে অনেক গুণে হৃদয় এবং আরামদায়ক।
বাথরুমের কার্পেটেও পা দেবে যায় কয়েক ইঞ্চি।

সোমা সেদিন একটা ইউরোপীয় কনসার্টের সঙ্গে ভারতীয় কয়েকটা ক্লাসিক
নাচ মিশিয়ে নতুন কিছু তৈরি করার নমুনা দেখিয়েছিল। ওর গ্রুপের আরও
দুটি মেয়ে ছিল। উর্মিলা ঘোশি আর নিনা পারভেজ। সাড়ে পাঁচটায় ওরা
চলে গেলে সোমা বলেছিল, 'কী মনে হচ্ছে? ওয়েস্টে এসবের খ্যাতির হবে না?
আপনার কী মত?'

শতক্ষ নাচগান বোঝে না। বলেছিল, 'হওয়া তো উচিত।'

'কেন ওকথা বলছেন বলুন তো?' আপনি কি ওদের ব্যালে কোনো বরনের
পারফরমেন্স দেখেন নি?'

'দেখেছি।'

সোমা তার কাঁধের কাছে সোকার হাতায় বসে বলেছিল, 'আপন এমন
ইনডিকারেন্ট কেন সব কিছুতে?'

'তাই কি?'

'আই থিংক সো।'

‘আসলে আর্ট ব্যাপারটাই আমার মাথায় ঢোকে না।’

সোমা হেসে অস্থির। ‘ইউ লুক জাস্ট লাইক এ্যান আর্টিস্ট। আপনাকে দেখেই প্রথম কী মনে হয়েছিল বলব? পেণ্টার। আপনি...ওয়েল, ওই ছবিটা দেখেছেন। ওটা আমার এক বন্ধুর আঁকা। উবা গ্যাডগিলের নাম নিশ্চয় শুনেছেন। লস এ্যানজেলসে একজিভিশন করল মাস দুই আগে।’

সোমা অনর্গল এধরণের কথা বলছিল। তার ফাঁকে দুটো বিয়ার এনেছিল। শতজ্বর মনে হয়েছিল, সোমার সঙ্গে একজন মার্কিন মেয়ের তফাত কতটুকু? তাছাড়া ওর বাবা-মা এমন অটেল স্বাধীনতা দিয়েছেন মেয়েকে—যদিও ভেতর-ভেতর সোমাকে পীড়িত করার তাগিদও ভারতীয়মতে চলেছে। সোমার স্বাধীনতায় তাহলে কোথাও একটা অচিহ্নিত সীমা রয়ে গেছে যেন।

আজ লিকটে ঢুকে সোমা চোখে হেসে বলল, ‘অপূর্বর কাছেই যাচ্ছি।’

লিকট থেকে নেমে শতজ্বর বলল, ‘আমি স্টেটসে কিরে যাচ্ছি শিগগির। আজই এয়ার অকিসে যাব। ভালই হল আপনার দেখা পেয়ে। বিদায় জানিয়ে দিলাম। অ রিভোয়া!’

সোমা বলল, ‘সে কী! বলছিলেন যে আকটার থ কিরবেন? এনিথিং হাপনড বাই দিস টাইম?’

‘নাঃ।’ শতজ্বর মাথা দোলাল। ‘এমনি। আসলে অ্যাডজাস্ট করতে পারছি না।’

সোমা সায় দিয়ে বলল, ‘তা ঠিক। দেখুন না, আমিও ঠিক অ্যাডজাস্ট করে চলতে পারি না। দিনে দিনে কেমন আনছা-বিটেবল হয়ে যাচ্ছে না কলকাতা? কদর্য ভিড়। ভ্যাণ্ডালিজম। ওমাসে রবীন্দ্রসদনে আমাদের একটা বড় পারকরম্যান্স নষ্ট হয়ে গেল। কী অবসিন সব রিমাঁক পাস করে অডিয়েন্স থেকে, কানে আঙুল দিতে হয়।’

কথা বলতে বলতে করিভোর দিয়ে হেঁটে ওরা অপূর্বর চেয়ারে ঢুকল। দুজনকে একসঙ্গে ঢুকতে দেখে অপূর্ব হকচকিয়ে গেল। তাবপর ফিক করে হেসে বলল, ‘আজ কার মুখ দেখে উঠেছিলুম জানি না। খুঁজে তাকে বের করে কিছু উপহার দেব বরং।’

সোমা বসে বলল, ‘বেশি কিছু আশা করো না অপূর্ব। এমনও হতে পারে তোমার ছাড় ভাঙতে এসেছি আমি। ওঁর কথা আলাদা। উনি তোমার কান্ডিন ব্রাদার।’

অপূর্ব ভয় পাওয়ার ভান করে বলল, ‘তোমার কর্ম্যাল এ্যাণ্ড ভেরি সিরিয়াস মুড দেখলে আমার সত্যি বড় আতঙ্ক হয়, সোমা। সে। মাচ বিজনেসলাইক টক !’

সোমা একটু হাসল। ‘ইয়া। হুদিস ইজ বিজনেস।’

অপূর্ব শতদ্রু দিকে একবার তাকিয়ে বলল, ‘দেন ইউ ওয়েট, জেস্টলম্যান।’ শতদ্রু ওঠার ভংগি করে বলল, ‘সেরে নাও। আমি তত্ত্বকণ কলকাতাদর্শন করি।’

সোমা তার হাত ধরে টেনে বসিয়ে দিল। ‘আপনি বহুদূর তো। ওর এঙ্গে আমাব কোনো...আই মিন, আই হাত নাখিং প্রাইভেট এ্যাণ্ড কনফিডেনসিয়াল উইথ হিম।’

অপূর্ব ওপরে দৃষ্টি তুলে দিয়ে বলল, ‘আই নো আই নো। তুমি ঠর হাম একদম বোটি ঠর ডাল বরাবব। ঠিক হায় ভাই! কাম অন এ্যাণ্ড লাভ মি।’

সোমা বলল, ‘আই লাইক ইউ।’

অপূর্ব হাসতে লাগল। ‘শুনলি তো সাটু?’

সোমা ভুরু কঁচকে বলল, ‘চোয়াটস ছাট? সাটু!’

‘কিছু না। তুমি শুক করে দাও।’

সোমা শতদ্রুকে বলল, ‘আপনার শতদ্রু নামটাকে টুইন্ট করেছে বুঝ?’

শতদ্রু বলল, ‘শতদ্রু ইংরেজি সাটলেজ। তাই থেকে সাটু।’

‘মাই গুডনেস।’ সোমা অবাক হবার ভংগি কবল। ‘আমি তো ভেবে দেখিনি—শতদ্রু নামে একটা নদা আছে।’

অপূর্ব বলল, ‘ওর বোনেব নাম কি জানো? বিপাশা। তাই ডাকনাম বিয়াস।’

‘সঃ! কোথায় থাকেন তিনি?’

অপূর্ব বলল, ‘ধাপখাড়া-গোবিন্দপুরে।’

‘সে কোথায়?’

‘বরে নাও জাস্ট এ প্লেস।’

সোমা কপট বাগ দেখিয়ে বলল, ‘ইউ অলওয়েজ টক নানসেন্স। শতদ্রু, আপনার সেই গ্রামের নামটা কী যেন বলছিলেন—ভেরি হাইট নেম ইনডিড?’

শতদ্রু বলল, ‘বসন্তপুর। যদিও বসন্তপুরে বসন্ত আসে বলে মনে হয় না।’

অপূর্ব ভুরু কঁচকে বলল, ‘হাউ ইট ইজ পসিবল?’

সোমা বলল, ‘কী ?’

‘ওর সঙ্গে কি তোমার কোনো যোগাযোগ আছে—বিশ্ব মুাই নলেজ ?’

শতক্র বলল, ‘সেদিন ওঁদের গ্রুপের রিহার্সাল দেখতে গিয়েছিলুম।’

‘ক্যামাকস্টিটে তো ?’

সোমা ক্ষত বলল, ‘ইউ আর গোলিং বিশ্বও ইউর জুরিসডিকশান।’

‘অলরাইট। নো কোশেন বেবি। আই রিফ্রিট সেক্সলি।’

এরপর কক্ষি এল এবং কের কিছুক্ষণ এবরণের কথাবার্তা হল। অপূর্ব সবসময় এইরকম ক্ষুতিতে এবং রসিকতায় থাকে। কক্ষি খাওয়ার পর সোমা তার কথাটা তুলল। পনের ক্ষেত্রয়ারি তার গ্রুপ টোকিও পৌঁছেছে। ইন্দো-জাপান মৈত্রী সংস্থা এ অল্পটানের হোস্ট। সেখান থেকে আঠারো তারিখে রওনা হবে লসএঞ্জেলস। চেষ্টাচরিত্র করে এ যোগাযোগ ঘটে গেছে। কিন্তু টোকিওতে বাড়তি দুটো দিন যে কাটাবে, তার খরচ কোথায়? ট্রাভেল এজেন্টকে যেমনটি বলেছিল তেমনি ব্যবস্থা হয়েছে। অথচ বোকের বশে বাড়তি খরচের কথাটা খেয়াল করেনি সোমা। এখন কথা হচ্ছে, অপূর্বদের টোকিও অকিস দুটো শোয়ের ব্যবস্থা করতে পারে কি না স্থানীয় কোনো ক্লাব-টাবকে ধরে? ‘ক্রান্তি ট্রুপের’ সেরা এ্যাডভেঞ্চার। সোমা তার গ্যারান্টি দিতে রাজি যেতাবে হোক, দুটো মাত্র শো। সেই শো দুটো হতে পারে। ইন্দো-জাপান মৈত্রী সংস্থাকে অবজ্ঞা ধরা যায়। কিন্তু সেটা ওঁদের ওপর অত্যাচারের সামিল হতে পারে। তাছাড়া এমন অল্পরোধ করাও তো হাংলামি।

শেষে সোমা করুণ মুখে বলল, ‘আই ডিডনট্ থিংক অফ দা আদার সাহড। ডাটস মাই কন্ট। শেষ পর্যন্ত টোকিও থেকে কিরে আসতে হবে হয়তো। অপূর্ব, উড ইউ প্রিজ...’

অপূর্ব মিটিমিটি হেসে বলল, ‘কজন ষাচ্ছ তোমরা ?’

‘জাস্ট নাইন টু টেন ওনলি।’

‘দুদিনের থাক। এসং খাওয়া ?’

‘ডাটস রাইট।’

‘শো না করেও যদি ব্যবস্থা হয় ?’

সোমা লজ্জার ভঙ্গি করে বলল, ‘ও নো নো—প্লীজ! সেটা কেমন দেখায়।’

‘তুমি কেন ভাবছ এমনি-এমনি আরও অকার জুটবে না। টোকিও ইজ এ ভেরি বিগ প্লেস।’

‘অনিশ্চিত তো। যদি—ধরো, আমরা কেল করি? অভিযেন্স না নেয়?’

‘আই সি। তুমি বুদ্ধিমতী এবং হিসেবী। তোমার উন্নতি হবে।’ বলে
 অপূর্ব কোন তুলে পি বি এসে ওভারসি লাইনের ব্যবস্থা করতে নির্দেশ দিল।
 তারপর কোন রেখে বলল, ‘এখন টোকিও লাইন বিজি। বিকেলে পাওয়া সম্ভব।
 তুমি বরং সন্ধ্যার দিকে আমাকে ক্যালকাটা ক্লাবে একবার রিভ কোরে’ কেমন?’
 সোমা বলল, ‘তাহলে এটাও আনসার্টেন!’

‘হতাশ হবার কারণ নেই। আই অ্যাসিওর ইউ।’ অপূর্ব বরাভয়ের ভংগিতে
 হাত তুলল। ‘তুমি তৈরি হতে থাকো ততদিনে। নাও, শ্বাইল বেবি। জাস্ট
 আ হুইট শ্বাইল।’

সোমা হাসল।

অপূর্ব বলল, ‘সাঁটু, হাসিটা দেখলি? আ লাতলি সানবাইজ না?’

সোমা বলল, ‘শাট আপ! ঠুকে জড়াচ্ছ কেন? শতদ্রু, আপনি দেখছেন
 তো, অপূর্ব বিয়ে করার পর কী বিশ্রিকমের ডেপো হয়ে গেছে! আগে ভীষণ
 গোবেচারী ছিল।’

‘তাই তো হয়। এই যেমন সাঁটু এখন আছে—বিশ্বের পবাক অমনি
 গোবেচারী থাকবে?’

আবার ফক্কুরি চলতে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর সোমা শতদ্রুকে বলল,
 ‘বাই দা বাই, আপনি তখন অ রিভোয়া করলেন। সত্যি কি চলে যাচ্ছেন নাকি?’
 শতদ্রু বলল ‘হুঁউ। এয়ার অকসিডে যাব বলে বেরিয়েছি। দ্য শিগগির
 বাওয়া যায়। নেস্ট এ্যাভেলেবল্ ক্লাইটে।’

অপূর্ব তাকাল ওর দিকে। ‘সে কী! বিয়ে না করে ফেরত যাবি? কেন?
 হল কী তোর?’

‘বিয়ে করতে এসেছিলুম বুঝি?’

‘সেরকমই শুনেছিলুম।’

শতদ্রু হাসল। সোমা বলল, ‘আমি উঠি অপূর্ব। ইভনিংয়ে ক্যালকাটা
 ক্লাবে তো? শতদ্রু, হোপ টু সি ইউ এগেন। বাই!’

সোমা উঠে দাঁড়িয়েছিল। অপূর্ব বলল, ‘ওয়েট। সোমা, তোমার ট্র্যাপের
 সঙ্গে একজন গার্জেন নেবে? লসএঞ্জেলস অফি—দেন টি এনতায়ার ইন দা
 স্টেটস। নিম্নে নাও। আমি দিচ্ছি।

সোমা চোখ বড় করে হাসল। ‘মাই গুডনেস! শতদ্রু আপন টোকিও
 হয়ে চলুন না আমাদের সঙ্গে। আমাদের ভীষণ ভাল লাগবে এটা আমার
 মাথায় আসে নি। রিয়্যালি, ইট উড বি আ প্লেজারট্রিপ।’

শত্ৰু আস্তে বলল, ‘তা মন্দ হয় না ! আই ক্যান এ্যাকোর্ড ছাট ।’

সোমা বলল, ‘আমাদের ট্রাভেল এজেন্টকে বললে আপনার বুকিং এ্যারেন্জমেন্ট হয়ে যাবে । চলুন, ওদের অফিসে নিয়ে যাই আপনাকে । এই বিল্ডিংয়েই গ্রাউণ্ডফ্লোরে ।’

দুজনে বকতে যাচ্ছে, অপূর্ব বলল, ‘আমার একটা ধন্বাদ প্রাপ্য ছিল ডালিং ।’

সোমা ঘুবে নলে গেল, ‘যথাসময়ে পাবে । সব কিছু ম্যাচিওর হতে নাও— ভবে না ?’

লিফটে দুজনে নেমে গেল নীচের তলায় । ফুটপাতে নেমে গিয়ে ট্রাভেল এজেন্সিতে ঢুকল । লাল কার্পেট মোড়া মেঝের একপাশে কয়েকটা গদিআঁটা চেয়ার এবং সোফাসেট । টেবিলে অনেক রঙীন পত্রিকা । দুজন সায়েব ট্যুরিস্ট বসে আছে । সোমা বলল, ‘টোকিওর প্রব্লেমটা মাথায় এমনভাবে ঢুকে ছিল যে এব্যাপারটা আমি চিন্তাও করি নি । অপূর্ব সত্যি একটা জিনিয়াস, ওর মাথায় সব দ্রুত খেলে যায় । কিন্তু...’

তাকে থামতে দেখে শত্ৰু বলল, ‘কিন্তু ?’

‘ও কিছু না ।’ সোমা ঘড়ি দেখে বলল, ‘এই রে । সাড়ে বারোটা । আই অ্যাম সো ফুলিশ টু মিস এ্যান এ্যাপোয়েন্টমেন্ট । অপূর্বটা যা দেরি করিয়ে দিল না ! যাক্ গে, এখন হাতে প্রচুর সময় পাওয়া গেল । শত্ৰু, বাইরে কোথাও আমরা ডিনাব সেরে নিয়ে স্বচ্ছন্দে ঘুরতে পারি । কী ? আপত্তি আছে ?’

শত্ৰু বলল, ‘না ।’

‘থ্যাংকস্ । আনুন ।’ সোমা ট্রাভেল এজেন্টের চেম্বারের পর্দা তুলে ঢুকল । শত্ৰু তাকে অনুসরণ করল ।...

কুড়ানি ঠাকরুনের প্রত্যাবর্তন

বারোদিনের দিন সন্ধ্যায় কুড়ানি ঠাকরুন বাড়ি ফিরেছেন । কে দয়া করে সাইকেল রিকশোয় তুলে দিয়েছিল বসন্তপুর স্টেশনে । পাদানিতে বণে দুহাতে রড আঁকড়ে ধরে এসেছেন । রিকশোওলার ডাকাডাকিতে দুই বোন দরজা খুলে অবাক ।

আর সেই কুড়ানি ঠাকরন নেই, এ অল্প মানুষ। অধ্বংস জরোদগর লোল অস্থিচর্মসার এক বুড়ি। মুখের দিকে ক্যাল-ক্যাল করে তাকান। পাঁচটা কথা বললে কোনরকমে একটা জবাব দেন। সেও খুব স্পষ্ট নয়। জীবনের সব কথা যেন শেষবারের মতো বলে নিয়েছেন লোহাগড়ায় এক হরিবাবুর সঙ্গে। নাতনিরা বুঝতে পেরেছে কী ঘটেছিল। দুমিক থেকে দুজনে বাঁঝালো স্বরে চৈচিয়েছে, ‘বাড়ি কিরতে কী হয়েছিল তাহলে? যখন দেখলে ওই অবস্থা—অ্যা? বেশ হয়েছে তোমার। বোকা মেয়ে কোথাকার?’

রজনী পরে বলেছে, ‘আমাদেরই ভুল হয়েছিল রে দিদি! আমরা কেউ খোঁজ নিতে গেলুম না কেন? কিংবা কাউকে পাঠালুম না কেন?’

অপরূপা চোখ পাকিয়ে বলেছে, ‘এখন তো বলছিস। তখন মাথায় এসেছিল কি? অ’ব লোকের কথা বললি, কে তোর লোক শুনি? কগুলা লোক পাবি তুই বসন্তপুরে? মুখে রক্ত উঠে মরলেও কি দেখতে আসবে ভেবেছিস? থাম।’

বুঝা যে অতগুলো দিন প্রায় না খেয়ে কাটিয়েছেন বোকা গেছে। এসে যা গোগ্রাসে ভাত খেলেন, দেখে অবাক লাগে। পরদিন দুইবোন ইদারাতলায় ফেলে রেখেছে ঠাকুমাকে। গরম জল আর সাবান ঘষে ময়লা সাফ করে দিয়েছে। অতিকষ্টে একবার বলেছিলেন, ‘না-না। সাবুন মাখতে নেই ভাই’—কে শোনে ধর্মব কথা? বসন্তপুরে এই এক বুড়ি বিধবা যিনি হবিস্বা না করতে পাকন, একদশটা বরাবর পালন করেছেন—কিন্তু তীর্থধর্ম বরাতে জোটেনি। গৌরবাবু গৌণথেজুরে মানুষ ছিলেন। সময়ও পেতেন না। শুধু অনি আশ্বাস দিত, ‘বে’সো বুড়ি! তোমায় মথুরা-কাশী-বৃন্দাবন সব ঘুরিয়ে আনব। যত পাপ করেছে, সব ধুইয়ে আনব প্রয়াগে।’ অনিকে একঘটি গঙ্গাজলের জন্তে মাথা ভাঙতেন। রজনী এনে দিত মাঝে মাঝে ছকা পাণ্ডার কাছ থেকে। ছকাও দিয়ে যেত কখনও ফুল নিতে এসে! ৭-মাকে নাতনিদের বলেছিলেন, ‘মকর-সংকেবাস্তিতে একবার গঙ্গাসাগর নিয়ে যাবি আমায়? শুনলুম এখান থেকে বাসমোড়নে করে সবাই যাচ্ছে।’ নাতনিরা ঠোট উল্টে বলেছিল, ‘থামে! আদিষ্টোত কোরো না। একেকজনের ভাড়া কত জানো?’

এবার অপরূপা হাসতে হাসতে বলে, ‘ওই ভেবে নাও, তীর্থ করে এলে। প্রচুর পুণ্য হয়ে গেছে তোমার।’

মধু ছুতোর অবস্থা দেখে জিত চুকচুক করে কয়েকঘন্টার মধ্যে একটা কাঠের জাঁচ বানিয়ে দিয়ে গেছে। কিন্তু কুড়ানি ঠাকরনের গায়ে আর একটুও জোর নেই। ক্রাচটাও ভারি অবশ্য। সেটা পড়ে থাকে বারান্দায়। বুঝা পাছা

ষষড়ে একটু আধটু চলাকেরা করেন। ক্যালক্যাল করে তাকিয়ে থাকেন কলকুলের উদ্ভিদের দিকে। শীর্ণ আঙুলে স্পর্শ করেন তাদের। ছুতোরের মেয়েটি আগের চেয়ে জ্ঞাওটা হয়েছে বৃদ্ধার। সারাক্ষণ কাছে থাকে। মুখের দিকে ঝুঁকে প্রশ্ন করে জানতে চায়, কী করতে হবে। আর রজনীরও খুব লক্ষ্য ঠাকুরার দিকে আগের চেয়ে। দুহাতে শূণ্ণে তুলে বারান্দা থেকে নামায় উঠে নে। খিডকির ঘাটে নিয়ে যায়। ঠাকরন ঘাটের মাথায় কলাগাছের কাছে বসে তাকিয়ে থাকেন কলার মোচার দিকে। হলুদ বাঁশপাতা করে পড়ে ডোবাব সবুজ জলে। মাছরাঙা কঞ্চিতে বসে থাকে। একচোখ জলের দিকে, অন্য চোখ পেনীব দিকে। পেনী টিল কুড়োলে কুড়ানি ঠাকরন জড়ানো গলায় বলেন, ‘অই অই।’ পেনী হাসতে হাসতে পাশে বসে পড়ে। ধোলামকুচি কুড়িয়ে সুফতে লুফতে বলে, ‘ও ঠাকমা! লুকা খেলবে?’ রজনী এসে উকি মারে। খিডকির চৌকাঠে দুপাশে হাত রেখে বলে, ‘ঠাকুমা, তোমরা কী কবছ গো?’

মাঘের সূর্য দক্ষিণায়নে সরেছে। রোদে আঁচ বেড়েছে মাঠের দিক থেকে দুপুরবেলা ঘণীহাওয়া এসে বাঁশবন নাজা দিয়ে ডোবাব জলেব প্রপব নাচে। হলুদ পাতা করে পড়ে সর্ সর্ ধ্ব ধ্ব। তারপর ঘুরতে ঘুরতে ছড়িয়ে পড়ে জলেব বুকে। ঘণীহাওয়াটা কলাবন পেরিয়ে বসন্তপুরে ঢোকে। হাইওয়েতে ছেড়া শালপাতা, কাগজের টুকরো, লালনীল সেলোফেন কাগজ উড়িয়ে নিয়ে যায়। পেছন পেছন ষেউ ষেউ করে ছুটতে থাকে নেড়ি কুকুরটা। শালপাতায় বাস্তের গন্ধ ছিল।

ডোবার ঘাটে নির্জন দুপুরে এক বৃদ্ধা চুপচাপ বসে বুঝি এবার মৃত্যুর প্রতীক্ষারত। চোখে জল দেখে ছুতোরের মেয়েটা দৌড়ে বাড়ি ঢকে বলে, ‘ও বাবুদিদি! দেখবে এস দেখবে এস। ঠাকমা কাঁদছে।’

অপরূপা নেই। রজনী এসে বলে, ‘কী হল ঠাকুমা? কাঁদছ কন?’

বৃদ্ধা মাথাটা আন্তে ঘোঁলান। ‘না। কাঁদি নাই।’

‘কেন মিথ্যা কথা? কী তোমার এত দুঃখ বলে তো?’ রজনী পাশে হাঁটু দুমড়ে বসে। ‘বাকালীরা মপুর খুঁজে পেলে না বলে? দিদি তে’ বনেছে—ম্যাপে খুঁজে বের করবে। স্থলে ম্যাপ আছে না জেলার?’

অপরূপা আরও একটা টিউশনি যোগাড় করেছে। সকালসকাল ‘চবেলা পড়াতে যায়। দুপুর অর্ধ ঘোরাঘুরি কবে ব্লকের অফিসার আর মাতবর লোকদের কাছে। ট্রান্সপোর্ট অফিসের হরেন বলেছে, ‘সাধুদাকে বলব তোমার কথা। কলকাতা থেকে কলক। না হয় এখানেই একটা কিছু করলে। মাসে শতখানেক টাকা

পাবার আশা আছে। পরে ভালকিছু পোলে ছেড়ে দেবে।’ অপরাধী আশায় চনমন করে বেড়াচ্ছে। কবে সাধুবাবু কলকাতা থেকে ফিরবেন কে জানে? কলকাতায় আরেকটা অফিস খুলেছেন। সেখানে হলে তো খুব ভাল। কলকাতায় থাকার সুযোগ পোলে অপরাধীকে আর পায় কে।

কদিন পরে অপরাধী সন্ধ্যার পর বাড়ি ফিরল—মুখটা কালো। রক্তনা বলল, ‘কী হয়েছে রে দিদি?’

অপরাধী শুকনো হেসে বলল, ‘কী হবে? কিছু না। তোরা খেয়েছিস?’

‘ঠান্নাকে খাইয়ে দিয়েছি। শুয়ে পড়েছে। আয়, আমরা খেয়ে নিই।’

‘আমি কিছু খাব না রে। তুই খেয়ে নে।’

‘খাবি নে? কী হয়েছে—তাঁও বলবিনে?’ রক্তনা বিরক্তি প্রকাশ করল।

অপরাধী আস্তে বলল, ‘আমি খেয়েছি। তুই খাগে যা।’

‘মিথ্যা বলিস নে। ভাল হবে না বলে দিচ্ছি।’

অপরাধী স্বভাবমতো মেজাজ করল না। বলল, ‘বিশ্বাস কর আমি খেয়ে এলাম।’

‘কোথায় খেলি?’

‘হুটবাবুর রেস্টুরেন্টে।’ অপরাধী শাড়ির ওপর দিয়ে পেটে হাত বুলোল। ‘চপ-কাটলেট কত কিছু।’

রক্তনা সন্দেহের দৃষ্টি চেয়ে বলল, ‘কে খাওয়াল? নিজের পয়সায় নিশ্চয় না?’

‘পয়সা খরচ করে খাব?’ অপরাধী হাসল একটু। ‘আমি অত স্বার্থপর নই বে—খাই ভাবিস তোরা।’

‘বেশ। কে খাওয়াল?’

অপরাধী এবার চটল। ‘জেরা দরছিস কেন? আমার বুঝি বন্ধু নেই?’

রক্তনা ঠোঁট উল্টে একটা ভংগি করে চলে গেল। অপরাধী গম্ভীর হয়ে বসে বইল বিছানায় পা বুলিয়ে। ইচ্ছার বিরুদ্ধে একটু বেশি এগিয়ে গেছে। হরেনকে সে প্রেমিক হিসেবে চিন্তা করতেই পারে না। অথচ হরেনকে পাত্তা দিতে হচ্ছে। সে আজ নীলা রেন্ডোরায় পর্দার আড়ালে তার পায়ে পা ঠেকিয়েছে—তারপর টেবিলের ওপর দিয়ে হাত বাড়িয়ে তার কাঁধ ছুঁয়েছে। এমন কী হাঁ করে বলেছে, ‘আমায় খাইয়ে দাও না অপু।’ অপরাধী হেসে উড়িয়ে দিতে চাইছিল এমন আচরণ। কিন্তু তাকে সত্যি কাটলেটের টুকরো গুঁজে দিতে হয়—হরেনের মুখে।

বেরিয়ে এসে তখন ভীষণ লজ্জায় পড়ে গিয়েছিল অপরাধী। চেনা লোকেরা তো দেখল। কী ভাবে তারা? রাস্তার পাশাপাশি হেঁটে হরেন তাকে এগিয়ে দিতে এল। নির্জনে এসে তার হাতও ধরল। অপরাধী কাঁপছিল। শিরিসতলায় গলি রাস্তায় ঢোকায় মুখে অন্ধকারে হরেন তার দুর্কাঁধ ধরে চুমু খেতে এল। অপরাধী ছাড়িয়ে নিয়ে হন হন করে চলে এসেছে।

ঠাকুমা কিরে আসার পর অপরাধী আবার একা শুচ্ছে। রক্তনা ওঘরে ঠাকুমার কাছে শোয় আগের মতো। আড়াই টাকায় নীলচে শেড দেওয়া একটা ছোট্ট কেরোসিনবাতি কিনেছে অপরাধী। ইলেকট্রিক টেবিল ল্যাম্পের নকল করে নীলাভ আলোটা বেশ লাগে। শুয়ে কত কী করনা করে অপরাধী। নিজের ভবিষ্যত স্পষ্ট করে দেখতে চায়। চাকরি, কোয়ার্টার, এক অস্পষ্ট পুরুষ, এক শিশু—তাকে স্থলে দিতে যায়, মাথায় রঙীন ছাতি। কখনও মধ্যরাতে হঠাৎ সে টের পায়, আমেরিকায় আছে। বিপাশার কাছে শতদ্রব এ্যালবামে অসংখ্য রঙীন ছবি দেখেছিল। স্থলর বাড়ি, রাস্তাঘাট, মানুষজন। তাদের একজন হয়ে যায় সে। তারপর শতদ্রব কথা ভাবতে থাকে। করনা বজ্রদূর এগিয়ে যেতে থাকে। নির্লজ্জ করনা। অবাধ স্বাধীনতায় সেই করনা। তারপর শতদ্রব চিঠিটা যেই প্রসারিত করনাকে মুহূর্তে উড়িয়ে দেয়। জোয়াল আঁটো হয়ে যায় অপরাধীর।

দূরে ছইসল্ বাজিয়ে চলে যেতে থাকে মধ্যরাতের ট্রেন। শব্দহীন রাতে সেইসব দূরের শব্দ দূরে সরে যেতে থাকে। ডোবার ধারে বাঁশবনে পেঁচা ডেকে ওঠে, ক্র্যাও ক্র্যাও ক্র্যাও। অপরাধী লেপ মুড়ি দিয়ে বালিশে মাথা গোঁড়ে। তারপর কখন ঘুম এসে তাকে বাঁচিয়ে দেয়।

টিউশনির জগৎ খুব সকালে উঠতে হয় অপরাধীকে। বেলাঅন্ধি ঘুমোচ্ছে দেখে রক্তনা দরজায় ধাক্কাধাক্কি করছিল। অপরাধী দরজা ‘খুলে বলল, ‘আজ শরীরটা ধারাপ করছে রে! তুই আমার হয়ে যা না রনি। কখনও তো তোকে বলি নি। যা না—কামাই হবে আজ।’

রক্তনা দমে গিয়ে বলল, ‘আমি? আমার পড়াতে দেবে? কোন ক্লাসের বে?’ অপরাধী হাসল। ‘ব্লক অফিসের এগ্রিকালচারাল অফিসার। জিগোস করলে কোয়ার্টার দেখিয়ে দেবে।’

‘ভ্যাট! কোন ক্লাসের স্টুডেন্ট তাই জিগোস করছি।’

‘জুটি মেয়ে—ক্লাস ফাইভ আর ফোর। ছেলেটি ক্লাস টু।’

‘তিনটে?’

‘আর চাই নাকি?’

‘কত দেয় রে দিদি?’

‘পঞ্চাশ টাকা।’

‘ইস! অনেক টাকা দেখ তো তোকে। কী করিস অত টাকা?’

অপরাধা রেগে গেল। ‘শাড়ি-গয়না কিনি মাসে-মাসে। আর খাওয়া দাওয়া-সংসার চালিয়ে দিচ্ছে তোর কর্তাবাবা।’

‘কর্তাবাবা না হোক, কর্তামা তো চালিয়েছে।’ রত্ননা কোঁতকের ভংগিতে বলল। ‘তুই তো মোটে এ মাসটা।’

‘খাক। তোকে যেতে হবে না। যা—ইংরিজি নতুন পড়গে যা।’

‘আহা যাচ্ছি। যাব না বলছি নাকি?’ রত্ননা ওঘরে কাপড় বদলাতে গেল। ওঘর থেকে ফের টেচিয়ে বলল, ‘তোর স্নিয়ারুটো দিতে হবে কিন্তু। আমারটা কবে থেকে ছিঁড়ে পড়ে আছে।’

অপরাধা টুথব্রাশে পেস্ট নিয়ে ইন্দারাতলায় গেল। বলল, ‘সারিয়ে নিতে কী হয়? নিয়ে যেতে পারো না মুচির কাছে?’

রত্ননা শাড়ি পরতে পরতে জবাব দিল, ‘যাবার পথে দিয়ে যাব।’ একটু পরে সে সেজেগুজে বেরিয়ে এসে কুণ্ডিত মুখে বলল, ‘দিদি! ওরা যদি আমায় পড়াতে না দেয়? আর—ওরা তো আমায় চেনেই না রে!’

‘পরিচয় দিবি।’ অপরাধা উঠে দাঁড়াল। ‘এক মিনিট দাড়। বউদিকে চিঠি লিখে দিই।’

কুড়ানি ঠাবরুন এই সাতসকালে লাউগাছেব ভেতর ঢুকে পড়েছেন। কী করছেন, নোকা যাচ্ছে না। হাতে একটা শুকনো ছোট্ট কঞ্চি। রত্ননা বেরিয়ে দেখলেন মুখ ঘুরিয়ে। তারপর আবার কঞ্চি দিয়ে কী গোচাখান শুরু করলেন।

‘জুতো! সারতে পঁচিশ পয়সার বেশি লাগা উচিত নয়।’ বসে অপরাধা বোনকে আরও পাঁচটা পয়সা বেশি দিয়েছে।

রত্ননা বেশ কিছুদিন বাড়ি থেকে বেরোয় নি। সে ইংকিয় উঠেছিল। তবে ব্লক অকিসটা শেষদিকে। বাড়ার এবং বসতি এলাকার উন্টোদিকে। বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে হাইওয়ে। তারপর রশিদুই এগোলে বাক। বাকের ডাইনে খাল। খালে কাঠের সাকো আছে। ওদিকটায় বাজা ভাঙা আর জঙ্গল ছিল একসময়। সমতল করে বিশাল এলাকা জুড়ে হলুদ একতলা বাড়ি, লম্বা পার্ক, ইউক্যালিপটাস, কতরকম বাউগাহ; ক্যাকটাস আর ফুলবাগিচার

উজ্জলতা তৈরি করা হয়েছে। সংকীর্ণ বকবকে শুকনো পিচের পথ। হৃদ্যে কৃষ্ণচড়া। ফুলের সময় হয়ে এল।

আনন্দ এবং উৎকণ্ঠা নিয়ে সেখানে ঢুকল রজনী। পার্কে ঘাস ছাঁটছিল মালী। তাকে জিগ্যেস করলে এ. ও. সায়েবের কোয়ার্টার দেখিয়ে দিল। বারান্দায় কপা লম্বা এবং রোগা এক মহিলা দাঁড়িয়ে উল বুনছিলেন। রজনীকে দেখে হাতের কাজ থামিয়ে তাকালেন। রজনী ভয়ে-ভয়ে বলল, ‘দিদির শরীর খারাপ। তাই আমার পড়াতে আসতে বলল।’

‘তুমি অপূর বোন বুঝি?’ মিষ্টি হাসলেন এ. ও. সায়েবের বউ। ‘অপূর শরীর খারাপ? আচ্ছা। তুমি পড়াবে? কী করো তুমি?’

রজনী একটু হাসল। ‘কিছু না।’

‘এতটুকু মেয়ে তুমি। কোন ক্লাসে পড়ছ?’

রজনী হকচকিয়ে গেল। ‘আমি... আমি আর পড়ি না।’

‘সে কী! কতদূর পড়াশুনা করেছ?’

‘বি এ পাট ওয়ান দিয়েছিলুম।’

‘আর পড়লেনা কেন?’

মায়ের পেছনে দুটি মেয়ে এবং একটি বাচ্চা উকি দিচ্ছিল। রজনী বলল, ‘হল না। বাবা মারা গেলেন।’

‘আচ্ছা। তা ক্লাস কাইভের ইংরেজি পড়াতে পারবে তো?’

‘পারব।’

‘অংক?’

‘হয়তো পারব।’

এ. ও. সায়েবের বউ ঘুরে ছেলেমেয়েদের ধমক দিলেন, ‘কী দেখছ সব? যাও—বসো গিয়ে।’ তারপর রজনীকে বললেন, ‘তুমি বললুম বলে কিছু মনে করো নি তো? একেবারে বাচ্চা মেয়ে। এস।’

রজনী রাগ করেনি বলতে গিয়ে চুপ করল। বলার স্বযোগ পেল না। সে বারান্দায় উঠল।...

সেবেলা রজনী যতক্ষণ পড়াল, এ. ও. সায়েবের বউ ততক্ষণ কাছে বসে নজর রাখলেন। রজনীর অস্বস্তি হচ্ছিল। তার ইংরেজি উচ্চারণ শুনে ভদ্রমহিলা একবার জেনে নিলেন, রজনী ইংলিশ মিডিয়ামে পড়েছে কি না। বসন্তপুরে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল কোথায়? কোন আমলে খ্রীস্টানিশন ছিল। তখন নাকি একটা ছিল। দেশভাগের সময় উঠে যায়। পাত্রীরা সবাই ছিলেন

সায়ের। বসন্তপুরে একঘর হাড়ি খ্রীস্টান হয়েছিল। তারা কোথায় চলে গেছে। পাশের গায়ে কিছু খ্রীস্টান আছে। তাদের ছেলেমেয়েরা বাংলা শুলে পড়ে।

রক্তনা কথা বলে একটা সম্পর্ক গড়তে চাইছিল। কিন্তু মহিলাটি হিসেবী। পড়ানোর স্বার্থ ধরিয়ে দিয়ে উঠে গেলেন। একটু পরে চা আর দুটো বিস্কুট এল। নিজে হাতে তুলে দিয়ে মহিলা বললেন, ‘আমায় স্বঘমা দি বলবে।’ রক্তনা ভারি খুশি হল। সে আসলে চেয়েছিল, তার দোষত্রুটিব জগৎ যেন অপরাধপাকে কথা শুনতে না হয়। দিদির দেওয়া লায়িছটা ভালভাবে পালন করাও উচিত মনে হয়েছিল।

কিন্তু এতেই বুকি গগুগোলে পড়ে গেল সে। স্বঘমা কড়া ধাতের মহিলা সে টের পেয়েছিল। নটায় ওবা শুলের জগৎ তৈরি হতে গেল। তখন স্বঘমা বললেন, ‘তোমার পড়ানোটা আমাব পছন্দ হয়েছে, বুঝলে মেয়ে?’ বলি কী, তুমিই এসে পড়াও না কেন—দিদির বদলে? ফ্যাংকলি বলাই ভাল, তোমার দিদিকে আমরা নেহাত রেখেছি—তখন কোনো টিচার পাচ্ছি না বলে। এখানে টিচারদেব যা দেমাক আব টাকাব ডিম্যাও।’

বক্তনা ভদকে গিয়ে বং, ‘সেখন স্বঘমাদি, আমার সময় হবে না। তাছাড়া...’

এমকের স্থরে এ. ও. সাহেবের বউ বললেন, ‘কী সময় হবে না? বললে তো কিছু করো-টরো না। দিদি বাগ করবে? সোজা কথা বলছি শোনো। তোমার দিদির দ্বারা এসব হবে না। নেহাত গামরা বলে ওকে রেখেছি। বড্ড ফাকিবাজ মেয়ে।’

বক্তনা ভেতর-ভেতর চটেছে। কিন্তু মুখে শুকনো হাসি ফুটিয়ে বলল, ‘আমি টিউশনি করতে পারি না। আমার ঙলও লাগে না। নৈলে কোথাও এতদিন কবতুম।’

‘আচ্ছা।’ বলে স্বঘমা চোখ কটমট কবে তাকালেন।

রক্তনা কুণ্ঠিতভাবে বলল, ‘দিদিকে বলব ববং, ভালভাবে পড়াবে। লাস্ট ইয়ার তো গোটা বছর দিদি পড়িয়েছে আপনাব ছেলেমেয়েদের। আমার ধারণা...’

ভেতরে ভাইবোনে ঝগড়ার চেচামেচি শোন যাচ্ছিল। স্বঘমা চলে গেলেন হস্তদস্ত হয়ে। একটু দাঁড়িয়ে থাকার পর রক্তনা চলে এলো।

সারাপাখ উষ্মেগে সে অস্থির। টিউশনি করার মধ্যে যে এমন সব অপমান আছে, সে কোনোদিন ভাবে নি। অপমান ছাড়া আর কী? একবছর ধরে অপরাধা ওদের পড়াচ্ছে। স্ট্যাণ্ড না ককক, ভালভাবে প্রমোশন তো পেয়েছে

ওঁর ছেলেমেয়েরা। হঠাৎ রজনাকে পেয়ে এমন অদ্ভুত কথা বলার মানে কী? রজনী চটে গিয়ে জাবছিল, সে না গিয়ে অন্য কেউ গিয়ে পড়ালেও হয়তো তাকে একই কথা বলা হত। অপরাধী বদনাম গাওয়া হত।

বাড়ি কিরলে অপরাধী তার গাভীর্থ লক্ষ্য করে হাসতে হাসতে বলল, ‘কী রে? একেবারে স্থলের দিদিমণির মতো তুহো মুখ করে আছিস যে? নিশ্চয় সুষমা দি তোর পড়ানোর খুঁত ধরেছেন। তাকে বলা হয়নি—ভদ্রমহিলা। নিজেকে নাকি বিয়েব আগে টিচার ছিলেন। একটু এদিক-ওদিক হবার যো নেই। ভুল ধরেছিলেন তো?’

রজনী বাঁকা ঠোটে বলল, ‘হঁ, বিজ্ঞানীগগজ মহিলা। ভুল ধরবে আমার। আচ্ছা দিদি, তুই ওখানে কী করে এতকাল টিউশনি করছিস রে?’

‘কেন?’ অপরাধী একটু উদ্ভিন্ন হয়ে জিগ্যেস করল। ‘তোকে খারাপ কিছু বলেছে বুঝি?’

‘হঁঃ! আমি ওদের খারাপ কিছু যে বলবে।’ রজনী রাগ দোঁষে বলল। ‘তুই নাকি ফাঁকি দিয়ে পড়াস-টড়াস।’

‘বলল?’

‘হঁ।’ রজনী জোরে মাথাটা দোলাল।

অপরাধী আরও উদ্ভিন্ন হয়ে বলল ‘কী বলল, কী বলল? ছাড়িয়ে দিয়ে অন্য কাউকে রাখবে বলল?’

রজনী বিরক্তভাবে বলল, ‘অত বলতে পারছি না আমি।’ সে বলল না যে তাকেই পড়াতে বলেছেন এ. ও. সায়েবের বউ। কথাটা দিদি কীভাবে নেবে সে বুঝতে পারছিল না। অপরাধী ভুরু কুঁচকে কী ভাবছে দেখে সে ফের বলল, ‘তুই বরং ওখানটা ছেড়ে দিয়ে অন্য কোথাও খুঁজে জাখ দিদি। পেয়ে যাবি।’

অপরাধী একটু মাথা দোলাল বটে সায়েব দিয়ে, কিন্তু বুক অকিস এলাকায় পড়াতে যাওয়ার পিছনে তার মনের একটা গোপন স্বপ্ন আছে, বোনকে বলতে পারবে না। কার্টের গাঁকোর মুখে হলুদ-হলুদ ফুলে ভরা গাছটার দিকে চোখ পড়লেই তার নেশাধরা আচ্ছন্নতা এসে যায়। ওই এক সুন্দর চাকরি-বাকরির জগত। ছবির মতো একতালা কোয়ার্টার। জানলার নীলপর্দা। বুগানভিলিয়ার ঝালর। মাসে মাসে নিশ্চিত টাকাকড়ি। সমাজশিক্ষা কর্মসূচীতে সে একজন হয়ে উঠতে পারে বৈকি কোনো একদিন—হঠাৎ তার দরখাস্তের তলায় গোটা-গোটা হরকে সহ ‘অপরাধী মুখার্জি’ দেখে কোন সদাশয় অকিসারের মন নরম হয়ে ওঠাও কি অসম্ভব? অপরাধী স্পষ্ট দেখতে পায়, সারাদিন সে গ্রামে-গ্রামে

সেয়েগের মধ্যে ঘুরে কথা বলে-বলে ক্রান্ত গ্রামসেবিকাদের দলে দিনশেষে কিয়ে আসছে জিপ গাড়িতে চেপে তার স্বামীর কোয়ার্টারে—জানলার নীল পর্দা, গেটে বৃগানভিল্লার ঝাঁপিতে লাগ-লাগ ফুল। স্বয়ং কেন যে ওই জীবনকে কথায় কথায় কাঁটাগেটা করেন, অপরাধা বোধে না। আসলে মহিলাটি স্বাধীন। বদমেজাজী। খিটখিটে স্বভাব। আরও তো কত মহিলা আছেন ওখানে—এস. ই. ও. সায়েবের বউটি, পুতুলের মতো গোলগাল চেহারা মুখে হাসি লেগেই আছে। লনে বেতের চেয়ার পেতে বসে উল বুনছেন সারা শীতকাল। পিঠের কাছে বিশাল ডালিয়া। নতুন বিয়ে হয়েছে। চোখে চোখ পড়লেই হেসে বলেন, ‘এই যে!’ অপরাধাকে বসন্তপূরের লোকেরা পাত্তা দিতে চায় না, তার ঠাকুরদা ছিলেন কুখ্যাত ডাকাত নাকি এবং তার দাদাও গুণাবলম্বী ছিলে, তার ওপর এই দারিদ্র্য। কিন্তু ব্লক কোয়ার্টারে অপরাধার কত সম্মান। যেচে পড়ে কত মেয়ে ভাব জমিয়েছে। পুরুষরাও তাকে খাতির করে ভদ্রভাবে কথা বলেন। এমন কী বি. ডি. ও সায়েব পর্যন্ত।

রজনী কাপড় বদলে এসে বলল, ‘ঠাকুরা বুঝি খিড়কির দ্বারে?’

অপরাধা আনমনে মাথা নাড়ল।

রজনী বলল, ‘এবেলা তোর কাজ করে দিলুম। কাজেই এবেলা তুই বাঁধবি দিদি। আগেভাগেই কিন্তু বলে দিলুম। সেদিনকার মতো খাবার-সময় গিয়ে যেন না শুনি, তোরই তো বাঁধার কথা—আমায় তো বলিস নি।’

রজনী অপরাধার নকল করল। তারপর সেই বাঁধানো প্রবাসী পত্রিকাটা নিয়ে খিড়কিতে গেল। কুড়ানি ঠাকুরন কক্ষিহাতে বসে আছেন। পেনী কলার পাতায় কলমি শাক বাছছে। মাঝে-মাঝে কলমিডাঁটায় হুঁ দিয়ে বাঁশি বাজানোর চেষ্টা করছে। না পেরে বলছে, ‘অ ঠাকুরনদি, ছাও না এটুকু—সিদিন কেমন দিইছিলে! অ ঠাকুরনদি! ছাও না।’

ঠাকুরনের চোটে একটু হাসি ফুটেছে এতদিন পরে। কক্ষিটা নাচাচ্ছেন। রজনী পাশে শুকনো মাটিতে বসে বলল, ‘কলমিশাক কোথা পেলিরে পেনী?’

পেনী ডোবার দিকে আঙুল তুলে বলল, ‘ওই তো। তুলে আনলুম। বাবুদাদি, জানো? আর এটুকু হলই মাঝে কামড়ে দিইছিল অ্যান্ডো বড় সাপ।’

কুড়ানি ঠাকুরন বললেন, ‘খোঁয়া, খোঁয়া।’

রজনী লক্ষ্য করে বলল, ‘ঠাকুরা! খোঁয়া বলছ কেন? চোঁড়া বলতে পারো না? তোমার বাপের দেশে বুঝি চোঁড়াকে খোঁয়া বলে?’

কুড়ানি ঠাকরন নিজের মুখের দিকে আঙুল তুলে কিছু দেখালেন।

রজনী খুঁকে দেখতে দেখতে বলল, ‘কী ? কী হয়েছে ?’

‘কঁতা গুঁছে না।’ পট করে উচ্চারণ করলেন বৃদ্ধা। পেনী প্যাট-প্যাট করে তাকিয়ে রইল।

রজনী চমকে উঠেছিল। বলল, ‘ঠাকুমা ! একী গো ? তোমার কথা অমন জড়িয়ে যাচ্ছে কেন ?’ বলে সে দরজার দিকে মুখ ঘুরিয়ে অপরূপাকে ডাকতে থাকল।

অপরূপা তার ঘরের জানলা থেকে, জানালাটা রজনীদের পিঠের কাছেই, বলল, ‘কী রে ?’

‘দেখে যা দিদি, ঠাকুমা কথা বলতে জিভ জড়িয়ে যাচ্ছে। আর দেখতে পাচ্ছিস ? চোটেটা কেমন যেন একটুখানি বঁকে গেছে। তাই না ?’

অপরূপা দেখে নিয়ে বলল, ‘তাই তখন আমাকে আঙুলের ইশারায় মুখ দেখাচ্ছিল। সকাল থেকে কিছু হয়েছে মনে হচ্ছে। প্যারালিসিস না তো ?’

রজনী বলল, ‘ঠাকুমা, চলাফেরা করতে অস্ববিধে হচ্ছে না তো ?’

বৃদ্ধা মাথা দোলালেন। হচ্ছে না।

‘খেতে-টেতে ?’

‘ব্রঁও।’ অর্থাৎ একটু।

পেনী ফিক ফিক করে হেসে বলল, ‘তাই তখন থেকে ঠাউরনদি কী করে কথা বলছে। মাকে ডাকি বাবুদিদি ?’

রজনী ধমকাল। ‘চুপ কর তো। তোর মা ডাক্তার। ও ঠাকুমা, এখানে তাহলে বসে আছি কেন ? অদ্ভুত তো তুমি। এস—চলে এস। বারান্দায় বসে থাকবে এস।’

বৃদ্ধা একটু হাসলেন। ‘না না। কিঁছু অঁয় নি।’ বলে পেনীর জন্ত কলমির্ডাটা ভেঙে বাঁশ বানাতে থাকলেন। রজনী পত্রিকাটা খুলে চোখ রাখল বটে, কিন্তু মন বসল না পত্রিকার পাতায়। সে বারবার মুখ তুলে বৃদ্ধার চোঁটি লক্ষ্য করছিল।

একটু পরে অপরূপা ফের জানলায় এসে বলে গেল, ‘বৃদ্ধবয়সে এমন কতরকম হয়, বুঝলি রনি ? দিদিমারও হয়েছিল না ? শেষে মেসোমশাই ধানবাদের হাসপিটালে নিয়ে গিয়েছিলেন। ম্যাসেজ করে ভাল হলেছিল। ওবেলা বরং একটু ম্যাসেজ করে দেব গরম তেল দিয়ে।’

রজনী বলল, ‘রত্নডাক্তারকে বললে হয় না দিদি ?’

অপরাধা রেগে গেল। ‘এসেই ছুটাকা ভিজিট চাইবে। তারপর ওষুধের দাম।’

‘তাহলে হাসপিটালেই ভাল।’

শোনামাজ্জ কুড়ানি ঠাকরন জোরে নড়ে উঠলেন। জড়ানো গলায় তীব্র প্রতিবাদ করলেন, ‘না।’

ভংগি দেখে রজনী না হেসে পারল না। অপরাধা বলল, ‘সেই তো বলছি। লাইকে কখনও ওষুধ খেতে দেখেছিস ঠাকুমাকে? একবার—তুই তখন বাচ্চা, বাবা জোর করে ওষুধ খাইয়ে দিয়েছিলেন। বমি-টমি করে কেলেংকারি। বলে ওষুধের গন্ধ সহ্য হয় না।’

রজনী ভেবে বলল, ‘কাস্তবাবুর হোমিওপ্যাথি করালে হয় রে।’

অপরাধা উড়িয়ে দিয়ে বলল, ‘বুড়োবয়সে অমন একটু-আধটু হয়। ছাড় তো। দেখবি, ম্যাসেজ করে দেব। ঠিক হয়ে যাবে।...’

অপরাধা রান্নার ব্যাপারে খেলালী। কোনোবেলা সে রাঁধতে বসলে সামান্য উপকরণেই ভাল রাঁধে। মন না থাকলে অস্বাচ্ছন্দ্য করে ছাড়ুবে। এবেলা ভাগ্যিস খেয়ালবশে চালে-ডালে ঘ্যাটমতো করেছিল। কাঁচা লংকা, কলমি শাক আর উঠানের কোণায় বৃদ্ধার হাতের লাগানো বুড়ি বেগুনগাছের সম্ভবত শেষ বেগুনটি পুড়িয়ে খাওয়াটা খুব জমেছিল। ঘ্যাটে জলটা বেশি হওয়াতে কুড়ানি ঠাকরন খেতে পারলেন কোনোরকমে। রাতে তো দিবি শক্ত দিনের ভাত চিবিয়ে খেয়েছেন। সকালে চায়ে মুড়ি ভিজিয়ে গিলেছেন। কিন্তু শক্ত খাদ্য আর গিলতে পারছেন না। খাওয়ার পর সর্বের তেল গরম করে অপরাধা কিছুক্ষণ মালিশ করে দিল। তাতে ঠোঁট সিধে হল না। তেমনি বঁকে রইল।

সে-রাতে শুতে গিয়ে অপরাধা রজনীকে ডাকল, ‘রনি কি শুয়ে পড়লি?’

‘না রে! কেন?’

‘শুনে যা।’

‘কী?’

‘চোঁচ্ছিস কেন? তেমন কিছু না। জাঁট একটা কথা বলব। এ ঘরে আয় না।’

রজনী দরজা খুলে বেরুল। অপরাধা তাকে নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে চাপা গলায় বলল, ‘আচ্ছ, আমার মনে হচ্ছে, ঠাকুমা আর বোধ হয় বেশিদিন বাঁচবে না। দিদিমার ঠিক এমনি হয়েছিল না? তো আমার মাথায় একটা কথা এল। বলি শোন।’

রক্তনা দিদির মুখের দিকে সাগ্রহে তাকিয়ে বলল, ‘কী রে ?’

অপরূপা আরও গলা চেপে বলল, ‘আমার বরাবর ধারণা, তাছাড়া মারের কাছেও শুনেছি—ঠাকুদার নাকি অনেক টাকাকড়ি আর সোনার গয়না লুকোনো আছে বাড়িতে। ঠাকুমা সব জানে। বাবার মৃত্যুর পর তোর মনে আছে তো—ঠাকুমা অনেক টাকা খরচ করেছিল প্রাক্তের সময়।’

রক্তনা বলল, ‘যাঃ! সে তো গয়না বেচেছিল নিজের। নীরেন গ্যাকরাকে ডেকে এনেছিলুম—মনে নেই বুঝি ?’

অপরূপা হাসল। ‘আরও নেই তোকে কে বলল ? নিজের মরার খরচটা রেখে না যাবার পাত্রী নয়—আমি বাজি রেখে বলতে পারি।’

রক্তনা বলল, ‘দাদা ঠিক এই কথা ভেবে ঠাকুমার ওপর অত্যাচার করত।’

‘তুই তর্ক করিস না তো।’ অপরূপা চটে গেল। ‘এখনও মুখে কথা বলতে পারছে—যা বলছে, বোঝা যাচ্ছে। তাই বলছিলুম, আমার চেয়ে তোকে বেশি ভালবাসে ঠাকুমা। তুই আজ রাতেই কোনো ছলে কথাটা তোল না। নিশ্চয় কোথাও ঠাকুদার টাকাকড়ি লুকোনো আছে। শাকপাতা শিমশশা বেচে অত পয়সা পায় কোথায় রে ? তুই বিশ্বাস করিস এটা ?’

রক্তনা ভেবেচিন্তে বলল, ‘ঠাকুদার টাকা হলে তো ব্রিটিশ পিরিয়ডের। সে টাকা চলবে ?’

‘সেকথা পরে।’ অপরূপা উজ্জল চোখে চেয়ে বলল। ‘আর সোনার গয়না ? তার তো মার নেই।’

রক্তনা মুখ নামিয়ে লাজুক হাসল। ‘যাঃ! আমি জিগ্যেস করতে পারব না। তুই করিস, দিদি।’

অপরূপা গম্ভীর হয়ে বলল, ‘রনি ! এটা একটা লাইক এ্যাণ্ড ডেথ কোশেন। আজ রাতেই .’

রক্তনা উঠে দাঁড়াল। তারপর ‘সে আমি পারব না’ বলে সে বেরিয়ে গেল।

পাশের ঘরের দরজা বন্ধ করার শব্দ হল। অপরূপা ঠোঁট কামড়ে দাঁড়িয়ে রইল কতক্ষণ।...

অমরনাথের হাওয়াকল

শতাব্দীর ঠাকুরা অমরনাথ সিংহের বিচিত্র সব বাতিক ছিল। জমিদারী আমলের শেষ জেরা তাঁর মধ্যেই দেখা গেছে। কৃষ্ণনাথ পেয়েছিলেন কিকিৎ ছাই মাত্র। অমরনাথের কাণ্ডকারখানার কোনো মূল্য দেন নি তাই। কলকাতা কিরে অমরনাথ আরও বড় জমিদার অর্থাৎ তৎকালীন রাজারাজড়া এবং সারস্বতদের যা কিছু দেখতেন, বসন্তপুরে তার নকল করতে চাইতেন। বারো-তেরো একর জমির ওপর কুঠিবাড়ির মতো বিশাল বাড়ি, বিদেশী গাড়ি, বিদেশী গাছ ও লতাবিতান, ভাস্কর্য, স্নাইমিং পুল—তারপর একটা হাওয়াকল পর্যন্ত।

এ এলাকায় এই ভাস্কর্য জিনিসটি খুব নজর কেড়েছিল লোকের। দলবেধে বহু গ্রাম থেকে লোকেরা এসে সেটি দেখে অবাক হয়ে বেত। আসলে ফুলবাগান আর লতাবিতানে জলসেচের উদ্দেশ্যেও ছিল অমরনাথের। উত্তর-পশ্চিম রাস্তার এ মাটি গ্রীষ্মে শুকিয়ে খটখটে হয়ে যায়। দীর্ঘতে তলায় পড়ে। পুকুরডোবার পাঁক বেরিয়ে যায়। গভীর ইন্দারায় নল বসিয়ে চল্লিশফুট উচুতে টিনের চরকি লাগিয়ে হাওয়াকল বানিয়েছিলেন অমরনাথ। খরার সময় প্রচণ্ড বাতাসে সেই চরকি বনবন করে ঘুরত এবং ইন্দারা থেকে জল তুলে নলে ঢালার ব্যবস্থা করত। স্নাইমিং পুলটাও তাই ভর্তি থাকতে পারত বারোটা মাস। গাছপালায় জল সেচনের কাজটাও হত। এমন কী এক কোয়ারাও বরবরিয়ে জল ছড়াত চারপাশে। অমরনাথ কোয়ারারাতে কোয়ারার কল খুলে বসে থাকতেন বাগানে।

১৯৪২ সালের আগস্টে ভয়ংকর ঝড়ে হাওয়াকল ভেঙে উড়ে গিয়েছিল। তখন অমরনাথের আর সেদিন নেই। ইন্দারাটা ছিল দক্ষিণপূর্ব কোণে—বার মাথায় ছিল ওই যন্ত্ররমস্তব। কালক্রমে অব্যবহার্য হয়ে জলটা পচে যায়। তারপর শুকিয়ে যেতে থাকে। বাগানের ভাস্কর্য বিরে গজিয়ে ওঠে আগাছা। কিছু তুলে নিয়ে গিয়ে দালানের সামনের বারান্দায় এবং চওড়া সিঁড়ির দুপাশে রাখা হয়েছিল। উজ্জলতা হারালে এবং টুটাকাটা হয়ে গেলে অনেকগুলো কেলে দেওয়া হয়েছিল আত্মকুঁড়ে। ইন্দারা বিরেও আগাছা জন্মেছিল। নষ্ট জট বাগানে আর যেতেন না অমরনাথ। পরবর্তীকালে বড়জোর সাধের স্নাইমিং পুলের ধারে অতিবৃদ্ধ পঙ্ককেশ মাস্তুমটি নাতি-নাতিনীকে নিয়ে বসে গল্প শোনাতেন কোনো-কোনো দিনাবসানে।

অমরনাথের আমলেই হুথের জন্ম একপাল গরু পোষা হত। কৃষ্ণনাথের সময় তাদের সংখ্যা তিনে ঠেকেছিল। একবার একটা বাছুর হাওন্সাকলের ইদারায় দৈবাৎ পড়ে যায়। তাকে অনেক কষ্টে ওঠানো হয়েছিল বটে, কিন্তু বেচাবার কোমর ভেঙে যায়। সেই অবস্থায় সে অনেকদিন বেঁচে ছিল। কৃষ্ণনাথ তখনই বলেছিলেন, ‘ইদারাটা বুজিয়ে দিতে হবে।’

কৃষ্ণনাথ নিশ্চয় সময় পাচ্ছিলেন না কন্ট্রাক্টারির কাজের চাপে। গতবছর সময় পেয়ে ওটা বুজিয়ে সমতল কবে দিয়েছেন। এই একবছরেই সেখানে আস আর ভাটফুলের জঙ্গল গজিয়ে গেছে। চেনা যায়না যে কোনো সময় ওখানে একটা ইদারা এবং তার মাথাব ওপব একটা হাওন্সাকল ছিল।

কলকাতা থেকে শ্রীলক ব্রজেন্দ্রব ডাকে কৃষ্ণনাথ দুদিন আগে জিপে কলকাতা ছুটে গিয়েছিলেন। শতদ্রু আর বাড়ি কিরবেনা এবং ওখান থেকেই আমেরিকা চলে যাবে শুনে কৃষ্ণনাথ মর্মান্বিত। তাঁর আদতে ইচ্ছাই ছিল ন শতদ্রু আবাব বিদেশে যাক। কিন্তু তাকে নিবৃত্ত করার ক্ষমতা বাবা হয়েও তাব নেই সেটা জানতেন। বরং যাবেই যখন, সঙ্গে বউ নিয়ে যাক। কিন্তু এবাব ব্রজেন্দ্রও ভায়েকে বশ মানাতে পারেন নি দেখে কৃষ্ণনাথ মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন। নিজের দুদ স্ত্রী কপটি ফুটিয়ে তুলেছিলেন ছেলের সামনে। তাতে হিতে বপবীত হয়ে গেছে। শতদ্রু বাবাকে মুখেব ওপর বলে দিয়েছে, বসন্তপুরে আর কোনোদিন সে যাবে না। এই জঘন্য দেশে থাকতেও তার আব একটুও ইচ্ছা নেই। অমন শাস্ত শিষ্ট অমাযিক প্রকৃতির ছেলে ছিল শতদ্রু। কৃষ্ণনাথ এব জগা মনে-মনে ব্রজেন্দ্রকেই দায়ী করেছেন। আশ্চর্য, ব্রজেন্দ্রের সামনে শতদ্রু বাবাকে একবকম অপমানই কবল, ব্রজেন্দ্র চূপ কবে থাকলেন। কৃষ্ণনাথ রাগ করে চেনে এসেছেন বলকাতা থেকে।

তবে ব্রজেন্দ্রের সামনে ছেলেকে শুনিয়েও এসেছেন কভা কথা। ‘বদমাস ডাকু কালু মুখুয্যেব কুচ্ছিত নাতনিকে বিয়ে করতে বাধা দিয়েছি বলেই তো। তুমি জানো ওদেব বংশেব কীর্তিকলাপ? কালু মুখুয্যে একটা খোঁড়া অসহায় মেয়েকে কোথাকে লুট করে এনে লুকিয়ে রেখেছিল জানো? তুনাছি সেটা খব নাচু জাতের মেয়ে। তাবই পেটেব ছেলে ছিল গউব মুখুয্যে—স্নাড়তে ঝাতা লিখত আর গাঁজা খেত। সেই গউরের মেয়েকে তোমার চোখে বর শ্রেণপর্ষন্ত—এত দেশবিদেশ ঘূবে এসে এই? ছি ছি ছি। ছি:।’

ছেলের কাছ থেকে ক্বিরে এসে কৃষ্ণনাথ শোনেন এবাব মেয়ের কীর্তি। রাগে দুঃখে এবং কিছুটা আতংকেও কৃষ্ণনাথ ঝিমিয়ে পড়েছেন। কীর্তিই বটে।

কিছুদিন আগে সন্ধ্যাবেলায় বাগানে বর্মীবাঁশের বাড়ে অজ্ঞান হয়ে মুখ ভাঁজে পড়েছিল বিপাশা। তারপর থেকে তাকে জোর করে উইয়ে রাখা হয়েছে। শমিতা সবসময় মেয়ের পাশে। গভীরাত্তে তাঁর তন্মামতো এসেছে, হঠাৎ কেটে গেল বিপাশার কথায়। সে কার সঙ্গে কথা বলছে। টেবিল ল্যাম্প জ্বলে দেখেন, বিপাশা দিব্যি তাকিয়ে আছে এবং তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে, এমন এক অদৃষ্ট লোকের সঙ্গে কথা বলছে। তারপরই চমকে ওঠেন শমিতা। বিপাশা অনি নামে সেই সাংঘাতিক ছেলেটার সঙ্গে যেন কথা বলছে। স্পষ্ট বলাছে, ‘অনি! তুমি আর এস না। জানাজানি হয়ে যাবে।’

শমিতা ভীষণ ভয় পেয়ে যান। বিপাশাকে ডাকাডাকি কবেন। ধাক্কা দেন। বিপাশা বিভবিড় করে বলে, ‘হাওয়ারকলের কাছে। হাওয়ারকলের কাছে আমি যাব না। আমার বড় ভয় করে হাওয়ারকলের কাছে যেতে।’

রুঞ্চনাথ কাঠি হয়ে গুনছিলেন। স্বাস্থ্যপ্রশাসকের সঙ্গে বললেন, ‘হাওয়ারকল?’

‘হ্যাঁ। তাই তো বলল।’ শমিতা চাপাগলায় বললেন। ‘তারপর মুখে জল ছোটানুম। ঠাণ্ডার মধ্যে টেবিলফ্যানটাও মাথার কাছে খুলে দিলুম। ডাক্তার যে টাবলেটটা কিটের সময় মুখে পুরে দিতে বলেছেন, তাও দিলুম। কিন্তু জ্ঞান হল না। তবে চোখ বুজল।’ মনে হল ঘুমোচ্ছে।’

রুঞ্চনাথ গলার ভেতব কের বললেন, ‘হাওয়ারকলের কথা বলছিল? আশ্চর্য তো।’

‘তারপর শোন কী হল। এই দেখ, আমার হাত পা কাঁপছে।’ শমিতা বললেন। ‘তারপর আবার ঘুমিয়ে গেছি। হঠাৎ ঘুম ভেঙে দেখি, ‘বন্যাস লেপ ছেড়ে উঠে আমার ওপর দাঘে তামাণ্ডি দিয়ে যাচ্ছে। দ্রুততে জড়িয়ে ধরে বললুম, কোথায় যাচ্ছিস? আমায় বাঁকা মেরে খাটের নিচে নামল। আমায় আরও শক্ত করে জড়িয়ে ধরলুম। তখন ধস্তাধস্তি করতে শুরু কবল অব কান্ডতে কান্ডতে কী বলল জানো?’ শমিতা আরও গলা চেপে বললেন, ‘আমি অনির কাছে যাব। ছেড়ে দাও, আমি অনির কাছে যাচ্ছি। হাওয়ারকলের কাছে অনি আমার জন্য দাঁড়িয়ে আছে। আমায় ছেড়ে দাও।’

রুঞ্চনাথ তাকালেন। ঠোট কামড়ে ধরলেন।

শমিতা বললেন, ‘আমি কাপড়চোপড় সামলে উঠতে না উঠতে দরজা খুলে বেরিয়ে পড়েছি। তখন ভুলোদের ডাকলাম। সবাই ছুটে গেল সিঁড়ি বেয়ে। আমিও গেলুম। ও তখন দৌড়ছে। খুব জ্যোৎস্না ছিল। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার দেখ, কেউ ওকে আটকাতে পারল না। গায়ে যেন অসম্ভব স্ট্রেচ।

একেবারে হাওরাকলের ওখানে—মানে ইদারার জায়গায় আছাড় খেয়ে পড়ল চপড়ার সময় সে কী চিংকার অনি বলে। সে-চিংকার শুনে মনে হবে, অস্ত-কেউ।’

‘হঁ। তারপর?’

‘অজ্ঞান হয়ে গেল। কাঁটা-খোঁচে মুখ, গলা সব চিরে রক্তারক্তি। কাপড়-কালা-কালা হয়ে গেছে। ধরাপরি করে তুলে আনা হল। তখন রাত তিনটে। ডাক্তার চ্যাটার্জিকে কোন করলুম। ভদ্রলোক একটু পরেই এলেন। ওষুধ দিলেন। ব্যাণ্ডেজ করে দিয়ে গেলেন। বললেন, ইমিজিয়েটলি কলকাতায় নিয়ে যান কোনো সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে। আর কেলে রাখবেন না। অবস্থা সিরিয়াস মনে হচ্ছে।’

কৃষ্ণনাথ কের শুধু বললেন, ‘হাওরাকলের কাছে। তাহলে কি ও...’

খামতে দেখে শমিতা বললেন, ‘কী?’

‘কিছু না। কী করছে এখন?’

‘শুয়ে আছে। টেপারেকর্ডার চালিয়ে গান শুনছে।’

‘স্বাভাবিক কথাবার্তা বলছে তো এখন?’

‘বলছে। তবে কথা বলছে খুব কম।’

‘খাওয়ানোওয়া?’

‘খাচ্ছে, তবে বলছে মুখের আদ নেই।’

‘চলো, গিয়ে দেখছি।’

কিছুক্ষণ পরে পোশাক বদলে কৃষ্ণনাথ বিপাশার ঘরে গেলেন। শমিতা পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। টেপারেকর্ডারে বিদেশী অর্কেস্ট্রা বাজছে। জানালা দিয়ে দক্ষিণ থেকে রোদ এসে পড়েছে বিপাশার গায়ে। সে একটা চাদর বুক অধি ঢেকে শুয়ে আছে। মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে শিউরে উঠলেন কৃষ্ণনাথ। মাত্র দুতিনদিনেই বিপাশার চেহারা আরও মলিন হয়ে গেছে কেন? মুখের রঙ পাণ্ডুর। চোখের তলার কালি। কী এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে বাবাকে দেখেই চোখ নামাল। কৃষ্ণনাথ গিয়ে মাথায় হাত রেখে ডাকলেন, ‘বিয়াস!’

বিপাশা একটু হেসে বলল, ‘উ?’

‘কেমন বোধ করছ এখন?’

‘তুমি কলকাতা গিয়েছিলে?’

‘হ্যাঁ।’

‘দাদা এল না?’

কৃষ্ণনাথ একটু ইতস্তত করে বললেন, ‘আসবে। ওর তো বসন্তপুরে কোনোদিন মন টেকে না। টিকবে কী করে? বরাবর মের্টপলিসে যাক। তারপর অ্যামেরিকার মতো জায়গায়। এখন তো আর এদেশের কোনো মের্টপলিসে মন টিকবে না।’

শমিতা বললেন, চল। তুই-আমি কলকাতা বাই। দাদা রোজই তো ডাকছেন। তোকে অনেকদিন দেখেন নি। বাবি?’

বিপাশা আস্তে বলল, ‘উঁহ। আমি কোথাও যাব না।’

শমিতা হেসে বললেন, ‘সে কী। কেন রে?’

বিপাশা চুপ করে থাকল। কৃষ্ণনাথ বললেন, ‘যাবে, যাবে। শরারটা একটু দুর্বল তো। ওষুধ টিষুধ খেয়ে গিয়ে স্ট্রেচ হোক—তবে না।’

একটু পরে কৃষ্ণনাথ বেরিয়ে গেলেন। বিকেল নেমেছে। অমরনাথের সুইমিং পুলের কাছে কিছুক্ষণ আনমনে দাঁড়িয়ে থাকলেন। তারপর হাওয়াকলের ইদারার দিকটারে চোখ রাখলেন। হঠাৎ মাথার ভেতরটা প্রচণ্ড ক্রোধে উত্তপ্ত হয়ে উঠল। হনহন করে এগিয়ে গেলেন লুপ্ত ইদারার ঝোপের কাছে। একটা ভাটফুলের ঝোপের মাথা খামচে ধরলেন কৃষ্ণনাথ। পটপট করে ছিঁড়ে গেল একগুচ্ছ বন্য ফুল।

শক্ত হায়ে দাঁড়িয়ে ষাড় ঘুরিয়ে কৃষ্ণনাথ চোখের দৃষ্টিতে জরিপ করছিলেন। বাড়ির দোতালার পূর্বদিক কোণে বিপাশার ঘর। জানলা থেকে এখানটা সরাসরি নজরে পড়ে। বিপাশা কি কিছু দেখেছিল তাহলে?

ভাটফুলগুলো ছুড়ে কেলে দিলেন কৃষ্ণনাথ। তাঁর হঠাৎ কেমন গা ছমছম করতে থাকল। ক্রত চল এলেন ওখান থেকে। কিছুটা দূরে চৌকোনা পুকুরের ঘাটের মাথার বাঁধানো জাঁপ চত্বরে বসে পানজাবির পকেট থেকে সিগারেট বের করলেন। কিছু দূরত্রে গিয়ে কিছুক্ষণের জন্য অগমনস্থ হয়ে পড়লেন।

কেঁচুয়া! কেঁচুয়া!

‘অপু, অপু!’

অপরাধ হনহন করে ফিরে আসছিল ব্লক কোয়ার্টারে টিউশনি সেয়ে। মেজাজ ভাল নেই। সেই সময় নির্জন রাস্তায় কেউ পেছন থেকে চাপা গলায় ডাকলে। ঘুরে দেখল করেন।

বটগাছের তলায় সে সাইকেল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মুখে মিল্মিটি হাসি।
‘অপু কি রাগ করেছ আমার ওপর? আহা, শোনোই না।’ সে হাত তুলে
কাছে ডাকল।

অপরূপার বুকের ভেতর কা একটা কাঁপুনি। সে আস্তে বলল, ‘বলো।
আমার জরুরী কাজ আছে।’

‘যা বাবা।’ তোমার হল কী বলো তো?’ হরেন সাইকেল ঠেলে নিয়ে
কাছে এল। ‘টিউবটা এখানে এসেই পাংচার হয়ে গেল হঠাৎ। এক জায়গায়
ষাচ্ছিলুম। কী গেরো দেখ তো।’

অপরূপা বলল, ‘সারিয়ে নাও গে।’

পায়ে হাঁটতে হাঁটতে হরেন বলল, ‘আমি জানি তুমি রাগ করবে। সেদিন
ঝোঁকের মাথায় হয়তো একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছি।’

অপরূপা কোনো কথা বলল না।

হরেন বলল, ‘ক্ষমা চাইতে যেতুম তোমার কাছে। সাহস হচ্ছিল না। তুমি
এছক্কেটেড মেয়ে, আমি স্কলকাইজাল।’ সে হাসতে লাগল। ‘আমাব এসব
বাড়াবাড়ি লাভে না। তাই না?’

অপরূপা হেসে ফেলল ওর কথার ভংগিতে। বলল, ‘সাইকেল সাবয়ে নিয়ে
যেখানে যাচ্ছিলে যাও। আমি চলি।’

হরেন বলল, ‘শোনো অপু, সাধুবাবু করেছেন এ্যাদিনে। ওনাকে তোমার
কথা বলেছি।’

অপরূপা তাকাল তার মুখের দিকে। মুহূর্তে তার মনের সব জ্বালা একপাশে
সরে গেল। বলল, ‘কী বললেন?’

‘বললেন ভালই।’ হরেন গাঙ্গুরী নিয়ে বলল। ‘বুঝতেই পারছ অপু,
তোমার ব্যাপারটা সব সময় আমি ভাবি। এ অবস্থায় কীভাবে তোমরা দুটি
বোন বেঁচে আছ, তাবতে আমার খুব কষ্ট হয়। ঘরদোরের অস্বাস্থ্য তো ওই।
কখন...’

কথা সেরে অপরূপা বলল, ‘কী বললেন সাধুবাবু?’

হরেন একটু হাসল। ‘বহরমপুরের অকিসে, নয়তো কলকাতার অকিসে—
যেখানে হোক, মনে হচ্ছে হয়ে যাবে। দেশজোড়া ট্রান্সপোর্টের কারবার তো।
শিগিরি হয়ে যাবে। আমি চেষ্টা করইলুম।’

‘আমি বরং গিয়ে দেখা করি সাধুবাবুকে। কী বলো?’ অপরূপা আগ্রহে
বলল।

হরেন বলল, ‘আরও একটু এগোতে দাঁও আমার। বুঝলে না? কোটিপতি লোক। কখন মেজাজ কেমন থাকে। সময় হলে আমিই নিয়ে যাব তোমাকে।’

বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোলার ঢুলতে ঢুলতে অপরূপা বলল, ‘যাঃ। সব তোমার চালাকি!’

হরেন দাঁড়িয়ে গেল। অভিমান দেখিয়ে বলল, ‘এতটুকুন বেলা থেকে তোমায় আমি দেখছি। তুমিও আমায় দেখছ। আমাদের অবস্থা না হয় এখন পড়ে গেছে—তোমাদেরও গেছে। কিন্তু এত সহজেও কি কখনও তৎপরতা করতে দেখেছ আমাকে? সৎভাবে থেকে দুটো পয়সা রোজগার করি। কারুর হরে-হস্মে খাই নে। তাহলে তো কবে আঙুল ফুলে কলাগাছ হত।’

এসব শোনার পর অপরূপা ওর কথায় অবিশ্বাস করবে কোন যুক্তিতে? মিষ্টি হেসে বলল, ‘হয়েছে বাবা, হয়েছে! আমি কি তাই বলেছি?’

হরেন বলল, ‘অপু! বিকেলে এমো না! আমাদের আঁকসের সামনে এসে একটু দাঁড়াবে। আজ দুজনে সার্কাস...’

‘সার্কাস এসেছে শুনেছি।’ অপরূপা ঈষৎ দুঃখিতভাবে বলল। ‘রনি দেখতে চাইছিল। তো ঠাকুরার যা অবস্থা।’

‘কী হয়েছে গো ওনার?’

হরেনের কথার মধ্যে স্নেহ ছিল। অপরূপার ভাল লাগল। বলল, ‘প্যারালিসিস মনে হচ্ছে। মুখটা বেঁকে গেছে। কথা বলতে পারছে না।’

‘কাকে দেখাচ্ছ?’

‘দেখানো হয় নি। ভাবছি।’

‘ভাবছ?’ হরেন প্রায় তেড়ে এল। ‘তোমরা কী বলো তো অপু? আমার জানাবে তো? গউরকাকা আমার অ’পন কাকার মতো ছিলেন। ছ্যা ছ্যা, বলতে হয় আগে। রত্নজ্যাঠাকে কবে ধবে নিয়ে আসতুম।’

হরেন যখন সাইকেলের চাকার লিক না-সারিয়ে তক্ষুনি অপরূপাদের বাড়ি চলে এল, অপরূপার সংশয়টুকু চলে গেল তার ওপর থেকে। গৌরীমোহন বেঁচে থাকতে হরেন কয়েকবার নানা কাজে এ বাড়ি এসেছে। বাড়ি ঢুকে চারপাশে তাকিয়ে সে খুব আকশোস করল। ও কী অবস্থা হয়েছে বাড়িটার! হুড়ানি ঠাকরন বারান্দার ধামে পিঠ দিয়ে বসেছিলেন। সে কাছে বসে খুব কথা বলতে থাকল তাঁর সঙ্গে।

রজনী ইদারাতলায় কাপড় কাচছিল। সে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল।

অপরূপা হরেনকে ঠাকুরার বাকশীরাগপুরে যাওয়ার পুরো ঘটনাটা জানাল।

শ্রুনে হরেন রাগ দেখিয়ে বলল, 'সেই গাঁজাখোর রাজকলটা ? সে তো' বসন্তপুরেই আছে । তোমায় বলেছিলুম-না ? তারপর তো আর কিছু জানালে না । কালও দেখেছি ওকে । খামো, হীহুকে দিয়ে ওকে রামপৈদান পৈদাছি ।'

অপরূপা বলল, 'না না । যা হবার হয়েছে হরেননা । তুলটা তো আমাদেই ।'

রজনী ইদারাতলা থেকে বলল, 'মধুরবাবু এসেছিল হরেননা ।'

হরেন লাকিয়ে উঠল । 'এসেছিল ? কখন ?'

অপরূপাও বলল, 'কখন রে ?'

রজনী হাসতে হাসতে বলল, 'একটু আগে এসে বললে কী জানো ? ঠাকুমা মিথ্যে বলেছে । কেলে পালায় নি—আসলে নাকি ঠাকুমাই তাকে কী কথায় গলিয়ন্দ করেছিল । এইসব আবোল-তাবোল ।'

অপরূপা ঠাকুমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'ঠাকুমা ! তুমি ওকে লাঠি পেটা করলে না ? আর রনি, তুই বা ওকে বাড়ি ঢুকতে দিলি কেন ?'

কুড়ানি ঠাকরুন ভুরু কুঁচকে মাটির দিকে তাকিয়ে রইলেন । রজনী বলল, 'দরজা খুলতেই দৌড়ে গিয়ে ঠাকুমার পা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল ।'

'চণ্ড ।' অপরূপা বাঁকা মুখে বলল । 'আমি থাকলে মজা দেখিয়ে দিতুম ।'

হরেন বলল, 'ঠাকুমার চিকিৎসার দায়িত্ব আমার । একুনি রত্নজ্যাঠাকে ধরে আনছি ।'

অপরূপা আশ্তে বলল, 'হরেননা, আমার কাছে ততকিছু টাকাপয়সা নেই যে । বরং হোমিওপ্যাথি ওষুধের ব্যবস্থা করব ।'

হরেন বলল, 'ধুর ধুর । ওসব ছাড়ো তো । আমি একুনি আসছি ।'

সে সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে গেলে অপরূপা বলল, 'ই্যা রে রনি । সেদিন পড়াতে গিয়ে স্নবমাদিকে কী এমন বলেছিস বল তো—রোজ আমার কথা শোনাচ্ছে ।'

রজনী একটু ভয় পেয়ে বলল, 'কী বলব ? কিছুই তো বলিনি ওকে ।'

'বলিস নি তুই ভাল ইংরিজি পড়াতে পারিস ? আমি না'কি ইংরিজিতে বরাবর কাঁচা । বলিস নি এসব ?'

রজনী চোখ বড় করে বলল, 'এ রাম ! তাই বলছে বুঝি ?'

'বলেছিস, তাই বলছে ।' অপরূপা অন্তদিকে ঘুরে ফের বলল, 'তোমার টিউশনির ইচ্ছে থাকে তো কর । আমি তো তোকে বরাবর বলি । চুপচাপ না বসে থেকে টিউশনিই কর । পরসা পাবি । নিজের জামাকাপড়টা হবে । করবি ?'

‘দ্বি।’ বিখ্যাস কর, ঠকে কিছু বলিনি এসব’ রজনী প্রায় কঁদে
কেলল।

‘হ্যাঁ করিস নে তো। কান্নাকাটি আমার খারাপ লাগে।’ অপক্লপা কাপড়
বদলাতে ধরে টুকে আবার বেরিয়ে এল। ডাক্তার আসবে। সে কের বলল,
‘পরদিন গিরেই বুঝেছিলুম একটা কিছু হয়েছে। আমার ভুল ধরতে শুরু করল
হবমাদি। ভুল করছি না—অথচ বলছে, না ওটা কারেন্ট নয়। তারপর থেকে
রোজ শোনাজে, পড়ানো ভাল হচ্ছে না। ক্ল্যাসটিচার বকাবকি করছে।
হোমটাঞ্চে ভুল থাকে নাকি। আসলে আমাকে ছাড়িয়ে দিতে চায়। অথচ
কথাবার্তা শুনে এও বুঝতে পারি, তোকে ওর খুব পছন্দ। শতমুখে তোর প্রশংসা।’

রজনী কাপড়গুলো নিঙড়ে উঠোনের তারে মেলে দিচ্ছিল। কোনো কথা
বলল না।

‘তুই করবি ওখানে টিউশনি? আমি বরং আরেকজায়গায় দেখে নেব।’

রজনী বেশ বোঝে, দ্বি তার মনোভাব জানতে চৌপ কেলল। সে বলল
‘না।’

‘অন্ত কোথাও?’

‘বকবক করতে আমার ভাল লাগে না।’

এবার অপক্লপা হাসল একটু। ‘হ্যাঁ রে, সংসার চলবে কী কবে তাহলে?
তুজনে টিউশনি করলে কতগুলো টাকা মাসে ধরে আসে বল। হবেননা এলে
ওকে বলি, তোকে কোথাও একটা টিউশনি দেখে দিক।’

রজনী গৌ ধরে বলল ‘না। ওসব আমার দ্বারা হবে না।’

‘তা হবে কেন? তোর কত ব্রাইট কিউচার! সায়েবস্ত্রণে বর তোর জ্ঞত
ওয়েট করছে। জেটপ্লেনে তুলে নিস চল যাবে।’ অপক্লপা বিলম্বিল করে
হাসতে লাগল। ‘আর তুই মেমসারয়েব হয়ে যাবি। তাই না?’

রজনী উঠোন থেকে দ্বিদির হাসিটা দেখল। অঙ্গীল বিকৃত এক হাসি। সে
ফৌস করে শ্বাস ফেলে খিড়িকর দরজার দিকে চলে গেল। জীবনে এই প্রথম
তার সংশয় জাগল, দ্বি কি তাকে ঈর্ষা করে?

কিছুক্ষণ পরে হরেন এল রতুডাক্তারকে নিয়ে। রতিকান্তও হরেনের মতো
বাড়ির অবস্থা দেখে একটু পস্তালেন। তারপর কুড়ানি ঠাকরনের সামনে যেতেই
উনি ধামের দিকে ছুয়ে আকান্ত কোণঠাসা জন্তর মতো গোড়িয়ে উঠলেন, ‘নঁ।
নঁ। নঁ।’

অপক্লপা জোর করে ঠাকুরাকে ঘোরাল ডাক্তারবাবুর দিকে। কিন্তু বৃদ্ধার

ছটকটানি বন্ধ হল না। অপরাধী প্রথমে হাসছিল। পরে রেগে গেল। হরেন স্বল্প কুড়ানি ঠাকরুনকে চেপে ধরল খামটীর সঙ্গে। রত্ন ডাক্তার খিক খিক করে হেসে বললেন, ‘গউয়ের মা যে ওষুধ-টষুধ খায় না, তা জানি বলেই না তোকে বললুম হরেন, রুখা চেষ্টা?’

ক্লান্ত অপরাধী বলল, ‘ইঞ্জেকশান দিন ডাক্তারজ্যাঠা। ছটকটান কমবে। আশিখোত! নিজে ভুগবে, আমাদেরও ভুগিয়ে ছাড়বে।’

ইঞ্জেকশান শুনেই কুড়ানি ঠাকরুন গো গো করে আরেকদফা ধস্তাধস্তি করে ফেললেন। রতিকান্ত সত্যি ইঞ্জেকশানের সিরিঞ্জ বের করে বললেন, ‘একটুখানি জল চাই যে গো! হবে নাকি?’

অপরাধী রঙ্গনাকে ডাকতে থাকল। কিন্তু রঙ্গনার সাড়া নেই। হরেন বলল, ‘তুনি করে নিয়ে এস। আমি ধরে থাকছি ঠাকুমাকে।’

অপরাধী রান্নাঘরের দিকে দৌড়ুল। এবার বৃদ্ধা দুর্বোধ্য শব্দে হরেনের দিকে চোখ কটমটিয়ে কী সব বলতে লাগলেন। হরেন বুঝতে পারছিল, যাচ্ছেতাই গাল দিচ্ছেন কুড়ানি ঠাকরুন। কিন্তু সে দাঁত বের করে হাসিমুখে বলল, যত শাপই দিন ঠাকুমা, এ বাবা যমের হাতে পড়েছেন। আর ছাড়াছাড়ি নেই। ‘আপনাকে সিঁধে না করে হরেন যাচ্ছে না।’

রত্ন ডাক্তার বারান্দায় ভাঙা চেয়ারে বসে ঘরদোরের অবস্থা দেখছিলেন। চাপা গলায় হরেনকে বললেন, ‘কালু মুখুয্যের নামে একসময়, বুঝলি হম্মা, বাৎসরিক্তে একঘাটে জল খেত। একেই বলে মহাকাল! তুহ এদের হিসট্রি কিছু জানিস নিশ্চয়। আমাদের ছোটবেলায়...’ হঠাৎ থেমে গিয়ে দেখলেন বৃদ্ধা শান্তভাবে তার দিকে তাকিয়ে আছেন। তাই বললেন, ‘কিছু বলবেন মা? কষ্ট হচ্ছে বুঝি? এক মিনিট সহ্য করুন—সব ঠিক হয়ে যাবে।’

বৃদ্ধা কী একটা বললেন, বুঝতে পারলেন না। ‘কী বলছেন রে হম্মা, বুঝতে পারছি?’ রত্ন ডাক্তার জিগ্যেস করলেন।

হরেন অল্পমান করে বলল, ‘হয়তো বাঁকা-শ্রীরামপুরের কথা জিগ্যেস করছেন। ঙ্গার বাপের বাড়ি নাকি সেখানে। বিয়ের পর আর যান নি। কিন্তু আমার বড় অবাক লাগছে ডাক্তারজ্যাঠা! বাপের দেশ কোথায় তা ভুলে গেছেন, এমন কী করে হয়? অপূর কথাটা মাথায় ঢুকল না।’

রত্ন ডাক্তার রহস্যময় হেসে বললেন, ‘হয়, হয়। হিসট্রিটা তো তুই জানিস নে হম্মা! তাই বলছি। তোকে বলব’খন।’

হরেন হাসল। ‘কিন্তু জায়গাটা কোথায়? শুনেছি বলে মনে হচ্ছে।’

ডাক্তারীবারু বললেন, ‘ওই তো মনিগ্রামের আগের স্টেশন বড়িপুর—সেখান থেকে মাইল তিনেক হবে। আগে স্টেশনের নাম ছিল নাকি কেঁচুয়া। লাইনের পাশেই ছিল হাড়িদের একটা ছোট্ট গাঁ। পরে নাম হয়েছে বড়িপুর। বেশ বড় গ্রাম। বড়িপুরে আমার মেজ মেয়ের খুশুববাড়ি না? এখন অবশিষ্ট ওরা ভাগগণ্ডুবে আছে।’

রুধা কান খাড়া করে শুনছিলেন। এবাব বুক ফেটে কেঁদে উঠলেন। হরেন সান্ত্বনা দিয়ে বলল, ‘কাদবেন না ঠাকুমা। আমি আপনাকে বাকশ্রামপুর নিয়ে যাব।’

এব এব কুড়ানি সাককন শান্ত মেয়েটি হয়ে চোখ বুজে চমজকপান নিলেন। তার সাবাণবার অবশ্য থরথর করে কাঁপছিল। চোখ বুজে ফেলেছিলেন। রতুডাক্তারকে হবেন বিদায় করে এসে বলল, ‘ওবু আনবে কে? এতক্ষণে আমার শাইবল বেঁড়ি হয়ে গেছে। আর তো ফালি দেওয়া যাবে না মশু। মালিকেব কাজে যেখানে যাচ্ছিলুম যেতে হবে।’

অপকপা বলল, ‘বনিকে পাঠাচ্ছ। কৈ প্রেসক্রিপশান দাও।’

হবেন প্রেসক্রিপশানেব সঙ্গ একটা দশটাকার নোট দিয়ে বলল, ‘এতেই হয়ে যাবে। যদি লাগে, বাকি রেখে এস আমার নাম কবে। নাও, হেজিটেট করো না। আমার আপনজন হবে নাও না।’

অপকপ টাকাটা নিতে আব আপত্তি করল না। হবেন যাবার সময় বিকেলে সাকাসেব কথাটা ইশারায় মনে করিয়ে দিয়ে চলে গেল।

অপকপ কিছুক্ষণের জন্য অন্তমনস্ক রইল। কুড়ানি ঠাকরন বারান্দার মেঝেতে একপাশে কসত হয়ে পড়ে আছেন। বঙ্গনা এসে চমকে উঠল। তারপর পাশে বসে মশু-তাকি কবতেই বৃদ্ধা চোখ খুলে কাঁ একটা বললেন। বঙ্গনা অবাক হয়ে গেল। ঠাকুমা কেমন যেন হাসছেন।

বঙ্গনা তাকে ওলে বাসয়ে দিয়ে ভয়ে-ভয়ে বলল, ‘দিদি! তুমি, ঠাকুমা হাসছেন কেন?’

অপকপ বলল, ‘বলেছি না চণ্ড? লোকের সামনে এমন করে যে প্রেসটিজ পয়স্তু পাবে না।’

কুড়ানি সাককন বঙ্গনাব এক কাপে হাত বেগে হাউ মাঁউ করে বলে উঠলেন, ‘কেঁচুয়া! কেঁচুয়া!’

বঙ্গনা আরও চমকে উঠে বলল, ‘দিদি! ঠাকুমা কাঁ বলছে!’

‘ওই যে বতুডাক্তার ওকে বাপের বাড়ির হাদিস দিয়ে গেল এতদিনে।’

অপরূপা বলতে বলতে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকল। কাণড় ছাড়তে ছাড়তে ফের বলল, 'কেঁচুয়া না কেঁচুয়া—কী একটা স্টেশন ছিল। এখন হয়েছে নাকি বহুপুর। মনিগ্রামের আগের স্টেশন। সেখানে নেমে বাকশ্রীরামপুর না ধাকড়া-গোবিন্দপুর—সেখানে যেতে হয়।'।

রঙ্গনা উত্তেজিতভাবে বলল, 'ইস! আমরা কেন রতুবাবুকে জিজ্ঞাস করিনি রে দিদি?'

এতদিনে কুড়ানি ঠাকরুন দীর্ঘ এক আচ্ছন্নতা কাটিয়ে যেন জেগে উঠলেন। তাঁকে চঞ্চলা বালিকা বলে ভ্রম হচ্ছিল। রান্নাঘরে গিয়ে বাঁধতে হাত লাগালেন। সারা দুপুর আপন মনে বিকৃত স্বরে অনর্গল কথা বলতে থাকলেন। কাঠের সিন্দুক, বাকসো-প্যাটরা হাতড়ালেন। বিকেলে পেনী এলে তাকে দিয়ে জল আনিয়ে গাছ-লতাবিতানের গোড়ায় নিজের হাতে জল সেচন করলেন।

রঙ্গনা ওষুধ এনে দিয়েছিল। কিন্তু ওষুধটা খাওয়ানো যায় নি। রাগ করে দুইবোন একসূত্রে বলেছিল, 'চলো—তোমায় বাপের বাড়ি রেখে আসি।' অর্থাৎ তাঁর দায়িত্ব আর তারা বইবে না।

বিকলে অনেক দোনামনার পর অপরূপা সেজেগুজে বেরিয়ে গেল। তখন রঙ্গনা স্নযোগ পেল। মধুরবাবুর বইটা বের করল গুটিয়ে রাখা লেপতোষকেব তলা থেকে। বইটা তখন ভাল কবে খুলেও দেখে নি। ঠাকুমাকে সেধে আধুলি যোগাড় করে দিয়েছিল মধুরবাবুকে। বলে গেছেন, 'আরও একটা আধুলি পাওনা রইল।' এখন বইটা খুলে দেখে 'স্টোরিজ ক্রম দি এ্যারাবিয়ান নাইটস।' লনডন থেকে টমাস নেলসন এ্যাণ্ড সনসের প্রকাশিত। ১৯১২ সালে ছাপানো। টাইটেল পেজে লেখা আছে 'ইনক্লুডিং সিন্দবাদ দি সেলার এ্যাণ্ড দি স্টো ব অফ আলাদিন।' তারপরের পাতা উল্টেই সে চমকে উঠল।

বইয়ের মালিকের নাম লেখা আছে। দিস বুক বিলংস্ টু মাস্টার অ'ও'তোম সাহাল। রঙ্গনা খুব বিব্রত বোধ করছিল। মধুমিতার বাবা। মধুমিতার তাব সবচেয়ে অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল। গত বছর বিয়ে হয়ে জামসেদপুরে আছে। আশাবু ফুলে শিক্ষকতা করতেন। এখন অবসর নিয়েছেন। লম্বা রোগা মানুষ। খুব বদরাগী। রঙ্গনা ভেবে পেল না ওদের বাড়ি থেকে কীভাবে বইটা চুরি কবল মধুরবাবু।

সে ডটপেন বুলিয়ে নামটা ঢেকে দিল ভাল করে। পাতাটা ছিঁড়ত মায়া হল। কিছুক্ষণ আনমনা হয়ে বইল রঙ্গনা। ছোটবেলায় কতসব ভাল-ভাল

বই পায় কৃত্ত লোকে। চুরির বই তো নয়—কিনে দেয় বাবা কিংবা কোনো নেহরুর আত্মীয়। তাকে কেউ কোনোদিন বই কিনে দেয় নি। সে বইটার গন্ধ শুঁকে দুঃখটা আরও তীব্রভাবে অনুভব করতে থাকল। তারপর উঠোনের দিকে তাকাতে চোখে পড়ল, কুড়ানি ঠাকরনের কাগড় খুলে গেছে কোমর থেকে। প্রায় উল্লঙ্গ অবস্থায় পা ঘষটে চলার চেষ্টা করছেন। সে দৌড়ে গিয়ে বলল, ‘এ কী ঠাকুমা! এ রাম!’

জানালার নিচে একটা লোক

বিপাশা বালিশে হেলান দিয়ে বসে আছে উচু বেডে। শতদ্রু পাশে জানলার কাছে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল। ‘কতকটা বসন্তপুরে আমাদের বাড়ির মতো পরিবেশ, তাই না বিয়াস? রেলিংয়ের ওধারে একটা পুকুর পর্যন্ত!’

বিপাশা বলল, ‘ওটা পাবলিক পার্ক। তুই এদিকে আদিস নি কখনও?’

‘না!’ শতদ্রু হাসল। ‘দরকার হয়নি। আমার তো তোব মতো অনুধা হয় নি!’

‘বাজে কথা বলিস নে দাদা! আমার কোনো অনুধা হয় নি।’

শতদ্রু সত্যক হল। বলল, ‘ইস! কত ক্রিসেঙ্ঘিমাম ফুটবল দেখেছিস? তুই লাকি বিয়াস!’

বিপাশা হাতে একটা ছোট্ট রুমাল নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে বলল, ‘কেন চলে যাচ্ছিস?’

‘উ?’ শতদ্রু তাকাল। তারপর বুসতে পেরে বলল, ‘তাই তো কথা ছিল। তোদের দেখতে আসব। কিছুদিন থাকব। উইন্টার সিজন ততদিনে চলে যাবে। বরফ গলবে। তখন ফিরব।’

‘কেক্সারি বুঝি উইন্টার সিজন না?’

শতদ্রু চোখ নাচিয়ে বলল, ‘আরবান! হিলসে মোর ওপর এখন ল্যান্ড স্কেটিং করা যায়। তার ওপর স্কিিং। এখন তো স্কিিং সিজন। জার্মানি! গত শীতে আমরা ক’জন মিলে কলোরাডো গিয়েছিলুম। রকি মাউন্টেন এলাকায় ভেইল নামে একটা জায়গা আছে। চৌদ্দ হাজার ফুট উচুতে সেখানে দ্য সেন্টার। ইউরোপ থেকেও সেখানে লোকেরা স্কি করতে যায়। ছবিতে তো দেখেছিস ব্যাপারটা। দেখিস নি?’

বিপাশা মাথাটা একটু দোলাল। তারপর রুমালটা ভাঁজ করে বলল, 'রজনাকে তোর পছন্দ হয়েছিল—আমি সেই সন্ধ্যাবেলাতেই বুঝতে পেরেছিলাম। তারপর বেড়াতে গিয়ে কতক্ষণ তুই রজনার কথা বলছিলি।'

শতদ্রু চমকে গিয়েছিল। বলল, 'হঠাৎ ওকথা কেন রে?'

'তুই তো রজনার ব্যাপারেই রাগ করে চলে যাচ্ছিলি।'

শতদ্রু হাসতে হাসতে বলল, 'যাঃ! কী যে বলিস!'

'অপুনার কাছে শুনলাম, তুই নাকি একটা ব্যালিষ্ট্রপের সঙ্গে জাপান হয়ে ফিরবি।' বিপাশা বগ্ন মুখে একটু হাসল। 'অপুনা বলছিল, ট্রুপের একটা মেয়েকে তোর পছন্দ হয়েছে। তাকে কি বিয়ে করবি নাকি?'

শতদ্রু বলল, 'অপুটা স্বাউগেল।'

'মেয়েটাকে ওবেলা নিয়ে আসবে অপুনা।'

'মাই গুডনেস!' শতদ্রু চমকানোর ভঙ্গি করল। 'অপু তুই কি আমার গার্ডেন হয়েছিস শেষঅফি?'

বিপাশা রুমালের ভাঁজ এলোমেলো করে দিয়ে বলল, 'জানিস দাদা? পরে ভেবে দেখেছি—রজনাকেই তোর বিয়ে করা ভাল। বাবা-মায়ের কথা শুনিস নে। ওকে বিয়ে করে নিয়ে তুই চলে যা।'

'বিয়াস! প্লীজ ওসব কথা থাক।'

বিপাশাব দুচোখে আগ্রহ ফুটে উঠল। বলল, 'রজনাকে আমি ছোটবেলা থেকে ভীষণ ভালবাসি—মুখে যাই বলিনে কেন। ও এলে আমার খুব ভাল লাগত ববাবর। তুই আসার পর কী হল, ও আসা বন্ধ করল। তুই জানিস নে ও কী অসাধারণ মেরিটোরিয়াস স্টুডেন্ট ছিল। টাকার অভাবে পড়াশুনো হল না।'

'অত বেশ কথা বললে টায়াদ হয়ে পড়বি বিয়াস!'

বিপাশা গ্রাহ্য করল না। বলল, 'অপরূপাকে আমি লিখছি বরং। আজই লিখছি। সেই তো এখন গার্ডেন!'

শতদ্রু অপরূপাকে চিঠি লিখেছিল। কিন্তু কথাটা বলল না। চোখ পাকিয়ে বলল, 'তুই চুপ করবি?'

বিপাশা বলল, 'দাদা। আর বোধ হয় আমার চুপ করে থাকা উচিত নয় রে। বসন্তপুরে থেকেই তোকে একটা চিঠি লেখার কথা ভেবেছিলুম। রাগ করে লিখিনি—তুই বসন্তপুরে যাবি না শুনে। মামাবাবুদের ওখানে এসে তোকে কিছু বলার স্বেচ্ছা পাই নি। আয়, এখানে বস।'

শতক্ষণ ওর বেড়ে বসে মিটিমিটি হেসে বলল, ‘বসলুম। বস্।’

‘দাদা, তুই রক্তনাকে বিয়ে কর্।’

শতক্ষণ কোঁতকের ভংগিতে বলল, ‘বেশ, করা যাবে। কিন্তু ওর গার্জেন যদি সাজি না হয়? ওরা তো গ্রামের বামুন। কায়েতের ছেলের সঙ্গে মেয়েব বিয়ে দেবে কেন?’

‘বাজে কথা। অপরাধ বর্তে যাবে—আমি জানি।’

শতক্ষণ মাথা নেড়ে বলল, ‘তুই কিছুই জানিস নে। বসন্তপুর কলকাতা নয়।’

বিপাশা একটু চুপ করে থাকার পর বলল, ‘আমার শরীরটার যে ছাই কী হয়েছে। খালি মাথা বোবে। আগের মতো গলে আমিই সব কবতুম।’ বলে সে হঠাৎ চঞ্চল হয়ে উঠল। শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে ফের বলে উঠল, ‘রক্তনাকে তুই বিয়ে করলে অনির আত্মা শাস্তি পেত। অনি রক্তনাকে অপরাধব চেয়ে বেশি ভালবাসত। রক্তনার জন্তু কত গর্ব ছিল অনির। আমি সব জানি। রক্তনা যেবার স্কুলফাইনালে স্ট্যাণ্ড করল...’

শতক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিল। এবার কথা কেড়ে বলল, ‘কা বললি? অনির আত্মা না কী যেন?’

‘হ্যাঁ।’

‘সে তো বেঁচে আছে বলেছিলি। এ্যাবকগুর হয়ে লুকিয়ে বেড়াচ্ছে বলেছিলি।’

বিপাশা আস্তে বলল, ‘নেই।’

‘সে কী।’

বিপাশা নিম্পলক দৃষ্টি তাকিয়ে কাছে জানলার দিকে। বলল, ‘আমিও কি জানতুম? আমাদের বাগানে দাড়ুব হাওয়াকলটা ছিল মনে আছে তো?’

‘হ্যাঁ। ঈদারার মাথায় ছিল মনে পড়ছে।’

পত বছর অক্টোবরে পুজোর পর অনেক রাতে ঘুম ভেঙে গেল কারেন্ট ছিল না। ভীষণ ঞ্জমোট। জানলার ধারে বসলুম। তখন দেখি হাওয়াকলের ওখানে টর্চ জ্বলল। জোৎস্না ছিল। অস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছিল কারা কী করছে ওখানে। ভাবলুম মাকে ডাকি। কিন্তু আবার টর্চ জ্বালতেই বাবাকে দেখতে পেলুম। একটু পরে ওরা চলে এল। ভাবলুম চোর-ডাকাত এসেছিল হয়তো—খুঁজে বেড়াচ্ছে সেবারকার মতো। তারপর সকালে উঠে দেখি, ঈদারাটা বোজানো হচ্ছে।...বিপাশা ক্লান্তভাবে চুপ করল।

শতক্ষণ বলল, ‘তার সঙ্গে অনির কী সম্পর্ক?’

‘বিকেলে রোজকার মতো বেড়াতে বেরিয়েছি।’ বিপাশা কিসকিস করে বলতে থাকল। ‘তখন বাগানে প্রচণ্ড ঘাস। বর্মী বাগের বোপটার পাশে ঘাসের ওপর খানিকটা রক্ত দেখতে পেলুম, জানিস?’

শতদ্রু চমকে উঠল। ‘বলিস কী!’

‘জমাটবুঁধা রক্ত। কালো হয়ে গেছে। কিন্তু ওগুলো রক্ত।’

শতদ্রু ঘাস ছেড়ে বলল, ‘তুই কাকেও জিগ্যাস করলি নে?’

‘ভুলোদাকে জিগ্যাস করেছিলুম। বলল, মুসলমান মজুর এসেছিল ইদারা বোজাতে। তাবাই মুর্গি কেটে রান্নাবান্না করেছে।’ বিপাশা আবার চুপ করে রইল কিছুক্ষণ।

শতদ্রু উষ্ণ হয়ে লক্ষ্য করল বিপাশার চোখের কোনায় জল জমেছে। সে বলল, ‘কিন্তু তুই কি ভাবলি রক্তনার দাদাকে মার্ডার করে পুঁতে দিয়েছে?’

মাথাটা দোলাল বিপাশা।

‘অসম্ভব। ও তোর মিথ্যা সন্দেহ।’

‘বাবা সব পারেন! বাবার কাছে তো তুই কম থেকেছিস। আমি জানি বাবাকে।’ বিপাশা ধরা গলায় বলল। ‘অনি বাবাকে শাসিয়েছিল। একবার নাকি কোথাও বাবার জিপ লক্ষ্য করে বোম মেরেছিল।’

‘হতে পারে। কিন্তু তাতে কিছু প্রমাণ হয় না।’

বিপাশা কাঁপা-কাঁপা হাতে ক্যামালটা তুলে চোখের কোনা মুছে শান্তভাবে বলল, ‘কিছুদিন আগে—তুই তখন এখানে আছিস, আমি বাগানে বেড়াছি, ভুলোদা গেল। তখন হঠাৎ কথাটা মনে এল। আসলে আমার সন্দেহটা ছিলই। ভুলোদাকে চেপে ধরতেই সব বলে দিল।’

‘কী বলল?’

‘অনি সন্ধ্যাবেলা পাঁচিল ডিঙিয়ে ঢুকেছিল। বাহাদুরকে নাকি ড্যাগার মারতে গিয়েছিল। তখন বাহাদুর কুকরি ছুঁড়ে মারে। অনি মারা যায়। তখন...’

বিপাশা বিছানার ওপর পড়ে গেল হঠাৎ। হাত দুটো মুঠো করে দুপাশে ছুড়তে থাকল সে। শরীরটা বঁকে গেল। পা দুটোও ছুড়তে থাকল। শতদ্রু ওকে চেপে ধরে চিৎকার করে উঠল, ‘সিস্টার! সিস্টার!’ দুজন নার্স এল ঘরে। শতদ্রু-কে বাইরে যেতে অত্বোধ করল তারা।

একটু পরে ডাক্তার গোবিন্দ চৌধুরী শতদ্রুর পাশ কাটিয়ে চুকলেন। শতদ্রু দরজার পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে রইল। ভেতরে বিপাশার চিৎকার শোনা যাচ্ছিল, ‘ছেড়ে দাও! আমি অনির কাছে যাব—আমায় ছেড়ে দাও!’

আন্তে আন্তে বিপাশার কণ্ঠস্বর মিইয়ে যেতে থাকল। ডঃ চৌধুরী বেরিয়ে এসে চুপচাপ শতজ্বর একটা হাত ধরে নিয়ে তাঁর চেয়ারে নিয়ে গেলেন। মুখোমুখি বসে একটু হাসলেন। ‘এ ভেরি পিকিউলিয়ার কেস মিঃ সিনহা! তবে আমার কাছে নতুন কিছু নয়। মেলানকলিয়া এ্যাট দা কান্ট’ স্টেজ, দেন ইট ডেভালাপস ইনটু হিষ্টিরিয়া। লাস্ট স্টেজে আসে এপিলেপ্টিক্যাল হিষ্টিরিয়া। তবে সে-স্টেজে পৌঁছতে দেব না। আই ক্যান এ্যাসিওর ইউ জাট। আমার এই মেটাল ক্লিনিকের বয়স—শু, এ্যাবাউট থাট। তো কী কথার পর হঠাৎ ফ্র্যাশ করল পেসেন্ট বলুন তো? আমার জানা দরকার।’

শতজ্বর সব বলল।

ডঃ চৌধুরী হাসতে লাগলেন। ‘ব্যাপাবটা সত্য হতেও পারে, আবার নিজেই কল্পিত হতেও পারে। ফ্রি এ্যাসোসিয়েশন অফ আইডিয়াজ পদ্ধতি প্রয়োগ করে অবশ্য আমিও একই ক্যাটি জানতে পেরেছি। কাল রাতে তো গিয়ে দেখি, জানলার ধারে দাঁড়িয়ে কথা বলছে কার সঙ্গে। মাইও জাট, জানলার নিচে কিছু কেউ নেই। এটাই এ কেসের বৈশিষ্ট্য। আপনাকে একটা বই দেখাচ্ছি, বুঝতে পারবেন হ্যালুসেনিসান কী ধরনে ডেভালাপ করে এসব কেসে।’ সেলফ থেকে একটা প্রকাণ্ড বই এগিয়ে দিলেন শতজ্বর দিকে। একটুকরো কাগজে চিহ্ন দেওয়া পাতাটা খুলে বললেন, ‘পড়ে দেখুন এই প্যাসেজটা।’

শতজ্বর বইটার টাইটেলপেজ দেখে নিল আগে। মার্লো পন্টির ‘দা ফেনোমেনলজ অফ পারসেপশান।’ সেই পাতায় এক মানসিক রোগীর কাহিনী রয়েছে। সে জানলার কাছে গিয়েই চিৎকার করে ওঠে, ‘জানলার নিচে একটা লোক! জানলার নিচে লোক! জানলার নিচে একটা লোক!’ সে সেই অদৃশ্য লোকটার পোশাকেরও চমৎকার বর্ণনা দেয়।

শতজ্বর বইটা ফেরত দিয়ে বলল, ‘দা সেইমঃকেস মনে হচ্ছে।’

‘আপনার মামা বলছিলেন আপনি নাকি চলে যাচ্ছেন নেভ্রুট উইকে?’

শতজ্বর মাথা দোলাল।

‘গুনলুম এখনও তো লম্বা ছুটি। নাই বা গেলেন এ অবস্থায়!’ ডঃ চৌধুরী একটু গম্ভীর হলেন। ‘কিটের সময় পেসেন্টকে আপনার কথা বলতে শুনেছি। সুস্থ অবস্থাতেও আপনার সম্পর্কে কত কথা বলে। আমার ধারণা হয়েছে, বাবা-মায়ের চেয়ে আপনাকে কাছের লোক মনে করেন মিস সিনহা।’

শতজ্বর তাকিয়ে রইল।

‘এর একটা কারণ আই জাস্ট গেস। মিস সিনহার চারপাশে ঝাঁপা থাকেন, তাঁদের ওপর তাঁর ভীষণ অবিশ্বাস এবং কিছুটা সন্দেহও। তাঁকে নিয়ে যেন সবাই চক্রান্ত করছে। এক্ষেত্রে যেহেতু আপনি ধানিকটা আউটসাইডার অথচ নিজের দাদা—পেসেন্ট আপনাকে বিশ্বাস করে। তাই আপনার থাকা খুব দরকার।’

শতদ্রু আস্তে বলল, ‘ঠিক আছে। ক্যামেল করাচ্ছি জার্নি।’

ডঃ চৌধুরী খুশি হয়ে বললেন, ‘আপনার বাবা এবং মামা ওদেরও বলেছি একটা কথা। মিস সিনহা মোটামুটি স্বস্থ হয়ে উঠলে তাঁকে যেন আর ওই বাড়িতে না নিয়ে যান। আপনার বাবা বললেন, তাঁরও সেই ইচ্ছে। ওখানকার বাড়ি-টাড়ি সম্পত্তি সব বেচে কলকাতায় চলে আসবেন ঠিক করেছেন।’

শতদ্রু বলল, ‘হ্যাঁ। মামা বলছিলেন।’

একজন নার্স এসে বলল, ‘পেসেন্টের জ্ঞান হয়েছে। দাদাকে ডাকছেন।’

ডঃ চৌধুরী বললেন, ‘হ্যাঁ—যান মিঃ সিনহা। স্বচ্ছন্দে। একটু এ্যালার্ট থাকবেন—যেন ওসব কথা বেশি না বলেন পেসেন্ট। কেমন?’

শতদ্রু ষাড় নেড়ে বিপাশার ঘরে এল। দেখল, বিপাশা ত্রিমুখভাবে বালিশে হেলান দিয়ে বসে আছে। শতদ্রু পাশে বসে হাসতে হাসতে বলল, ‘কী রে। খুব ভেঙ্কি লাগাচ্ছিস দেখছি।’

বিপাশা দুর্বলভাবে হাসল। ‘ভেঙ্কি কিসের লাগালুম বল তো?’

শতদ্রু সতর্ক হয়ে বলল, ‘নয়? আমায় কী মস্তুর পড়ালি যে এখন ইচ্ছে করছে জার্নি ক্যামেল করি। অর্থাৎ যাচ্ছি না।’

বিপাশা খুশি হল। সেই রুমালটা নিয়ে আগের মতো খেলতে থাকল। একটু পরে কেমন চোখে তাকিয়ে বলল, ‘অনি এসেছিল।’

শতদ্রু উদ্বিগ্ন মুখে বলল, ‘কী বলচিস আবার? অল্প কথা বল তো শুনি।’

‘অনি এসেছিল জানলাব ওধাবে। ডাকলুম, ভেতরে ঢুকল না।’ বিপাশা যেন অনেক দূর থেকে বলতে থাকল। ‘তোকে ডাকলুম সেজন্য। ওকে ডেকে নিয়ে আয় না দাদা।’

শতদ্রু বিব্রতভাবে জানলার ধারে গিয়ে খোঁজাব ভংগি করে বলল, ‘কেউ নেই। তোর ভুল বিয়াস।’

‘আমি ভুল করি নি রে।’ অনি আমার সঙ্গে কথা বলল ওখান দাঁড়িয়ে। আমিও বললুম।’

‘স্বপ্ন দেখেছিস।’

বিপাশা সেই রুমাল ওর গায়ে ছুড়ে মেরে চৌচিয়ে উঠল, 'তুই মিথ্যাক। তুই চলে যা আমার সামনে থেকে। চলে যা বলছি।'

ডঃ চৌধুরী ক্ষত ঘরে ঢুকে বললেন, 'মিঃ সিনহা, আপনি এবার আহুন বরং।'

শতদ্রু চূপচাপ বেরিয়ে গেল। ক্রিডোরে গিয়ে দেখল বাবা, মা আর মামাবাবু আসছেন। ..

মথুরামোহনের ভিটে

সারাজীবন এক নিঃশব্দ মাহুদ ছিলেন কুড়ানি ঠাকরুন। যেদিন রত্নডাক্তার তাঁকে ইঞ্জেকশান দিয়ে যান এবং সন্ধ্যায় রক্তনা তাঁকে বিবস্ত্র অবস্থায় মাচানের তলায় ঢুকতে দেখে, সেদিনই মৃত্যু তার পিছু নিয়েছিল। তাড়া খেয়ে আক্রান্ত জন্তর মতো তিনি নিজের আশ্রয়ে লুকোতে চাইছিলেন। বড় যত্নে ও মায়াম-গড়া সেই উদ্ভিদ-জগত। রক্তনা যখন তাঁকে টেনে বের করে, তখন তিনি মৃত। নিঃশব্দ মাহুদের নিঃশব্দ মৃত্যু হয়তো স্বাভাবিক ছিল। রক্তনার বুঝতে সময় লেগেছিল। অপরাধার সে-বেলা টিউশনি ফাঁকি দিয়ে হরেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ দেখে কিরতে একটু রাত হয়েছিল। অপরাধাও বুঝতে পারে নি। হরেনই নাড়ি দেখে বলেছিল, 'হয়ে গেছে।' দুই বোন বোবা হয়ে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হু হু করে কেঁদে উঠেছিল।

করালীর মন্দিরের পাশে নদীর ধারে শ্মশান। হরেন বাড়ির ছেলের মতো সবকিছু করল-টরল। মুখাগ্নি পর্যন্ত। শেষ রাতে শ্মশান থেকে কিরে হরেন আর তার বন্ধুরা দুটি ভীত শোকাক্ত মেয়েকে সাহস সান্ত্বনা দিতে কার্পণ্য করে নি। রক্তনা সারারাত খুব কেঁদেছিল। তার খালি এক কথা, 'রত্নডাক্তারই মেরে ফেলল সাক্ষমাকে।' শুনলে রক্তিকান্ত ক্ষেপে যেতেন। কেউ কানে তোলেনি তাঁর।

তারপর থেকে হরেন এ বাড়ির গার্জেন হয়ে গেছে। যখন-তখন আসে। অপরাধার ঘরে ঢোকে। গল্প-সল্প করে। অপরাধার অস্বস্তি একটাই—অনি যদি হঠাৎ কিরে আসে, কী হবে? আর রক্তনা মনে-মনে কোঁসে হরেনের ব্যাপারে। আড়ালে দিদির মুখ ফুটে কিছু বললে ধমক খায়। অপরাধা বলে, 'তুই বড্ড অক্লান্ত আর স্বার্থপর রনি। ও এলে তোমার কী? কোনো ব্যাপার তুই অনেস্টলি নিতে জানিস নে। সবভাতেই খারাপ ভাবিস।'

ছোট আকারে একটা শ্রদ্ধা-শাস্তি হয়েনের উত্তোকেই হল। আত্মীয়রা খবর পেয়ে কেউ আসেন নি। বহুদূরে থাকেন। কুড়ানি ঠাকরনের গেটে গৌজা থলেয় গোটা বস্ত্রিণ টাকা আর খুচরো কিছু পাওয়া গিয়েছিল। অপক্লপার টিউশনির ব্যবস কিছু আর হয়েনের তাগিদে কিছু জুটেছিল। এর পর বসন্তপুরের লোকে জেনেছে হরেন অপক্লপাকে বিয়ে করবে। তার গার্জেন বলতে এক জ্যাঠা। দ'ব'-মা নেই ইহজগতে। জ্যাঠা দীনবন্ধু চাটুয্যের মাথায় বাজ পড়েছে। নিজের অক্ষম বুড়োমাতুষ। গণ্ডাকতক পুষ্টি ঘরে। বুঝিয়ে বলেছেন, 'ওরে নিবোধ! ওই গ্রাজুয়েট মেয়ে তোর সংসার করবে ভেবেছিস? ও তো তোকে হডকি দিচ্ছে। তার ওপর গউয়ের রামপাঠা—সেই অনি হারামজাদা এসে পড়ল কী হবে? ছুরি-চাকু খাবার ইচ্ছে না থাকলে মানে-মানে সরে আয় বাবা। ব'ল্লে ছেলে, কথাটা শোন।'

তবেনের মাথায় প্রেম চড়ে আছে। তাছাড়া দি এ পাশ বউ পাওয়া তার পক্ষে ভাগ্যের কথা। নিজেরও কি কোনোদিন আশা করেছিল, অপক্লপার মতো মেয়ে দৈন্য তার কাছে এসে জুটবে? সাধুবাবুর টোপ ঝুলিয়ে একেবারে অপক্লপার খবর দোরে পৌঁছেছিল। কুড়ানি ঠাকরনও ভাগ্যিস মারা গেলেন। হরেন এবাব ঘরে ঢকে পড়েছে অপক্লপার। এখন সারা বসন্তপুর তার লেজে দড়ি বেঁধে টানলে লেজ ছিঁড়ে যাক, হরেনকে ফেরত আনা যাবে না।...

রঙ্গনা একদিন বলল, 'দিদি, ঠাকুমার বাবার পক্ষের কেউ না কেউ বাকী-শ্রীরামপুরে আছে। তাদের তো মরার খবর দেওয়া হল না।'

অপক্লপা বলল, 'চিঠি লেখা যেত—কিন্তু কারুর নাম তো জানা নেই।'

'চল না বে, আমরা যাই একদিন। দেখে আসি ঠাকুমার দেশ।'

অপক্লপা একটু ভেবে বলল, 'ইচ্ছে করে দেখে আসতে, জানিস রনি? বিশেষ করে ঠাকুমার হিস্ট্রিটা জানার পর ভীষণ ইচ্ছে করছে আমারও। কিন্তু সে তো ও'নছি স্টেশনে থেকে অনেকটা হাঁটতে হবে। বাস টাস চলে না ওদিকের রাস্তায়। একেবারে হাটছাড়া দেশ ঠাকুমাদের।'

রঙ্গনা ভেবে বলল, 'এই দিদি! হরেনদাকে সঙ্গে নিয়ে গেলে হয়!'

অপক্লপা মুখে আপত্তি করল। 'ধূর। ওকে আবার কেন?'

'কতি নী রে দিদি? হরেনদা সঙ্গে গেলে তো ভালই। বললেই রাজি হবে দেখবি।'

'তুই বুঝতে পারছিস না রনি, আমাদের ক্যামিলির একটা স্ক্যাণ্ডাল আছে না এব্যাপারে? হরেন জেনে যাবে না?'

‘জানলেই বা।’ রক্তনা একটু হাসল।

‘জানলেই বা মানে?’

রক্তনা চুপ করে গেল। তার ধারণা, অপরাধের সঙ্গে হরেন্দ্রের বিয়ে হবে। দুজনের মধ্যে প্রেম-ট্রেন যে চলছে, সে অনুমান করেছে অনেকদিন আগেই। ব্যাপারটা তার মনঃপুত হয় নি। কিন্তু অপরাধ যদি তা চায়, তার বারণ করার সাধ্য নেই এবং ইচ্ছাও নেই।

সে-রাতে অপরাধ টিউশনি থেকে ফিরে বলল, ‘রনি। শোন। হরেন্দ্রের সঙ্গে কথা হল। ও কাল বিকেলে ফ্রি থাকবে। তিনটের ট্রেনে যাওয়া যায় বলল। ওর অফিসে নাকি এখন ভীষণ কাজের চাপ। তাই বিকেল ছাড়া হবে না।’

রক্তনা খুশি হল শুনে। পরদিন সকাল থেকে আর তার সময় কাটছিল না। বইয়ের পাতায় মন বসছিল না। দুটো নাগাদ হরেন্দ্র সেজেগুজে কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে হাজির হলে রক্তনা একমুখ হেসে বলল, ‘আমবা এখন রেডি।’

হরেন্দ্র বলল, ‘কী মুশকিল। তুমিসুদ্ধ যাবে নাকি?’

রক্তনা হেসে-ফিরে গেল। অপরাধ বলল, ‘চলুক না। ওর ইচ্ছেই তো বেশি।’

হরেন্দ্র উদ্বেগ মুখে জোরে মাথা দুলিয়ে বলল, ‘পাগল, না মাথাধারাপ। বাড়িতে থাকবে কে? বাড়িতে কেউ না থাকলে ফিরে এসে আঁব কিছু পাবে ভেবে?’ বোজ চুরি হচ্ছে বাড়ি-বাড়ি।’

অপরাধ হাসতে হাসতে বলল, ‘আমাদের নেবেটা কী?’

‘তুমি জানো না অপু।’ হরেন্দ্র গম্ভীর হয়ে বলল। ‘কথায় বলে চোয়ের কপনিটুকুও লম্বা। মাঠের ধারে বাড়ি। খাট-কপাট-চৌকাঠ সব খুবলে তুলে নিয়ে যাবে। ওই তো মড়িকাঁব বাড়িতে সেবার কী হয়েছিল মনে নেই?’

ওপাশে অগাছার জঙ্গলের মধ্যে একটা ভাঙা একতলা ঘর দাঁড়িয়ে আছে। মড়িকাবু থাকতেন ধানবাদে। বাড়িতে তাল দাওয়া ছিল। ক্রমে ক্রমে বাড়ির চৌকাঠ-জাল-কপাট সব কারা নিয়ে গিয়েছিল। এখন ভুতের আড্ডা হয়ে পড়ে আছে। ছাদের কড়িকাঠগুলো-ঝুলে পড়েছে। নেহাত চাপাপড়ার ভয়ে সেগুলো খলতে পারেনি চোরেরা।

অপরাধ বলল, ‘হ্যাঁ—তাই তো।’

হরেন্দ্র ঘড়ি দেখে বলল, ‘নাও। আর দেরি কারো না। রনি থাক। ছুতোব বউকে ডেকে নেবে রাতে—আর চিন্তা কিসের?’

অপরূপা বলল, ‘আজই কিরে আসা যাবে না?’

‘সেটা আনসার্টেন। বুঝলে না? তোমাদের আত্মীয় স্বজন আছেন সেখানে। রাতে যদি না আসতে দেন? তাছাড়া পায়ে-হাঁটা রাস্তা। অনেককিছু ভাববার আছে। দিনকাল তো আর সেরকম নেই।’

অপরূপা রঙ্গনার দিকে তাকিয়ে বলল, ‘ঠিক আছে। আগে দেখে তো আসি। চেনা হয়ে গেলে তোকে নিয়ে যাব’খন। তুই পেনীর মাকে ডেকে নিস। সাবধান, একা থাকবিনে।’

রঙ্গনা চুপ করে থাকল। ওরা দুজনে বেরিয়ে গেলে সে দরজা আটক দিল। তারপর খিড়কির ওদিকে গিয়ে পেনীকে ডাকাডাকি করতে থাকল।

সেই আত্মিকালের কয়লাথেকে ইঞ্জিন এই লুপ লাইনে হাঁপকাশব কগীর মতো কস্টেসিস্টে ডাউনট্রেনটাকে টানছিল। যে স্টেশনে থামছে, থেমেই থাকছে। অপরূপা ক্রমশ আড়ষ্ট হয়ে উঠছিল। বত্তিপুর্বে নামল যখন, তখন সূর্য বিস্তীর্ণ মাঠের শেষে লাল একটা গোলা হয়ে গেছে। প্রায় জনহীন স্টেশন একটা চায়ের দোকান আছে প্ল্যাটফর্মের ওপর। চা খেতে খেতে লালচে আলোটা মরে গেল। অপরূপা শুকনো হেসে বলল, ‘কোনদিকে যেতে হবে আমাদের?’

হরেন আঙুল তুলে পশ্চিমের মাঠ দেখিয়ে বলল, ‘ওই যে—ওদিকে।’

‘কিন্তু রাস্তা কই?’

হরেন সিগারেট জ্বলে বলল, ‘সেই তো বলছিলুম। এ তল্লাটের অবস্থা এরকমই। ওই যে দেখছ দীঘির পাড়ে কয়েকখানা কুঁড়ে ঘর—ওই বোধ করি কেঁচুয়া। দাঁড়াও, জিগ্যেস করে নিই। আমি কি কখনও এসেছি এদিকে?’

চা-ওলাকে জিগ্যেস করলে বলল, ‘বাঁকাছিরামপুর যাবেন? কেঁচুয়া পর্যন্ত আলপথ। ওখানে কাঁচা রাস্তা পাবেন। আর ওই যে দেখছেন কালো মতন গাঁ—হ্যাঁ, ওইটা। নজর করে দেখুন, যেন ধনুক বাঁকা হয়ে বেঁকে আছে না? তাই বাঁকা ছিরামপুর।’

হরেন বলল, ‘কতক্ষণ লাগতে পারে দাঁহু?’

চা-ওলা হাসল। ‘তা আপনাদের দেখে মনে হচ্ছে টাউনের লোক। পায়ে হাঁটা অব্যাস আছে? আমাদের দুয়েক ঘটা লাগে বৈকি! একটা কাঁদর আছে। এখন অবিজ্ঞি জল নেই। একটু কালা হতে পারে।’

অপরূপা কুণ্ঠিতভাবে বলল, ‘তাহলে থাক। আমরা পরের ট্রেনে কিন্ন যাই।’

হরেন বলল, ‘শুনেই শুড়কে গেলে? আমি সঙ্গে আছি কেন? আমার ওপর বিশ্বাস রাখোদিকি অপু।’

সে হনহন করে হাঁটতে থাকল। অনিচ্ছাসত্ত্বেও অপরাধী বজের মতো তাকে
অনুসরণ করল। উচুতে রেললাইন। নিচের মাঠে সবুজ চৈতালি। আলপথে
কিছুদূর হেঁটেই ক্লান্ত হয়ে পড়ছিল অপরাধী। হরেন হাসতে হাসতে পিছিয়ে
এসে তাকে সজ দিচ্ছিল। কৌতুহ্য দীর্ঘ পাশ দিয়ে একটা সংকীর্ণ রাস্তা
পাওয়া গেল। গরুর গাড়ির চাকার দীর্ঘ আঁকা-বাঁকা দাগ গভীর হয়ে আছে।
প্রচণ্ড ধুলো জমেছে। অপরাধীর স্টাণ্ডেল আর শাড়ির নিচেটা ধুলোয় নোংরা
হয়ে গেল কিছুক্ষণের মধ্যে।

ফাঁকে মাঠে শেষ বেলার ঠাণ্ডা হাওয়ায় অপরাধী খুব বিপদে পড়ে গেল।
হরেন গুনগুন করে গান গাইছিল। নির্জন রাস্তায় সে এতকণে অপরাধীর কাঁধ
বেড় দিয়ে বলল, ‘চলো অপু। তোমায় কাঁধে বসিয়ে নিয়ে যাই।’

অপরাধী নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, ‘কী অসভ্যতা করছ বলো তো।
এমন জানলে আমি কখনো আসতুম না।’

‘কী আশ্চর্য।’ হরেন খ্যা খ্যা করে হাসতে লাগল। একটুতেই এই। মাইরি,
এজুকেটেড মেয়েদের সাইকলজি আমি বুঝতে পারিনে। হুইমিজিক্যাল।’

অপরাধী চুপচাপ হাঁটতে থাকল।

হরেন পাশে হাঁটতে হাঁটতে বলল, ‘এই অপু। ভাল কথা—তোমায় বলতেই
হুলে গেছি। আজই লোকাল কাগজে দেখলুম, ডিসট্রিক্টে প্রাইমারি টিচার
নেওয়া হবে। বুঝলে?’

অপরাধী আস্তে বলল, ‘কোন কাগজে বেরিয়েছে?’

‘মুর্শিদাবাদ সমাচারে। আমি বেখেছি পাতাটা। আমাদের অফিসে
আসে তো।’

‘প্রাইমারি টিচার নেবে দেখলে?’

‘হ্যাঁ হরেন উৎসাহ দিয়ে বলল। ‘সাধুদা ডিসট্রিক্ট স্কুল বোর্ডের মেম্বর
জানো তো?’

‘তাই বুঝি?’

‘এ তোমার হওয়াই ধরো। চেয়েছে স্কলফাইনাল। তুমি তো বি এ।
এমনিতেই হয়ে যাবে।’

হাতের রেখা দেখা যাচ্ছিল না এবার। দুধারে ঢেউখেলানো শস্তশস্য মাঠ।
দূরে ইলেকট্রিক লাইনের উচু সব ত্রৈম এক দিগন্ত থেকে অন্তর্দিগন্তে চলে গেছে।
আকাশে ভেসে যাচ্ছে বুনো হাঁসের কঁক। অপরাধীর মনটা চাপা আবেগে চঞ্চল
হয়ে গেল। একটু পরে হরেন তার একটা হাত নিলে সে বাধা দিল না আর।

হরেন গুনগুন করে বেহুঁরো গলায় প্রেমের গান গাইতে থাকল। একবার তার হাত অপক্লপার কাঁধে উঠলে অপক্লপা আন্তে নামিয়ে দিল। তখন হরেন অভিমান দেখিয়ে বলল, 'তুমি আমার বড় পর ভাবো অপু! ঠিক আছে। আমার যা কর্তব্য করে যাই। আমি তো প্রতিদানের আশায় কিছু করি না। বরাবর এই স্বভাব আমার!'

অপক্লপা বলল, 'উঃ! আর কতদূর বলো তো?'

হরেন ব্যাগ থেকে টর্চ বের বলল, 'কী অথেষ্ট দেশ রে বাবা! রাস্তায় একটা লোকপর্যন্ত পেলুম না যে জিগ্যেস করি। ঠিক আছে, চলো তো।'

অন্ধকার হয়ে এসেছে। টর্চের আলোয় কাঁদরটা দেখে ভড়কে গেল অপক্লপা। পাকৈ ভর্তি একটা অপ্রশস্ত নালার নেমে গেছে রাস্তাটি। অসংখ্য চাকার দাগে বিচিতির একেবারে। সে অফুটস্বরে বলল, 'এ কী!'

হরেন হাসল। 'ভাবছ কেন? কাঁধে চাপো। তোমার পায়ে কাদা লাগলে আমার কষ্ট হবে। এস!'

হরেন সত্যি হেঁট হয়ে কাঁধ পাতছে দেখে অপক্লপার হাসি পেল। 'ঘাঃ! কাঁধে চাপব কী! তুমি পা বাড়াঁও। আমি তোমায় ফলো কবব।'

হরেন হঠাৎ দুহাতে ওকে শূণ্ণে তুলে নামিয়ে দিল। 'পাবব না ভেগেছ তুলতে? তুমি কী এমন ভারি!'

অপক্লপা খিলখিল করে হাসছিল। একটা অভিজ্ঞতা হল বটে ঠাকুরার দেশে এসে। সে কল্পনাও করে নি ঠাকুরা এমন দেশের মেয়ে। ইতিমধ্যে হরেন জুতো খুলে ব্যাগে ঢুকিয়েছে। সে বলল, 'তাহলে রেডি।' ওয়ান টু থ্রি। সে ফের অপক্লপাকে শূণ্ণে তুলল।

কিন্তু এবার তার শরীরের আলতো আক্রমণ টের পাচ্ছিল অপক্লপা। খালটা পেরিয়ে শুকনো জায়গায় নামিয়ে দিয়েই হরেন তাকে বুকে চেপে ধরল এবং চুমু খাবার চেষ্টা করল। অপক্লপা কয়েক মুহূর্তের জগ্ন অবশ হয়ে পড়ছিল। আরো একদিন এমন করেছিল হরেন। তখন জোর বাধা দিয়েছিল আজ কতকটা অসহায় হয়ে আত্মসমর্পণ করল যেন। একসময় নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে সে আন্তে বলল, 'চলো!'

অন্ধকারে একটু দূরে আলো দেখা যাচ্ছিল। আলোটার চাছাকাছি গিয়ে বোকা গেল একটা গ্রাম। রাস্তার ধারে একটা লোক লন্ঠন হাতে জৈবকনে এসেছিল। সে এদের দেখে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল।

হরেন জিগ্যেস করল, 'দাদু, এটা কি বাকাশ্রীরামপুর?'

‘তাই বটে বাবুমশাই। আপনারা কোথেকে আসছেন?’

‘বসন্তপুর।’ হরেন বলল। ‘আচ্ছা দাদু, ঘোষেদের বাড়ি কোন দিকে পড়বে?’

লোকটা হাসল। ‘আজ্ঞে ঘোষ বলতে এক আমাদের এই গাড়াটা— গয়লাগাড়া। আর ঘোষ বলতে ধরুন বাবুগাড়ায় কান্নেত্তরা। কার বাড়ি যাবেন বলুন?’

অপরূপা বলল, ‘মথুরা মোহন’ ঘোষের কথা জিজ্ঞাস্য করে না। চিনবে নিশ্চয়।’

লোকটা শুনে পেয়ে বলল, ‘সে-নামে তো কেউ নেই মশাই।’

অপরূপা বলল, ‘জমিদারের কাছারিতে সেকেন্তাদার ছিলেন।’

‘হ্যাঁ—কাছারি ছিল শুনেছি। সে তো এখন ইন্সুল হয়েছে।’ লোকটা বলল। ‘বরঞ্চ আপনারা সতুবাবুর বাড়ি যান। বাবুগাড়ায় ঢুকেই দেখবেন পঞ্চম বাড়ি—দোতারা। ওনারে কেউ হবেন তাহলে।’

হরেন বলল, ‘তুমি একটু সঙ্গে চলো না দাদু।’

অন্ধকার ও ঠাণ্ডায় গ্রামটা কিম মেরে আছে। রাত্তায় ধুলো। প্রকাণ্ড বটতলায় মাচান রয়েছে। লোকজন নেই সেখানে। একটা দোতারা বাড়ির বাইরের ঘরে আলো জ্বলছে। লোকটা বলল, ‘এই হল সতুবাবুর বাড়ি। চলে যান—আমার সঙ্গে ওনারে বনিবনা নেই।’

সে চলে গেলে টর্চের আলোয় হরেন একটা টিউবেল দেখতে পেল। বলল, ‘অপু! হেল কবো দিকি একটু। আগে পা ছুটো ধুয়ে নিই।’

অপরূপার ধারণা ছিল ন’ এই সন্ধ্যায় ঠাকুমার গ্রাম এমন নিঃশব্দ হয়ে যায়। হরেন পা ধুয়ে জুতো পরে বারান্দায় উঠল। অপরূপা নিচে দাঁড়িয়ে রইল।

ঘরের ভেতরে একদিকে একটা টোলের ওপর লণ্ঠন জ্বলছে। দুটি ছেলেমেয়ে মন দিয়ে অঙ্ক কষছে। একজন হরেনের বয়সী যুবক রাশভাবি ভাগ্যতে বসে অঙ্ক কষছে। ওবা সবাই যেন এই অন্ধকার নিঃশব্দ গ্রামের অংশ হয়ে বয়েছে। হরেন একটু কাশলে তিনজনে তাকাল। যুবকটি বলল, ‘কে?’

হরেন বলল, ‘বসন্তপুর থেকে আসছি। সতুবাবুকে চাই।’

যুবকটির ইশারায় ছেলেটি ভেতরে চলে গেল। একটু পরে বেঁটে নাভুস-মুদুস গড়নের টাক-মাথা প্রোঁচ ভজ্রলোক, পরনে লুঙি, গায়ে চাদর, ভেতর থেকে এসে হরেনকে দেখে অবাক হলেন। হরেন নমস্কার করে বলল, ‘আমার নাম হরেন চ্যাটার্জি। বসন্তপুর থেকে আসছি। আপনার সঙ্গে একটু জল্পনা কথা আছে।’

সতুবাবু আড়ষ্টভাবে বললেন, ‘বসন্তপুর থেকে, না থানা থেকে ?’

হরেন তরুণি বুঝল, তাকে শাদা পোশাকের পুলিশ বা আই বির লোক ভেবেছে। সে হাসতে হাসতে বলল, ‘না, না ! আমার সঙ্গে আরও একজন আছেন। অগু এস।’

অপকুপার ভয় করছিল বলে বারান্দায় এসেছে ততক্ষণে। অপকুপাকে দেখে সতুবাবুর চোখ বড় হয়ে গেল। তারপর সন্দ্বিগ্নভাবে বললেন, ‘আপনারা বহন। বাবা মদন ওদের নিয়ে ভেতরে বসা গে।’

গ্রাইভেট টিউটর ছাত্র-ছাত্রীসহ ভেতরে চলে গেল। হরেন ও অপকুপা বসল। সতুবাবু অল্প একটা চেয়ারে বসে বললেন, ‘আমি তো কিছু বুঝতে পারছি নে ! কী ব্যাপার বলুন।’

অপকুপা লক্ষ্য করছিল সতুবাবুর কথাবার্তায় ঠাকুর কথার টান অবিকল। হবেন বলার আগে সে বলল, ‘আচ্ছা, এখানে অনেক আগে মথুরামোহন ঘোষ বলে এক ভদ্রলোক ছিলেন। জমিদারি সেরেস্তায় কাজ করতেন নাকি। তিনি নিশ্চয় বেঁচে নেই। তাঁর কোনো রিলেটিভ কি আছেন কেউ ?’

ভাল করে শুনে সতুবাবু বললেন, ‘মথুরামোহন ? মথুরামোহন...এক মিনিট। বাবা বলতে পারবেন। আপনারা বহন—জিগ্যেস করে এসে বলছি।’

সতুবাবু চলে গেলে হরেন চাপা গলায় মূচকি হেসে বলল, ‘যাক্ গে। রাত কাটানোর ভাল জায়গা পাওয়া গেছে। ওই রাস্তায় রাস্তির বেলা কেরা অসম্ভব। কা বলো ?’

অপকুপা হাসল। ‘দিলে তো থাকতে এরা ?’

‘আলবাৎ দেবে। তোমায় অস্তুত দেবে।’

‘হঁ। যার-তার বাড়ি থাকতে বয়ে গেছে আমার। কিরে বাব।’

‘পারো তো যেও।’ হরেন আরামে বসে সিগারেট বের করল। ধরিয়ে নিয়ে বলল, ‘পয়সাওলা পার্টি মনে হচ্ছে। এ শীতের রাতের আরাম ছেড়ে কোথাও নড়াছিনে বাবা।’ সে হুশ হুশ করে ধোঁয়া ছাড়তে থাকল। কের বলল, ‘এক কাপ চা দরকার। নিশ্চয় এসে যাক্। কী বলো ?’

অপকুপা ঘরের ভেতরটা দেখাচ্ছিল। দেয়াল ধবধবে শাদা। কয়েকটা ক্যালেণ্ডার আর বাঁধানো ফোটাে ঝুলছে। ওপাশে একটা তক্তাপোষের ওপর সত্তরজি বিছানা রয়েছে। তাকের থাকে-থাকে সাজানো পাঠ্যপুস্তক। কুলুঙ্গিতে একটা মাকালীর বাঁধানো ছবি—কিছু শুকনো ফুল। তক্তাপোষের মাথার দিকে দেয়ালে একটা ক্যারামবোর্ড দাঁড় করানো আছে।

সতুবাবু কিরে এসে বললেন, ‘একবার ভেতরে আস্থন। বাবা বৃদ্ধ মাহন। আর হাঁটাচলা করতে পারেন না।’

দরজার ওদিকে মেয়েদের ভিড় জমেছিল। সরে গেল ছত্রভঙ্গ হয়ে। অপক্লপা টের শেল, খুব সাড়া পড়ে গেছে বাড়িতে। ভেতরে ঢুকে দেখল, মধ্যখানে উঠোন—চারদিকে ঘর। নিচের একটা ঘরে ঢুকে সতুবাবু ডাকলেন, ‘আস্থন।’

ঘরে প্রকাণ্ড সেকলে খাটে এক বৃদ্ধ বসে আছেন। গায়ে আলোয়ান। একটা লোক দুটো চেয়ার রেখে গেল তুকুনি। ইশারায় বসতে বললেন বৃদ্ধ। সতুবাবু দাঁড়িয়ে রইলেন। বললেন, ‘বাবা, এঁবাই বসন্তপুর থেকে এসেছেন!’

বৃদ্ধ কৌকলা মুখে বললেন, ‘কী নাম বললে? মথুরামোহন? ও! আমাদের সেই মথুরা? আমরা বলতুম মোথুকাকা। বড় সাদাসিধে লোক ছিল। ওই তো লেবুভলায় ভিটে।’

অপক্লপা বলল, ‘ওনার কেউ আছেন গ্রামে—কোনো আত্মীয়?’

বৃদ্ধ কানে কম শোনেন। সতুবাবু প্রশ্নটা বুঝিয়ে দিলে বললেন, ‘কে থাকবে? কেউ নেই। ওই তো ভিটে পড়ে আছে। মোথুকাবুর শেষ বয়সে মাথার গুণ্ডগোল হয়েছিল। অ সতু, সেই যে রে—মনে পড়ে না? তোর সব ছেলেপুলেরা বড় পেছনে লাগতিস।’

সতুবাবু বললেন, ‘তাই বলা। মোথা ক্যাপা বলতুম—একটু একটু মনে পড়ছে যেন। ইয়া—সবসময় চেঁচিয়ে বেড়াতেন—ডাকাত! ডাকাত!’

এক বৃদ্ধা ঘরে ঢুকে অপক্লপাকে দেখতে দেখতে বললেন, ‘মোথো পাগলার কথা এতকাল বাদে কেন গো? সে কি আজকেব কথা? তখন সতু এতটুকুন ছেলে। পাঁচ-ছ বছর বয়স হবে।’

সতুবাবু হাসেব করে বললেন, ‘তাহলে ধরো বছর পঞ্চাশ আগের কথা। আমি এখন ফিকটি সিন্ধ।’

বৃদ্ধা বললেন, ‘ওইরকমই হবে। আমার তখন সবে বিয়ে হয়েছে।’

অপক্লপা জিগ্যেস করল, ‘ইনি কে?’

সতুবাবু বললেন, ‘আমার দ্বিদি।’

সতুবাবু বাবা একটা ভংগি করে বললেন, ‘খালি ডাকাত ডাকাত বলে চোঁচাত। কী যেন একটা হয়েছিল, আর মনে নেই। বেশ বসে আছে চুপচাপ। হঠাৎ...ওই ডাকাত! ডাকাত!’

বৃদ্ধা বললেন, ‘তা জানিনে বাপু। অত মনে নেই। মোথোপাগলার নাকি একটা মেয়ে ছিল।’

কথা কেড়ে অপরাধী বলল, ‘তার একটা পা খোঁড়া ছিল জয় থেকে।’

বৃদ্ধা বললেন, ‘তা জানিনে বাপু। অত মনে নেই। তা এককাল পরে কেন সেকথা? তোমরাই বা তার খোঁজে এলে কেন—এটুকুন বুঝিয়ে বলোদিকিনি?’

হরেন বলল, ‘এই ভদ্রমহিলার ঠাকুমা ছিলেন মথুরাবাবুর মেয়ে। মানে—মো-মেয়ের কথা হচ্ছে।’

সতুবাবু তার বাবাকে কথাটা বুঝিয়ে দিলে বৃদ্ধ ক্যাল-ক্যাল করে তাকিয়ে রইলেন অপরাধীর দিকে। অপরাধী বলল, ‘আমরা কিছু জানতুম না। ঠাকুমা সেদিন মারা গেলেন। তাই ভাবলুম...’

বৃদ্ধা বললেন, ‘কিছু বুঝলুম না বাপু।’

হরেন একটু হেসে বলল, ‘বোঝার কী আছে পিসিমা? ঠাকুমার বাবার ভিটে দেখতে সাধ হয় কি না বলুন নাতনিদের? তাই এসেছে আর কী।’

বৃদ্ধা বললেন, ‘তা এককাল বাদে?’

অপরাধী বলল, ‘আমরা তত কিছু জানতুম না। কিছুদিন আগে জেনেছি সব কথা। ঠাকুমা বরাবর অবশ্য বাঁকাস্থীরামপুরের নাম করতেন, আসতেও চাইতেন। খোঁড়া মানুষ—আমার অস্থবিশ্বে ছিল। উনি মারা গেলে ভাবলুম, ভিটেটুকু অন্তত দেখে আসি।’

অপরাধীর গলা ধরে এসেছিল। সে ব্যাগ থেকে রুমাল বের কবে চোখ মুছতে থাকল। তখন হরেন বলল, ‘মজাটা লক্ষ্য করেছেন তো?’ নাতনি কিছু কুলীন মুখ্যো—ঠাকুমা আপনাদের কায়তে।’ সে খ্যা খ্যা করে হাসতে লাগল।

সতুবাবু বললেন, ‘মথুরাবাবুর মেয়ের বুঝি মুখ্যো ঘরে বিয়ে হয়েছিল? সে-আমলে অসদর্প! বলেন কী!’

অপরাধী সতর্কভাবে বলল, ‘এখন একবার ওনাদের ভিটেটা দেখা যায়?’

হরেন বলল, ‘রাতে কী দেখবে? সকাল হোক। এখন তো বাঁকাস্থীরামপুর স্টেশনে ফেরা যাবে না। কিরতে চাইলেই বা এ ভদ্রলোকেরা দেবেন কেন?’

সতুবাবু ব্যস্তভাবে বললেন, ‘না না—এই শীতের রাতে ছাড়ব কেন? একটা সম্পর্ক ধরে যখন এসেই পড়েছেন।’

সতুবাবু বেরিয়ে গেলেন। বৃদ্ধা বললেন, ‘হ্যাঁ গো বাছা, তোমার নামটাই বা কী, আর এই ছেলেরাই বা কী নাম?’ নাম শুনে নিয়ে ফের বললেন, ‘তা ও মেয়ে, এটি তোমার সম্পর্কে কে বটে? আপন কেউ না হলেই বা আসবে কেন সঙ্গে?’

হরেন ঝটপট বলল, ‘অপু আমার মামাতো বোন।’ অপরাধার অস্বাভাবিক
কেটে গেল।

বন্ধু ভাবিয়ে ছিলেন তেমনভাবে। বললেন, ‘সন্ন। ও সন্ন!’

বন্ধু কাছে গিয়ে বললেন, ‘কিছু বলছ বাবা?’

হরেন অপরাধার দিকে চোখ নাচাল। অর্থাৎ এই বুড়ির বাবা ওই বুড়ো—
দেখছ তো মজাটা।

বন্ধু বললেন, ‘মোথুকার একটা খোঁড়া মেয়ে ছিল। তুই তাকে দেখিস নি,
সন্ন। তখন তুই কোথা, সতুই বা কোথা? আমার তখন বিয়েই হয় নি।’

বন্ধু তাঁর কানের কাছে মুখ রেখে বললেন, ‘এই মেয়েটা তার নাভনি।’

বন্ধু কোকলা দাঁতে হাসলেন। ‘মোথুকার মেয়ের নাভনি? ভাল,
ভাল। কোথা বিয়ে দিয়েছিল মনে নেই।’

অপরাধা সাবধানে বলল, ‘বসন্তপুরে।’

বন্ধু তাঁর বাবার কানে কথাটা পাচার করে বললেন, ‘বামুনের ঘরে বে
হয়েছিল—বুঝলে?’

বন্ধু কের হেসে বললেন, ‘দামরা শুনি নি। হয়তো শুনে থাকবে, মনে নেই।’

অপরাধা বুঝতে পারছিল, মথুরামোহন খোঁড়া মেয়েকে নিয়ে করালীর খানে
গিয়েছিলেন এবং সেখান থেকে তার ঠাকুর্দা কালু মুখ্যে সেই মেয়েকে লুট করে
আনেন—এসব ঘটনা এঁরা জানেন না। কেন জানেন না? মথুরামোহন নিশ্চয়
কাকেও কিছু বলেন নি। হয়তো সে-আমলের সমাজটা ছিল খুব কড়া। তাঁকে
মেয়ে লুট হওয়ার জগৎ জাতিচ্যুত বলে একঘরে করা হত। কিংবা আরও
সামাজিক শাস্তির আশংকা ছিল। তাই চেপে গিয়েছিলেন। তারপর একসময়
পাগল হয়ে যান।

কিন্তু ঠাকুর্দারই বা কী আকৌল। পরে যোগাযোগ করলেও তো পারতেন
খবুর বেচারার সঙ্গে। অপরাধার মা বলতেন, ‘খবুর মশাইকে শেষ বয়সে দেখেছি।
নেশাভাঙ করতেন বড্ড। কোথায় ডাকাতি করতে গিয়ে পেটে গুলি লাগে।
ওতেই মারা যান। লোকটা এমনিতে বেশ নরম মনের মানুষ ছিলেন। অথচ
ওই দুর্দান্ত স্বভাব।’

তবু ঠাকুর্দাকে অপরাধার ভালই লেগেছে শেষ পর্যন্ত। একটা খোঁড়া মেয়েকে
লুট করে আহুক আর যাই করুক, তাকে বউ করে সারাজীবন আশ্রয় তো
দিয়েছিলেন। তখনকার দিনে গ্রামের কুলীন বামুন। ওই বিকলাঙ্গ বউ নিয়েই
সন্তুষ্ট ছিলেন—আর বিয়ের নাম করেন নি। এটা নিশ্চয় ঠাকুর্দার মহৎ মনের

পরিচয়। শুধু অবাধ লাগে ভাবতে, ওই মেয়েটার মধ্যে কী খুঁজে পেয়েছিলেন কালীনীথ মুখুয্যের মতো সাংঘাতিক মানুষ? ঠাকুমা ঘোঁষনে দেখতে নিশ্চয় সুন্দরী ছিলেন—আর গায়ের রঙটাও কৰ্গা ছিল। কিন্তু তাও হয়তো নয়—মমতা। ঠাকুমার মতো মমতাময়ী মেয়ে কটাই বা দেখা যায়? বাড়িটাকে কীভাবে চহাতে আগলে রেখেছিলেন, সাক্ষিয়ে তুলেছিলেন ভালবাসায়, ভাবা যায় না।

ঠাকুমার মৃত্যুর পর রজনীর সঙ্গে অপরাধা এসব নিয়ে কত আলোচনা করেছে। রজনীর দৃষ্টিটা একটু অস্তরকম। হুস বলেছে, ‘একটা সাংঘাতিক লোকের পাল্লায় পড়লে একটা খোঁড়া মেয়ে কী করতে পারে বল্ দিদি? ঠাকুমা বলছিল তখন মোটে তের-চৌদ্দ বয়স। ঠাকুদার তখন তার ডবল বয়স নিশ্চয়। ঠাকুমার জন্তু আমার কষ্ট হয় রে!’

অপরাধা তা মানে না। দুজনে পরস্পরের মধ্যে একটা কিছু দেখেছিল—কোনো আশ্রয়, কোনো শান্তি—কিংবা বড় কিছু। এতো আর রাবণের সীতাহরণ নয়।

‘হ্যাঁ গো মেয়ে!’ বৃদ্ধা ডাকছিলেন। ‘কী নাম ছিল তোমার ঠাকুমার?’

অপরাধা বলল, ‘কনকলতা।’

বৃদ্ধা তাঁর বাবার কানে নামটা পাচার করলেন। তখন বৃদ্ধ সার দিয়ে বললেন, ‘হ্যাঁ—হ্যাঁ। কনক। বাড়িতে শশা লাগাত। ফুলের গাছ লাগাত। মনে পড়ছে বটে। একটা ককি হাতে লেবুগাছের ছায়ায় বসে থাকত। আমরা ছেলেপুলেরা ওকে জ্বালাতন করতুম। হাঁচিতে পারত না কি না? তাই শশার মাচানের তলায় চুপিচুপি ঢুকে যেতুম। টের গেলে সে কী চোঁচানি।’

বুড়ো বয়স পর্যন্ত তাহলে তাই করে গেলেন ঠাকুমা। অপরাধা ভাবল। আসলে বাইরের পৃথিবীতে যার পা বাড়ানোর উদ্যম নেই, বাড়ির ভেতর সে একটা পৃথিবী গড়ে নিয়েছিল। গাছপালা ফুলফলের পৃথিবী। সেখানে সে সম্রাজ্ঞীর মতো ককি হাতে শাসন করত।

বৃদ্ধ হঠাৎ নড়ে উঠলেন।... ‘সন্ন। সন্ন রে।’

‘বলো বাবা!’

‘অই মনে পড়েছে। মোধুকাঁকা তার মেয়েকে কোথায় কোন সাধুর আশ্রমে রেখে এসেছিল।’

‘তাহলে তার নাভনি এল কোথেকে?’ বলে বৃদ্ধা ঠোঁটে বীকা হেসে অপরাধার দিকে তাকালেন।

বৃদ্ধ বললেন, 'খোঁড়া মেয়ের বে হবে না। তাতে সবসময় পিছুটান—বাড়িতে আর ভো কেউ ছিল না। অমিদারি সেরেস্তার কন্ম পণ্ড হয়। তাই মোথুকা কা মেয়েকে সাধুর আশ্রমে রেখে এলেন।'

বৃদ্ধা কড়া মুখে প্রায় চোঁচিয়ে উঠলেন 'না, না।'

'কেন রে সর?'

এই মেয়েটা বলছে তার নাতনি। বসন্তপুরে মুখ্যে ঘরে বে চলেছিল বলছে।'

'মোথুকাকার মেয়ের?'

'হ্যাঁ। তাই বলছে।'

বৃদ্ধ হঠাৎ খুব রেগে গেলেন। বললেন, 'মিথ্যে কথা।'

অপরূপা বিব্রত হয়ে বলল, 'বিশ্বাস করুন। আমি কনকলতার নাতনি।'

হরেন ব্যাপার দেখে ছা ছা করে হেসে বলল, 'বুড়ো মানুষ। স্মৃতিভ্রংশ হতেই পারে।'

বৃদ্ধ সন্দেহ মুখে বললেন, 'দেখ বাপু, ভাবগতিক আমার ভাল ঠেকছে না। আজকাল দিনকাল ধারাপ। কে কোন ক্ষেত্রে যেতেব বেলা গেরস্থর বাড়ি আসে। একে তো সতু নানা কোঁজদারি মামলায় ফেসে রয়েছে। তোমরা বাইরের ঘরে গিয়ে বসো দিকিনি। পবে কথা হচ্ছে।'

হরেন ও অপরূপা মুখ তাকাতাকি করল। অপরূপা লজ্জায় অপমানে লাল হয়ে উঠেছে। দুজনে বেরিয়ে বারান্দা হয়ে সেই বাইরের ঘরে গেল। ঘরটা ভেতর থেকে বন্ধ এবং অন্ধকার। পেছন-পেছন হেরিকেন তাতে সতুবাবু এলেন। এখন তাঁর মুখেও সন্দেহের ছায়া দেখা যাচ্ছে।

সতুবাবু আমতা হেসে বললেন, 'কিছু মনে করবেন না। আপনারা টাউনের লোক—আমাদের পাড়াগায়ে আজকাল বড় অশান্তি। এই তো ক'বছর আগে নকশালপহীনের নিয়ে খুব হাঙ্গামা হয়ে গেল। গতবছরও একটু গণ্ডগোল বাধিয়েছিল ওরা। এই যেমন আপনাবা এলেন, তেমনিভাবে ওরা আসত। মেয়েছেলেও থাকত সঙ্গে। তারপর হঠাৎ...'

কথা কেড়ে হরেন হাসতে হাসতে বলল, 'তারপর হঠাৎ পিত্তল দেয় কর গুডুম! দাদা, আমার নাম হরেন্দ্র কুমার মুখার্জি। বসন্তপুরে সাধুবাবুর ট্রান্সপোর্টে সারভিস করি। বেশি কী আর বলব আপনাকে!'

অপরূপা গম্ভীরভাবে বলল, 'যাক ওসব কথা। আপনি দয়া করে একবার মথুরাবাবুর ভিটেটা দেখিয়ে দেবেন? আমরা দেখেই চলে যাব।'

সতুবাবু বললেন, ‘তা কি হয় ? ভদ্রলোকের বাড়ি । একটা ব্যবস্থা নিশ্চয় হবে । তবে এখনই যদি দেখতে চান, আপত্তি নেই ।’ বলে তিনি ভেতরের দরজায় গিয়ে চৌকিয়ে ডাকলেন, ‘বদনা ! ও বদন !’

একটা শুকো বলিষ্ঠ আকৃতির লোক এল । গায়ে তুলোর কঙ্কল জড়ানো । সতুবাবু বললেন, ‘এনাদের মোথো পাগলার ভিটেটা দেখিয়ে আন ।’

হেরিকেন নিয়ে বদন বলল, ‘আহ্নন ।’ অপক্লপা ও হরেন তাকে অল্পসরণ করল । অপক্লপার মন রাগে গরগর করছিল । মথুরাবাবুকে মোথোপাগলা বলছে এখনও । এদেব কোনো ভদ্রতাবোধও নেই । এদের বাড়ি বাত কাটানো কি সম্ভব ?

লোকটা সারবন্দী মাটির বাড়ির পাশ দিয়ে পুকুরপাড়, আগাছার বন ভেঙে একটা মোটাযুটি ফাঁকা জায়গায় গিয়ে বলল, ‘এই হল গে মোথোপাগলার ভিটে ।’

আলোটা খুব কম । চাবপাশে যেটুকু ছড়িয়েছে, তাতে শুধু যুটিঙ-কাঁকের ভরা শক্ত খানিকটা নগ্ন মাটি চোখে পড়ছে । তার বাইরে অন্ধকার । অপক্লপা লোকটার হাত থেকে হেরিকেন নিয়ে বলল, ‘ঘর কোথায় ছিল ?’

বদন নির্বিকার মুখে বলল, ‘তা কেমন কবে জানব বলুন ? ওই উঁচু জায়গাটার হবে ।’

অপক্লপা ঘুরে ঘুরে দেখে কিছু বুঝতে পারল না । নিমবন চারপাশে । কয়েকটা ঝাঁড়ো লেবুগাছও রয়েছে । এগুলো কি কনকলতার হাতের গাছ ? এখনও বেঁচে আছে ? কে জানে । বদন সাবধান করে দিল, ‘কাঁটায় আটকে যাবেন গো । বড় কাঁটা ।’

পটাপট কয়েকটা লেবু ছিঁড়ল অপক্লপা । আর সেইসময় তার মনে হল কনকলতা চৌকিয়ে উঠেছে, ‘অই ! অই !’ চমক ভাঙলে টের পেল, বদন নিষেধ করছে । বাতবিরেতে গাছের ফল ছিঁড়তে নেই । লেবুগুলো হাত নিয়ে সে খুঁকে একটু ধুলো-মাটি তুলে নিয়ে মাথায় ঠেকাল । মনে মনে বলল, ‘ঠাকুমা ! বড় দেরি হয়ে গেল । তোমায় কিরিয়ে আনতে পারিনি—ক্ষমা করো ।’

হরেন মৃদু স্বরে বলল, ‘ছি অপু ! কান্দে না । চলে এস । দিনসবরে আবার আসা যাবে । বদনাকে নিয়ে আসব । আর আইনত এ জায়গা তো তোমাদেরই ।’ সে টর্চ জেলে চারদিকটা দেখতে থাকল ।

পেছন থেকে বদন হাসতে হাসতে বলল, ‘জায়গা জায়গা হয়েছেই আছে—তাই থাকবে । এখন খাস সম্পত্তি । যদি উদ্ধার কতে পারেন, তবু কাজ হবে না । কেউ কিনবে না ।’

হরেন বলল, 'কেন ?'

'দু-তিনপুরুষ ধরে শুনে আসছি, এ ভিটের দোষ আছে। দোষ-লাগা ভিটে ন হলে কি এ্যাক্টিন এমন পড়ে থাকত ভাবছেন ? কেউ-না-কেউ দখল করে রাখত।'

'দোষ মানে ?'

'তা জানি নে মশাই।' বদন হাসল। 'শুনেছি কোনপুরুষে কী দোষ ঘটেছিল।'

এইসময় টর্চের আলো ফেলে সতুবাবু এসে গেলেন। 'দেখলেন ?'

অপরূপা বলল, 'হ্যাঁ।'

সতুবাবু টর্চের আলো চারদিকে ফেলে ভালভাবে দেখিয়ে দিতে দিতে বললেন, 'মোটো কাঠা পাচেক জায়গা। এখানে গাঁয়ের শেষ। আর ওদিকটায় কিছুটা গেলে পুরনো আমলের জমিদারি কাছারি পাবেন। এখন প্রাইমারি স্কুল হয়েছে।'

অপরূপা চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে দেখে হরেন তাড়া দিল, 'আর কী ! চলে এস অপু।'

সতুবাবুর বাড়ির সামনে গিয়ে অপরূপা বলল, 'অসংখ্য ধন্বাদ সতুবাবু ! আমরা তাহলে চলি।'

হরেন অবাক হল। সতুবাবু কাঁচুমাঁচু হেসে বললেন, 'না—না। সে কী কথা ! আমরা কি আপনাদের সত্যি সত্যি সন্দেহ করেছি ? ও একটা কথার কথা। তাছাড়া এই জীতের রাতে পাক্কা তিন মাইল রাস্তা হাঁটা কি সম্ভব ? কেরার ট্রেনও সেই রাত তিনটের আগে নয়।'

অপরূপা গৌ ধরে বলল, 'না—আমাদের রাতেই কিরতে হবে। এস হরেনদা।'

সতুবাবু বললেন, 'আহা ! সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে। অকল্যাণ করবেন না মা ! আমরা সামান্য গৃহস্থ। ছেলেপুলে নিয়ে ঘর করি।'

হরেন বলল, 'ঠিক আছে। বলছেন যখন অত করে।'

অপরূপা শক্ত মুখে বলল, 'না। তুমি এস।'

'মারা পড়বে যে ! তোমার মাথা ধারাপ ?' হরেন হাসতে লাগল।

বাইরের ঘরের বারান্দায় সতুবাবুর সেই দিদি এবং আরও কয়েকটি মেয়ে ভিড় করে দাঁড়িয়ে গেল। সতুবাবুর দিদি বললেন, 'মেয়ের দেখছি বেজায় দেমাক ! অত যদি ইয়ে তো সিনসবরে এলেই পাচ্ছ বাপু ! এ রক্তের বেলা ভুল্ললোকের বাড়ি বন্ধাট বাধাতে কেন আসা ?'

সতুবাবু ধমক দিলেন, ‘তুমি ভেতরে বাও তো দিদি। সব-জাভে তোমার ধাকা চাই। মাহুঘের মানমর্দাণা বোঝ না।’

বুকা দুপদাপ পা কেলে ভিড় ঠেলে চলে গেলেন ভেতরে। বারান্দায় ভিড় থেকে অপকুপার বয়সী এক যুবতী, সিঁথিতে সিঁছুর এবং হাতে শাঁখা নোয়ার সঙ্গে সোনার কাঁকন—এগিয়ে এসে বলল, ‘আপনি আহ্নন তো ভাই। শিসিমার কথায় কান দেবেন না। ওইরকম মাহুঘ বরাবর। আহ্নন আপনি

সতুবাবু বললেন, ‘আমার বড় মেয়ে। কাটোয়ার খা ৩৪
সঙ্গে ভেতরে যান।’

অনিচ্ছাসঙ্গেও অপকুপা বারান্দায় উঠল। সতুবাবুর মেয়ে তার হাত ধরে ভেতরে নিয়ে গেল। হরেন সতুবাবুর সঙ্গে ঘরে ঢুকে বলল, ‘লাল। এক কাপ কড়া করে চা পেলে জমত। বড় শীত আপনাদের গ্রামে।’

সতুবাবু হেলে বললেন, ‘সব ব্যাবস্থা হয়েছে। ভাববেন না।’

‘না।’...হরেন হাসল।

অপকুপার নতুন স্বপ্ন

রজনীর ভাল ঘুম হয়নি রাতে। পেনি আর তার মাকে শুতে দিয়েছিল মেঝেয়, রজনী ছিল অপকুপার খাটে। ওদের ঘরে ঢুকিয়েছে এবং শুতে দিয়েছে জানলে অপকুপা কী বলবে, সেই ভয়টাও কম ছিল না রজনীর। ভোববেলা ওদের জাগিয়ে দিয়েছিল। তারপর বেলাঅন্ধি অপকুপার প্রতীক্ষায় ব’ববাব দরজা খুলে দাঁড়িয়ে থেকেছে। দেখতে দেখতে দুপুর হয়ে গেছে। সে তখনও ঘর-বার করছে। অবশেষে একসময় রিকশা থেকে অপকুপা নেমেই দৌড়ে এসে বোনকে জড়িয়ে ধরল। রজনী দমআটকানো গলায় বলল, ‘দেখে এলি দিদি? দেখতে পেলি ঠাকুমার ভিটে? কে কে সব আছে রে? তাদের সঙ্গে দেখা হল? কী বলল?’

উঠানে গিয়ে রজনীকে ছেড়ে অপকুপা বলল, ‘সব বলছি। কী সুন্দর গ্রামটা রে রনি। ঠাকুমার বাবার ভিটেয় কত লেবু গাছ! নিশ্চয় ঠাকুমা ছোটবেলায় পুঁতেছিল গাছগুলো। এই নে, লেবু এনেছি সেই গাছের।’

সে ব্যাগ খুলে কয়েকটা লেবু বের করল। রজনী সেগুলো দুহাতে নিয়ে

বুকে গালে ঘসে আদর করতে থাকল। 'ইস! কী স্থল্লর গন্ধ রে দিদি! ঠাকুমার গায়ের গন্ধ। অবিকল! আমার কবে নিষে বাবি রে?'

অপরূপা বলল, 'শিগগির যাব। তুইও দেখে আসবি। আর জানিস? অনেক স্থধবর আছে। বলছি দাঁড়া।'

সে ইন্দারাতলায় গেল। জল তুলে হাত মুখ পা রগড়ে ধুল। তারপর বারান্দায় গিয়ে ভোয়ালেতে মুছতে মুছতে বলল, 'ওখানে এক ভদ্রলোকের বাড়িতে রাতে ছিলুম। খুব আদর বহু করল। প্রথমে একটু মিসআগারস্কাটিং হয়েছিল, জানিস? আমাদের নকশাল ভেবেছিল!'

রজনী খিল খিল করে হেসে উঠল। 'বলিস কী! তারপর?'

অপরূপা ঘরে ঢুকে কাপড় ছাড়তে গেল। রজনীও ঢুকল পেছনে-পেছনে। কাপড় বদলাতে-বদলাতে মোটামুটি একটা বিবরণ দিল অপরূপা। রজনী বলল, 'প্র্যাডভেঞ্চার বন্! খুশি রে! তাই না?'

অপরূপা পরনের শাড়িটা পায়ে ঠেলে মেঝের একপাশে রেখে বলল, 'সতুবাবুদের বাড়িতে আমার খুব খাতির হয়ে গেছে। সেই বুড়ি ভদ্রমহিলা পর্যন্ত আসার সময় কত আদর করল জানিস? বামুনের মেয়ে খলে প্রণামের ঘট্টা বদি দেখতিস। তারপর আসল ব্যাপারটা বলি শোন। ওদের ওখানে একটা প্রাইমারি স্কুল হয়েছে। সেটা ওরা ক্লাস এইট অফি আপাতত করতে চেষ্টা করছে। মেয়েদের এডুকেশনের অসুবিধা হচ্ছে তো—প্রাইমারি পাস করে ছেলেরা দূরের গ্রামে কোনো হাইস্কুলে যায়। হোস্টেল পায় সেখানে। মেয়েদের বেলায় তো প্রব্লেম।

'তোকে মাস্টারি দেবে বলল বুঝি?'

'বলল মানে? সাখিল বন্।' অপরূপা উজ্জ্বল মুখে বলল। 'সতুবাবু বলল, আমরা আপনাদের কুটুম্ব হয়ে গেলুম গ্রামসম্পর্কে। সতুবাবুই স্কুলের সেক্রেটারি। বলল, কোনো অসুবিধে হবে না। বাড়িতে আলাদা ঘর দেব। আমার ছেলে-মেয়েদের পড়াবেন। স্কুলে কাইভ এবছরই চালু হয়েছে। ছাত্র হয়েছে। এখনই বাড়তি টিচিং স্টাফ দরকার। আমি জয়েন করলেই হল।'

'মাইনে দেবে তো? নাকি বিনি মাইনেতে?'

'হ্যাঁ! তা কেন? গ্রামের লোকে আপাতত চাঁদা তুলে স্কুলকাণ্ড করেছে। স্যাংশান হলে তখন বোর্ড থেকে গ্রান্ট দেবে। বাস! আর ভাবনা কী?' বলে অপরূপা কপালে ও বুকে হাত ঠেকাল। আঙঠে বলল, 'সবই যেন ঠাকুমার ইচ্ছে হচ্ছে রে রনি!'

রক্তনা উদ্বিগ্ন হয়ে বলল, ‘তুই ওখানে থাকলে আমি এখানে একা কীভাবে থাকব?’

অপরূপা বোনকে জড়িয়ে ধরে বলল, ‘তোরা কথা বলিনি বুঝি? তোকেও তো চায় ওরা। তোরা ইংরিজি পড়ানোর প্রশংসা করেছি।’

‘সত্যি বলছিস?’

‘তোরা গা ছুঁয়ে বলছি।’ অপরূপা শান্তভাবে তার চিরাচরিত স্বপ্ন দেখার সময়কার দৃষ্টান্তে তাকিয়ে বলল। ‘সতুবাবু একা নাকি? বললুম না—আমাকে দেখতে কত লোক জুটেছিল সকালে। আমার ধারণা, বি এ পাশ করা মেয়ে ঠাকুরমা গায়ে এই প্রথম দেখল ওরা।’

রক্তনা চিন্তিতভাবে বলল, ‘আমরা চলে গেলে বাড়ির কী হবে?’

‘দাদা যখন আসবে, তখন থাকবে তার বাড়িতে।’ অপরূপা গার্জনের ভঙ্গিতে বলল। ‘মেয়েরা কি বাবার বাড়ি চিরকাল থাকে? দাদা কিরে এসে থাকবে।’

‘দাদার কী হল বল তো!’ রক্তনা ধরা গলায় বলল। ‘বোধহয় থাকলেও তো চিঠি অন্তত লিখত।’

অপরূপার মাথায় অল্প ভাবনা। বলল, ‘শিগগির—ধব, পরশু-তরশু তোতে-আমাতে যাই। কেমন? গিয়ে কবে একেবারে যাব, তাও ঠিক করে আসি। জিনিসপত্র কা আন্ন নেব? সবই থাকবে। ছুতোর বউকে থাকতে বলে যাব।’

রক্তনা বলল, ‘ঠাকুরমা গাছপালাগুলো?’

‘ছুতোব বউ ভোগ করবে যখন, তখন সেই জলটল দেবে-টেবে। ওটা প্রব্রম নয়।’

হঠাৎ রক্তনা একটু হাসল। ‘দিদি! হরেনদার কী হবে?’

অপরূপা চোখ কটমটিয়ে তাকাল। ‘কী হবে মানে? কে ওর ধার ধারে? নেহাত একটা চাকরির জন্ত একটু আদ্বারা দিতুম—সতুবাবুর লোক বলে। নৈলে ওইসব আজ্ঞেবাজে আনএডুকেটেড লোককে আমি পাত্তা দিতুম ভাবছিল? পথে আসতে-আসতে ওর সঙ্গে বগড়া হয়েছে আমার। ইস! আমি কী করব, না-করব, তা ঠিক করবে ও?’

রক্তনার মনে হল, দিদি তাকেই অকৃতজ্ঞ স্বার্থপর বলে, অথচ সে নিজে কী? হরেনদা এতদিন বাড়ির লোক হয়ে কত দেখাশোনা করল। রক্তনা মুখে কিছু বলল না।

অপরূপা বলল, ‘এ্যাঙ্গিন তোকে বলিনি—আজ বলছি শোন। হরেনদা

লোকটা মোটেও ভাল না। অনিচ্ছায় বাধ্য হয়ে মিশেছি। আছাড় বড় গারোপড়া তো—এড়ানো যায় না। বজ্রপুর স্টেশন থেকে বাঁকাশ্রীরামপুর যাবার পথে খানিকটা অঙ্ককার হয়েছিল।’ অপকণা কিসকিস করে বলল। ‘তখন জানিস—আমার সঙ্গে অসভ্যতা করতে এসেছিল। আমায় তো চেনে না! জড়িয়ে ধরে কিস করতে আসছিল—এত ওর সাহস!’

রক্তনা মনে মনে হেসে মুখে রাগ দেখিয়ে বলল, ‘খান্নড় দিসনি কেন?’ বলে হাসিটা চাপতে পারল না। পরকণে কিক করে হেসে কেঁলল। ‘তুই নিশ্চয় ইনডালজেন্স দিয়েছিস। নৈলে অত সাহস হবে?’

অপকণা রেগে গেল। ‘বাজে কথা বলিস নে রনি! আমার মেজাজ ঠিক থাকবে না বলে দিচ্ছি।’

বক্তনা হাসতে হাসতে লেবুগুলো লুকতে-লুকতে বেকল। বলল, ‘আজ লেবু ভাত দিদি। আর কিছু চাই নে।’ সে ঠাকুমার ঘরের দরজা খুলে কয়েকটা লেবু ঠাকুমার পুজোর জায়গায় রাখল। প্রণাম করল। তারপর দুটো লেবু নিয়ে রান্নাঘরে চলে গেল। ভাল-ভাত করা আছে। লেবু হলে জমবে ভাল।

মধুরবাবুর মুক্তি

বসন্তপুরের ‘সিংহভবনে’ একসময় ঘণ্টাঘড়ি ছিল। ঘণ্টায় ঘণ্টায় সেটা গেটেব কাছে ঢঙ ঢঙ কবে বাজত। কুম্ভনাথের আমলে আর বাজে না সেটা। এখন দারোয়ান মাত্র একজন—ওই বাহু দুর। ইদানিং বাড়ির মালিক কলকাতায় বলে তার অটেল স্বাধীনতা। গেটের পাশে টানা একতাল্লা কয়েকটা ঘর। দুটো ঘবে মোটরগাড়ির গ্যারেজ। একটা অ্যামবাসাভার, একটা জিপ। অ্যামবাসাভার গাড়িটা এখন কলকাতায়। ডাইভারও সঙ্গে গেছে। গেটের লাগোয়া বাহাদুরের ঘরের খাটিয়ার বসে সে রোজ রাতে শোবার আগে গাঁজা টানত। গাঁজার ব্যাপারে সঙ্গী একজন চাই-ই। একটানা ছিলিম টানা পোষায় না। তাই বাহাদুর একজন সঙ্গী খুঁজছিল। বদমেজাজী গৌয়ার বলে বসন্তপুরে তার সঙ্গী জোটে নি। এতদিনে জুটে গেছেন মধুরকুম্ভ গোলামী। তিনিও তকে তকে ছিলেন।

জু ছিলিমসকী হম নি মধুরবাবু, আহাৰনিহাৰও সজী বাহাদুৰেৰ। বাড়িৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত গাৰ্জেন ভুলো—মহেশ্বৰ বাৰ প্ৰকৃত নাম, আপত্তি জানাতে এসে বাহাদুৰ এমন চোখে তাকিয়েছিল যে ভুলো আৰ ভুলেও উচ্চবাচ্য কৰে না। ভুলো জানে, বাহাদুৰ খুনে প্ৰকৃতিৰ যুবক—কুকুৰিৰ কোপ বাড়তে ভাবনা-চিন্তা পৰ্বন্ত কৰবো না। আৰ কৰ্তাবাবু বাহাদুৰকে পুত্ৰবৎ স্নেহ কৰেন। কেন কৰেন, তাও জানে ভুলো। পয়সা দিয়ৈ ভালকৃত্তা পুবেছেন।

মধুরবাবুৰ চেহাৰায় আৰ বাকি জেহাটুকুও নেই। কিন্তু কোথেক একটা চোলা প্যাণ্ট আৰ খন্দৰেৰ পানজাবি জুটিয়ে চেহাৰায় ভোল বন্ধা কৰেছেন। বন্ধনাৰ ঠাকুমাৰ কাছে যে কয়লটা কেলে শালিয়েছিলেন নিমতিতা স্টেশনে, এতিদিনে সেটা কেবল পেয়েছেন। বন্ধনা মেয়েটা—তাঁৰ মতে, পৃথিবীৰ এক সেৱা মেয়ে। ও মেয়ে বাৰ বউ হব, তাৰ বৰাতকে হিংসে কৰা উচিত।

বাহাদুৰ স্বপাক ধায়। মধুরবাবু যত পৈতে দেখান না কেন, সে তাঁৰ হোঁয়া ধাবে না। তবে ছিলিম জিনিসটা আলাদা ব্যাপাৰ। আশুনেব কি এটা থাকে? তহুপৰি শিবেৰ প্ৰসাদ। শবেৰ চেলাদেৰ জাতিবৰ্ণ ভেদ নেই।

ডাইভাৰ ভগবতীপ্ৰসাদেৰ খাটিয়া বাহাদুৰেৰ ছোট ঘৰে আনায় একটু ঠাসাঠাসি হয়েছে। হাতে সেকা চাপাটি আৰ আলুফুলকপিৰ ঝাঁট তজনে খেয়ে ছিলিম টেনেছে এবং প্ৰচুৰ স্বথঃখৰ কথাবাৰ্তা হয়েছে। মোতাত যত জমে, কথাও তত কমতে থাকে। তাৰপৰ পাশাপাশি দুটি খাটিয়ায় তজনে শুয়ে বেঘোবে ঘুমায়।

কুকুপক্কেৰ ৰাত। চাদ কয়ে গেছে—উঠবে সেই শেষ বাত্ৰে কয়লৈৰ ভেতৰ থেকে মধুরবাবু মুখ বের কৰে বাহাদুৰেৰ অবস্থা অল্পমান কৰছিলেন। তাৰ নাক সমানে ডাকছে। কিছুক্ষণ কান পেতে শোনাৰ পৰ আন্তে আন্তে উঠে বসলেন। অন্ধকাৰে ঠাহৰ কৰে আগে ওৰ বালিশেৰ পাশ থেকে লম্বা টৰ্চ, তাৰপৰ খাপেভৰা মাৰাত্মক কুকুৰিটা তুলে নিলেন। তাবপৰ দবজা খুললেন সাবধানে। সামনে কালি ৰাস্তাৰ পৰ লতাৰ বেড়া, তাৰ ওদিকে টেনিস লন। বাড়িৰ মাথা থেকে একটা বাল্ব আলো ছড়াচ্ছে গেট অৰ্দ্ধি। গেটে ভেতৰ থেকে তালো আঁটা। চাবিৰ খোকা দেয়ালেৰ হকে ঝুলছে। মধুরবাবু সাবধানে টৰ্চ জ্বলে বাহাদুৰেৰ খাটিয়াৰ তলায় আলো কেললেন। প্ৰকাণ্ড টিনেৰ ট্ৰাংক। চানলেই শব্দ হব। হতাশ হয়ে অগত্যা নিজের কয়ল, বাহাদুৰেৰ টৰ্চ আৰ কুকুৰিটা সম্বল কৰেই বেকলেন। দরজা বাইৰে থেকে ঠেলে তেজিয়ে দিতে ভুললেন না।

গেটের ডালা খুলে একটু ফাঁক করে বেরিয়ে গেলেন মধুরবাবু। তারপর তাঁকে আর পায় কে? সিংহভবনের সামনের রাস্তায় দূরে-দূরে একটা করে ল্যাম্পপোস্ট। রাস্তাটা পেরিয়ে গিয়ে আগাছার জঙ্গল ভেঙে মাঠে নামলেন। তারপর ঝিক ঝিক করে আপন মনে হেসে উঠলেন। আজ ছিলিমের টানে বড় ফাঁকি দিয়ে ঠকিয়েছেন ছোকরাকে। মাথার ওপর ঝকঝক করছে নক্ষত্রপুঞ্জ। কদলটা এযাত্রা রক্ষা করেছেন বলে আরও আনন্দ হচ্ছিল। কদল মুড়ি দিয়ে নাকবরাবর চললেন স্টেশনের দিকে। এই ছোটলোকদের দেশ থেকে পালানোর জন্ত কবে থেকে মন ছটকট করছিল। চিঠিটা প্রথমেই বেড়ে দেবেন কাউকে। কুকবির খদ্দেরের অভাব হবে না। তাছাড়া যতক্ষণ সঙ্গে এ জিনিস থাকে, ততক্ষণ সাহসও থাকে। আস্থক না নেপালী ছোঁড়াটা, এক কোণে মুণ্ড নামিয়ে দেবেন। অন্ধকারে কুকরিটা একবার বের করে চারদিকে শূন্যে কোণ ছেড়ে মধুরবাবু চাপা গর্জালেন, ‘আয় শালারা! চলে আয়—এবার দেখছি।’

স্টেশনের আলো জুগ জুগ করছিল কুয়াশায়। ঠাণ্ডাটা বেড়ে যাচ্ছিল। রাত একটা দশের ডাউন ট্রেনে বিস্তর লোক কলকাতা যায়। ঐকিমধরা ভিড় জমে ওঠে প্র্যাটকমে। ঘুমঘুম গলায় চা হাঁকে বেড়ায় জয়রাম আর মঙ্গল। মঙ্গলের চায়ে আদার বস থাকে। মধুরবাবু হনহন করে টাট্টু বোড়ার মতো স্টেশনের দিকে চললেন

অনেকদিন থেকে কলকাতা যাবার কথা ভাবছিলেন মধুর বাবু। যাওয়া হচ্ছিল না। কলকাতায় না গেলে মাসুকের উন্নতি হয় না। এবার যাওয়াটা ঠেকাবাব মতো কিছু রইল না। কারণ ওই বাহাদুর। বাহাদুরকে শত্রু করভে পেরে নিজের একটা মুক্ত জোটাতে পেরেছেন মধুরবাবু। বাপ্‌স! ওই খুনে বসন্তপুবে থাকতে আর কি ফেরার কথা ভাবা যায়?

বাত একটাব পর যে কোনো সময় বসন্তপুবে আপ ও ডাউন দুটো ট্রেন এসে পালাপাশি দাঁড়ায়। যতক্ষণ না অন্য ট্রেনটা পৌঁছেছে, স্টেশনে আগে-আগে ট্রেনটাকে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়। লুপ লাইনের এই নিয়ম। একটু গুণগোল হলেই মুখোমুখি একই লাইনে সংঘর্ষ ঘটে যাবে।

মধুরবাবু কদল মুড়ি দিয়ে এককোণে বসে যখন চা খাচ্ছেন, তখন হাওড়া থেকে আপ গয়াপ্যাসেঞ্জার এসে পৌঁছল। মধুরবাবু হনহন করে টাট্টু বোড়ার মতো কেঁট সিঁপির মেয়েকে একা নামতে দেখে অবাক হয়ে গেলেন। আর এ কী চেহারা হয়েছে মেয়েটার! শুনেছিলেন কী অস্থ-বিস্থ হয়ে কলকাতায় আছে নার্সিং হোমে। এত রাতে একা এভাবে কিরে এল যে?

ভীষণ ইচ্ছে করল কথা বলতে, কিন্তু উপায় নেই। একসময় দেখা হলে নিঃসংকোচে টাকাপয়সা চাইতেন। হাসিমুখে দু-একটা টাকা দিত মেয়েটা। দূর থেকে দেখলেই মধুরবাবু চোঁচিয়ে ডাকতেন, ‘বিদ্যাস! বিদ্যাস!’ খুব ভাল মেয়ে। অমন বড়লোকের মেয়ে, দেমাক তো থাকবেই। কিন্তু মধুরবাবুর সামনে একটুও দেমাক দেখায় নি কোনোদিন।

একটা সুন্দর চাকলি চলে গেল। কিছু পয়সাকড়ি চাওয়া যেত। দুঃখিত মনে মধুরবাবু চায়ে শেষ চুমুক দিলেন। তারপর ভাঁড়টা ছুঁড়ে ফেললেন স্টেশন ঘরের ড্রেনের দিকে। এবার ভয় হল, ও তো গিয়েই ডাকবে বাহাদুরকে। বাহাদুর জেগে উঠে দেখবে তার টর্চ নেই। কুকরি নেই। তখন কী হবে?

মধুরবাবু মনে মনে মাথা কুঁচতে থাকলেন, জাউন ট্রেনটা একুনি এসে যাক ভালয়-ভালয়। হে মা কালী! হে বাবা মহাদেব!

আপের দিকে সিগন্যাল দিয়েছে। দেখে উঠে পড়লেন। তার সইল না। ওভারব্রিজ না পেরিয়ে গয়াপ্যাসেঞ্জারের কামরা গলিয়ে লাইন ভিঙিয়ে হাঁচড়-পাঁচড় করে ওপারের প্ল্যাটফর্মে উঠে নিশ্চিন্ত হলেন মধুরবাবু। দূরে বাঁকের মুখে আলো দেখা যাচ্ছে। ঢঙ ঢঙ করে ঘণ্টা বেজে উঠেছে আবার। মধুরবাবু কাঁপা-কাঁপা গলায় গান গাইবার চেষ্টা করছিলেন।

‘তোমার সঙ্গে পাপ করেছে...’

বাড়ির উত্তর অংশে একটা ঘরে সপরিবারে ভুলো বাস করে। দরজায় ধাক্কা আর ডাকাডাকিতে আলো জ্বলে সে বেরুল। তারপর আকাশ থেকে পড়ল। ‘দিনিমিগি তুমি! কর্তাবাবু কৈ? কী ব্যাপার। এমন করে...’

বিপাশা রুম্ব স্বরে প্রায় চোঁচিয়ে উঠল, ‘খামো তো! ওদিকে দরজা খুলে দাও।’

সে বাড়ির সামনের দিকটায় চলে গেল। ভুলো ভেতরের ঘর দিয়ে গিয়ে হলঘরের দরজা খুলল। উকি মেরে দেখল গেটের দিকটায় জনপ্রাণী নেই। সে হতবাক হয়ে রইল। বাহাদুর নিশ্চয় গেট খুলে দিয়ে শুয়ে পড়েছে।

বিপাশা বলল, ‘হাঁ করে কী দেখছ? আমার ঘরের দরজা খুলে দাও গে। আমি বড্ড টান্ডার্ড।’

ভুলো সিঁড়ি বেয়ে ওপরে চলে গেল। দরজা খুলে দিল। সিঁড়ি বেয়ে বিপাশার পৌঁছেতে দেরি হচ্ছিল। সে দোতালার বারান্দায় পৌঁছে একটু জিরিয়ে নিল। ভারপর আন্তে আন্তে ঘরে ঢুকে সোফায় বসল। আন্তে বলল, ‘বিছানাটা ঠিক করে দাও। আমি শোব।’

ভুলো বিছানা গুছিয়ে দিয়ে বলল, ‘কিছু খাবো গো? গরম দুধ এনে দেব?’
বিপাশা বলল, ‘না। জল খাব।’

ভুলো জল এনে দিল। জলটা খেয়ে বিপাশা একটু হাসল। ‘অবাক লাগছে—না ভুলোদা? আমি পালিয়ে এসেছি।’

‘সে কী গো।’

‘হ্যাঁ। বলো ভুলোদা, মিছিমিছি কলী সেজে থাকতে ভাল লাগে?’ বিপাশা আন্তে আন্তে বলল। ‘রোজ বিকেলে একটু বেড়াই। একটা সুন্দর বাগান করে রেখেছে নার্সিং হোমের পেছনে। ওখানে গিয়ে চুপচাপ বসে থাকি। বাড়ির কথা ভেবে কান্না পায়। তাই চলে এলুম।’

ভুলো একটু হাসল। ‘কী কাণ্ড। ওনাবা তো খুঁজবেন গো।’

‘হঁ! তুমি ট্রাংক কল করে মামাকে জানিয়ে দাও।’

‘কর্তাবাবু ঘরের চাবি তো নেই আমার কাছে। কোন যে ওনার ঘরে।’

‘চাবি নেই?’

‘না।’

‘তাহলে সকালে পোস্ট অফিসে গিয়ে করবে। যাও ভুলোদা, ঘুমোও গিয়ে।’

‘লক্ষ্মী দিদি, কিছু খাও। দুধ গরম করে আনছি।’

বিপাশা বাগঁদেখিয়ে বলল, ‘কী জ্বালাতন করো ভুলোদা! বললুম না আমি টায়ার্ড। ঘুমবো।’

‘আচ্ছা, আচ্ছা। তুমি ঘুমোও।’ বলে উদ্বিগ্ন ভুলো চলে গেল বাইরে গিয়ে সে ফের বলল, ‘দরজা ভাল করে আটকে দিও দিদি।’

বিপাশা বলল, ‘দিচ্ছি। তুমি শুয়ে পড় গে তো। খালি কথা ব্যাড়াই।’

ভুলোর পায়ের শব্দ কাঠের সিঁড়িতে তালিয়ে গেলে সে উঠে দরজা বন্ধ করল। দক্ষিণের জানলাটা খুলে দেখল, ওদিকটা অন্ধকার হয়ে আছে। ঘরের উষ্ণতায় সে আরাম পাচ্ছিল। কিন্তু জানলা দিয়ে ঠাণ্ডা আসছে দেখে বন্ধ করে দিল। ফের সোফায় কিছুক্ষণ বসে রইল। কাপড় বদলানো উচিত। কিন্তু ইচ্ছে করছিল না। জীবনে এমন দীর্ঘ আর ক্লান্তিকর ট্রেনজানির অভিজ্ঞতা

তার ছিল না। বিকশো করে বাড়ি পৌঁছতে ঠাণ্ডায় প্রায় জমে গিয়েছিল। এখন একটু করে চাঞ্চা হয়ে উঠছে তার শরীর-মন।

বাড়ি কেয়ার আনন্দ তাকে নাড়া দিচ্ছিল। তখন ড্রয়ার খুলে একটা ক্যাসেট বের করল। ক্যাসেট চলিয়ে দিল। এই টেপরেকর্ডারটা দিশি জিনিস। শতজু যেটা এনেছে, সেটা ডঃ চৌধুরীর ক্লিনিকে তার ঘরে রয়ে গেছে। এটা একটা বসবস শব্দ করে। ক্যাসেটটাও হিন্দি ফিল্মের। তবু এখন এই নির্জন রাতে সঙ্গীত তার বড় প্রয়োজন। যা হোক কোনো সঙ্গীত—শুনতে শুনতে তার ঘুমুনের অভ্যাস বহুদিনের। বড় আলোটা নিভিয়ে টেবিল ল্যাম্পটা জ্বলে দিল সে। তারপর বিছানায় উঠে শুয়ে পড়ল। কার্ডিগানটা ছুঁড়ে কেলল সোফায়। কার্ডিগানটাও শতজু এনে দিয়েছে। এদেশের শীতের পক্ষে ঝড়াবাড়ি বলা যায়। কলকাতায় তো গায়ে ঘাম এনে দিত। তবু রাতের ট্রেনে কার্ডিগানটা তাকে বাঁচিয়েছে আজ।

বিছানায় চোখ বুজে শুয়ে সে গান শুনতে থাকল। স্বরটা তার ভাল লাগছিল এখন। কোন্ গান কোন্ স্বরে কখন যে ভাল লাগে, বলা কঠিন। এই ক্যাসেটটা সে দৈবাৎ ঝোঁকের বশে কিনে ফেলেছিল। একটুও ভাল লাগত না। এখন ভাল লাগছে। সে গভীর স্বখে ডুবে রইল।

কতক্ষণ পরে তার মনে হল পূবের জানলার বাইরে কে হাওয়ার শব্দে কী একটা বলছে। কান পাতল সে। ‘তোমার সঙ্গে পাপ করেছি সেই তো আমার পুণ্য।’ বিপাশা উঠে বসল। ‘তোমার সঙ্গে পাপ করেছি...’ সে অশ্রুটস্ববে বলল, ‘কে?’

তেমনি হাওয়ার শব্দে জবাব এল, ‘আমি অনি।’ বিপাশা বিছানা থেকে নেমে পূবের জানলা খুলে দিল। দেখল, বাগানের পূব-দক্ষিণ কোণে একটা হাওয়াকল উচুতে খুব আন্তে ঘুরছে। তার গায়ে আটকে গেছে কুম্পক্ষের ভাঙা এককালি চাঁদ। ক্ষীণ জ্যোৎস্না তার। হাওয়াকলের প্রকাণ্ড চাকারটা ঘুরে-ঘুরে চাপা ও গভীর খাসপ্রাঙ্গণে আবৃত্তি করছে, ‘তোমার সঙ্গে পাপ করেছি সেই তো আমার পুণ্য...’

সুপ্রাচীন অলীক এক হাওয়াকলের দিকে নিম্পলক তাকিয়ে রইল বিপাশা।...

বিপাক্ষার চিঠি

বাঁকাশ্রীরাঁমপুঁর খুব ংকটী পছন্দ হয়নি রজনীর । তবে লোকগুলো বেশ ভাল । কথায় কেঁমন ঠাকুঁমার মতো টান । শুনতে হাসি পায় । ঠাকুঁমাদের ভিটের ওপর দাঁড়িয়ে রজনী হতাশ হয়ে ভেবেছে, ংই শুকনো টিবি, নিম্বন, গেরুগাছের ংপ-বাঁড় দেখতে আসার জ্ঞ ংত ছটকটানি ছিল ঠাকুঁমার । রজনী যদি বসন্তপুঁর ছেঁড়ে কোথায় গিয়ে থাকত, কক্ষণে তার মন ধারাপ করত না । অবশ্য জায়গাটা ভাল হওয়া চাই । বাঁকা-শ্রীরাঁমপুঁরের মতো হলেই মুশকিল । না রাস্তাঘাট, না কিছু । ংদো পাড়াগাঁ । সতুবাবু বলেছেন, ‘শিগাঁগর রাস্তা পাকা হচ্ছে স্টেশন ংদি । ংদিকে মাত্র পাঁচমাইল দূরে রয়েছে হাইওয়ে । তার সঙ্গে জুড়ে দিলে তো ং গ্রাম ংকেবারে শহর হয়ে যাবে । তখন বাসে চেপেই বসন্তপুঁর পৌঁছে যাবে লোকে ।’

মথুরামোহনের ভিটেয় দুবোঁক ংর তুলে দেবে গাঁয়ের লোকে । ংপরুপা কেরার পথে সেই ঘরের গল্প ং সাতকাঁন করে শুনিয়েছিল রজনীকে । ‘মাটির ংর হোক না—দেয়ালে প্ল্যাস্টারিং করে নেব । চূণকাম করলে দারুণ দেখাবে । পরে ইটের কবে নিলেই চলবে । জানিস ? ংধানকার মাটিতে ভাল ইট হয় ? সতুঁকাকা বলছিলেন । তাছাড়া ধর, দুতিন বছরের মধ্যে ইলেকট্রিসিটি ং এসে যাবে গ্রামে । বসন্তপুঁর কাঁ ছিল বল ? ংমাদের ছেলেবেলায় তো কত মাটির ংর দেখেছি । ংখন ং দুচারটে ংছে । ংভাবেই তো হয় । দেশের চেহারা বদলাচ্ছে না বুঝি ?’

রজনী ংত শুনে ং ভেতর-ভেতর মনমুঁদা হয়ে পড়েছে । তার ংকটী ংশা, দাদা কিরে ংলে তাকে বাঁকাশ্রীরাঁমপুঁরে নিশ্চয় থাকতে দেবে না । দাদির ংকটী চাকরির দরকার—করুক না ংধানে । যদি দৈবাৎ কলকাতার সেই ইন্টারভিউয়ের চাকরিটা হয়ে যায়, দিদি ং কি ংধানে থাকতে চাইবে ?

রজনী টের পেয়েছে, ংপরুপার সঙ্গে হেরনের সম্ভবত ংকটী রক্ষা হয়েছে । হেরন তাদের সঙ্গে ংবার যেতে চেয়েছিল তার মানেরটা কাঁ ? তাই বলে ংপরুপা কি ংকে বিয়ে করবে শেষ পর্যন্ত ? রজনীর খুব ধারাপ লাগে ংটা । দিদিটা বড্ড বোকা । কেন ছেলের সঙ্গে মিশতে গিয়েছিল ? রজনী তো ং পর্যন্ত কোনো ছেলেকে পাত্তা দেয় নি । দেবে ং না কোনেদিন ।

অবেলায় বাড়ি ঢুকলে ছুতোর বউ একগাল হেসে বলল, ‘খুব খাওয়া-দাওয়া হল তাহলে কুটুম বাড়িতে ? তা না গো ?’

উঠানের পোয়ারাগাছে একটা দোলনা ঝুলছে, তার ভেতর পেনীর ছোট্ট ভাইটা। অবাক হয়ে অপরূপা বলল, ‘ও কী গো বউ ?’

‘পেনীর বাবা বানিয়েছে। রোজ বলি, কানে- করে না।’ ছুতোর বউ হুষ্ঠিত হেসে বলল। ‘খুলে নিয়ে যাব এমুনি। কোলের খোকা সামলাব, না তোমাদের বাড়ি আগলাব বলো ? সবসময় চোরচোটার উকি খুঁকি।’

অপরূপা হেসে বলল, ‘না না। থাক না। বেশ তো টাঙিয়েছ।’

দুটো ব্যাগ ভর্তি কপি, টমাটো, আলু নিয়ে এসেছে দুইবোন। চটের ব্যাগে ভরে দিয়েছেন সতুবাবু। ছুতোর বউ তার ভাগ পেল। কৌচড়ভরে নিয়ে যাবার সময় হঠাৎ পিছু কিরে বলল, ‘উদিকে এক কাণ্ড। পথে আসতে শুনলে না কিছু ?’

অপরূপা আনমনে বলল, ‘কী গো বউ ?’

ছুতোর বউ কিসকিস করে বলল, ‘কেইসিজির মেয়ে—বুঝলে ? কাল রাত্তিরে ছাদ থেকে ঝাঁপ দিয়ে মারা গেছে।’...

অপরূপা চমকে উঠল। ‘বিয়াস ? বিয়াস ছাদ থেকে ঝাঁপ দিয়েছিল ?’

রজনী চোখ বড়ো করে বলল, ‘সে কী। বিয়াসদি তো কলকাতায় ছিল, কবে এল ? যাঃ! সব মিথ্যা কথা।’

‘না গো। চোখের দিব্যি।’ ছুতোর বউ চোখ ছুঁয়ে বলল, ‘পেনীর বাবা বললে, কখন হাসপাতাল থেকে পালিয়ে বাড়ি চলে এসেছিল। তারপব রেভের বেলা নাকি নিশিতে ছাদে ডেকে নিয়ে যায়।’

অপরূপা আন্তে বলল, ‘মারা গেছে ?’

‘হ্যাঁ। এতক্ষণ পুড়িয়ে এসেছে গুশানে। নাকি পোড়াচ্ছে।’ ছুতোর বউ ষিড়কির দিকে যেতে যেতে বলল। ‘সিজি, সিজির বউ, সিজির ছেলে দুপুরবেলা এসেছে খবর পেয়ে। কোন করেছিল—বুঝলে না ? কোন করেছিল ভোরবেলা। পেনীর বাবা বললে।’

চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে অন্ধকার এল। নিঃশ্বাস কেলে অপরূপা বলল, ‘রনি, আলো জ্বালবি নাকি ?’

রজনী হেরিকেন জেলে এনে বলল, ‘বিয়াসদির কী হয়েছিল, জানিস দিদি ?’

অপরূপা মাথা নাড়ল। একটু পরে বলল, ‘ওদের বাড়ি তো যাওয়া হয় না। তোকে অপমান করেছিল। ঢুকতে দেয়নি। নৈলে একবার যেতুম। বিয়াস এভাবে মরে যাবে কে ভেবেছিল বল ?’

রক্তনা ধরা গলায় বলল, ‘আমায় খুব ভালবাসত বিয়াসদি। কত বই দিত।’

‘হ্যাঁ। বিয়াসের মনটা বড় ভাল ছিল।’

‘দাদি!’

‘উ?’

‘বিয়াসদি আমায় চুপিচুপি দাদার কথা জিগ্যেস করত। কেন রে?’

অপরূপা কাঁঝালো স্বরে বললে, ‘আমি কেমন করে জানব? ওসব ছেড়ে দে তো। সন্ধ্যাবেলা আজ্ঞেবাজে কথা ভাল লাগে না। উছুন ধরাতে হবে। কুকারে তেল নেই। কে আনবে বাবা? কমলা ধরিয়ে দিচ্ছি।’

রক্তনা চুপ করে থাম ধরে দাঁড়িয়ে রইল। তার কান্না পাচ্ছিল। বিয়াসদি এভাবে মারা গেল! সত্যি কি নিশি বলে কিছু আছে—যা মানুষকে রাতের বেলা ডেকে নিয়ে গিয়ে মেরে কেলে? চোখে জল নিয়ে রক্তনা ভয়-পাওয়া দৃষ্টিতে অন্ধকার পাঁচিলের দিকে তাকিয়ে রইল।

পরদিন সকালে টিউশনি করে ফেরার সময় অপরূপা একটা চিঠি পেয়ে চমকে উঠল। বিয়াসের চিঠি যে! তার হাত কাঁপছিল। খামটা কোনোরকমে ছিঁড়ে তারিখটার ওপর চোখ পড়ল সে নিশ্চিন্ত হল। চারদিন আগের তারিখ। ডিমল্যাণ্ড নার্সিং হোম থেকে লেখা। কলকাতার ঠিকানা। বিয়াস লিখেছে: ‘অপু, কতদিন থেকে ভাবছি, তোকে একটা চিঠি লিখব। আলসেমি করে হয়ে ওঠে নি। তুই তো জানিস, আমি চিরকাল ভীষণ অলস। চুপচাপ সময় কাটাতে পারলে আর কিছু চাই নি। এতদিনে যেন তার শাস্তিটা ভালরকমে পাচ্ছি। আমি জানি আমার কোনো অসুখ নেই। অথচ আমাকে জোর করে এই নার্সিং হোমে আটকে রেখেছে। এটা একটা মেন্টাল ক্লিনিক আসলে। রাজ্যের পাগল এনে এখানে ঢুকিয়েছে। আমি কি পাগল? তুই বল অপু! আমাকে এবার সত্যি সত্যি পাগল করে ছাড়বে এরা। তাই খুব শিগগির এখান থেকে পালাতে চাই। তার আগে তোকে এই চিঠিটা লিখে ফেললাম একটা জরুরী তাগিদে। তুইও ভাল করে ভেবে দেখিস, যা লিখছি তাতে তোর বা তোদের ফ্যামিলির কোনো অপমান হবে না। আমি জানি, তোদের তাইবোন কারুর মধ্যে গ্রামা-লোকের মতো কুসংস্কার ছিল না। অনিদা ঠাট্টা করে আমাকে বলত, তোমরা তো ছাতুরটিথেকে খোঁটা ছত্রী রাজপুত বংশ। এদেশে এসে জাত ভাঙিয়ে কায়েত হয়েছে। আমি বলতুম, তোমাদের দেহেও কিন্তু বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ রক্ত নেই। তোমার ঠাকুমা নাকি কায়েতের মেয়ে।...’

অপরূপা চিঠি থেকে চোখ তুলে দাঁড়িয়ে রইল। কী সব লিখেছে বিপাশা।

কেন এসব কথা লিখেছে ? তারপরই তার মনে পড়ে গেল কেন, বিপাশা মৃত । সে অন্তমনস্ক হয়ে রইল কিছুক্ষণ । রাত্তার ধারে দাঁড়িয়ে এভাবে চিঠি পড়া উচিত নয় ভেবে সে হন হন করে বাড়ির দিকে হাঁটতে লাগল ।

বাড়ি ঢুকে দেখল, রক্তনা চূপচাপ বসে আছে বারান্দায় পা ঝুলিয়ে । পেনী তার পায়ের কাছে বসে কড়ি খেলছে আপন মনে । রক্তনা বলল, ‘চিঠি নাকি রে দিদি ? কার চিঠি ?’

অপরূপা বলল, ‘বলছি ।’ তারপর সে ঘরে ঢুকে ফের চিঠিটা নিয়ে বসল ।

‘...তখন অনিদ্ধা হাসতে হাসতে বলত, তাহলেও প্রাসে-মাইনাসে মাইনাস হয়ে গেছে । নিছক কথার কথা । এতদিনে তাকে বলা দরকার অণু, তুই ছাড়া বসন্তপুরে কেউ আমার বন্ধু ছিল না—সে তুই যাই ভাব না কেন । তোকেই বলছি শোন, অনিদ্ধার সঙ্গে আমার একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল । বুঝতেই পারিস, খুব গোপন সম্পর্ক সেটা । অনিদ্ধা আমাকে নিয়ে চলে যেতে চেয়েছিল । আমি সাহস পাই নি । এখন ভাবি, চলে গেলে দুজনেই বেঁচে যেতুম । তবে সেকথা যাক । যা হয় নি, হল না এ-জন্মে—তার দুঃখ নিয়ে আমি বেঁচে থাকলুম । আমার দুঃখ আমারই একার । তাই থাক ওকথা । এবার আসল কথাটি বলি শোন । দাদার রক্তনাকে খুব পছন্দ । দাদা তাকে বলতে সাহস পায় নি । কিন্তু আমাদের বাড়িতে এ নিয়ে প্রচণ্ড অশান্তি হয়ে গেছে । এখনও বাবাব সঙ্গে দাদার কথা বন্ধ । কেন তা আশা করি বুঝতে পারছিস । বাবা সেকেলে মাহুষ । ফিউডাল সংস্কারে আচ্ছন্ন । দাদার সঙ্গে বাবার কোনোদিন তো মতের মিল হয় নি ।...’

অপরূপা একটু হাসল । শতদ্রু তাকে চিঠি লিখেছিল, বলে নি বিপাশাকে । বললেই পারত ।

‘...জায়গা কমে গেল লেখার । লিখতেও কষ্ট হয় আজকাল । শরীর দুর্বল । অণু, আমার অহরোধ তুই রক্তনাকে দাদার হাতে তুলে দে । রক্তনার ভাল হবে । দাদা ওকে নিয়ে অ্যামেরিকা চলে যাবে । আমি জানি, রক্তনার মনেও এধরণের একটা স্বপ্ন আছে । ইংরেজি উপন্যাসের পোকা বরাবর । দাদা যখন বিদেশে, তখন রক্তনা আমার কাছে গিয়ে খুঁটিয়ে সেধানকার কথা জানতে চাইত । দাদার পাঠানো ছবি গুলো দেখে মুগ্ধ হত । ওকে যদি বলতুম, তুই যাবি ওদেশে ? রক্তনা বলত, কে নিয়ে যাবে ? তাকে তখন বলতে পারি নি, দাদা নিয়ে যাবে । কারণ তখন এসব কথা মাথায় আসে নি । এখন বলতে পারি ।...’

বিপাশা ক্ষুদ্রে অকরে মার্জিনগুলো ভরিয়ে কেলেছে। শেষপাতার মার্জিনে লেখা খুব অস্পষ্ট হয়ে গেছে। খুঁটিয়ে কষ্ট করে অপরাধা উদ্ধার করল, নাম সইয়ের ওপর দুটো লাইনে লেখা আছে : ‘অপু, আমি হয়তো বেশিদিন বাঁচব না। অনি আমাকে ডাকছে। আমি অনির কাছে চলে যাব। ইতি তোর বিয়াস।’

অপরাধা ক্যাল ক্যাল করে তাকিয়ে রইল। ‘ভুল পড়ল নাকি? আবার পড়ার চেষ্টা করল।...‘অনি আমাকে ডাকছে। আমি অনির কাছে যাব।’

অপরাধা নড়ে বলল। ডাকল, ‘রনি! রনি! আয় তো!’

রত্ননা এসে বলল, ‘কী রে দিদি? কার চিঠি?’

সে-কথার জবাব না নিয়ে অপরাধা বলল, ‘এই লাইন দুটো পড়তে পারিস?’

রত্ননা পড়ল : ‘অনি আমাকে ডাকছে। আমি অনির কাছে যাব। ইতি তোর বিয়াস।’ সে চমকে উঠে বলল, ‘বিয়াসদির চিঠি! সে কী!’

অপরাধা বলল, ‘আমি, না অনি লিখেছে? ভাল করে আখ।’

রত্ননা দেখে বলল, ‘ই্যা-রে! অনি। দিদি, অনি কে রে?’

অপরাধা গলার ভেতর বলল, ‘দাদা।’

‘দাদার কথা লিখেছে বিয়াসদি?’ রত্ননা অবাক হল। ‘দাদা ওকে ডাকছে—দাদার কাছে যাবে, তার মানে কী রে দিদি? কিছু তা বোঝা যাচ্ছে না।’

অপরাধা তার হাতে চিঠিটা দিয়ে মুখ ঘুরিয়ে জানলার বাইরে কলাবনের ফাঁক দিয়ে ডোবা দেখতে থাকল। মাছরাঙাটা বাঁশের কক্ষিতে চূপ করে বসে আছে। জলটা সরে আরও সবুজ হয়েছে।

রত্ননা খুঁটিয়ে চিঠি পড়ার পর করুণভাবে হাসল। ‘যাঃ! কোনো মানে হয় না! মনেই পড়ে না কবে বিয়াসদিকে বলেছিলুম অ্যামেরিকা যাব। বিয়াসদি থাকলে...’ সে চূপ করে গেল।

অপরাধা অশ্রুটস্বরে বলল ‘শেষ কথাটা এমনভাবে লিখেছে যেন দাদা একজন ডেড ম্যান। পাগলামি না কী! বিয়াসের অস্থবচা তো মেন্টাল। সাইকিক পেসেন্টের কীতি!’ সে ঘুরে রত্ননার দিকে তাকিয়ে তার মতামত বুঝতে চাইল। ‘তাই না রনি? দাদার কিছু হলে বিয়াস- শনবে, আমরা বুঝি জানব না?’

রত্ননা ঠোঁট উন্টে চিঠির দিকে তাকিয়ে বলল ‘কে জানে!’

অপরাধা একটু হাসল। ‘কী রে? ইচ্ছে করছে?’

‘কিসের ইচ্ছে?’

‘যাবি অ্যামেরিকা?’

‘মারব বলে দিচ্ছি!’ রজনী কিল তুলল। ‘দিদি বলে খাঁতির করব না।’
চিঠিটা সে অপরাধের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বেড়িয়ে গেল।

অপরাধী ডাকল, ‘রনি! শোন।’

সাইরে থেকে রজনী বলল, ‘কী?’

‘এখানে আয়। কথা আছে।’

‘এখান থেকে বল। কান আছে আমার।’

অপরাধী বেরিয়ে গিয়ে বলল, ‘সিরিয়াসলি বলছি, রনি। সিদ্ধিরা তোকে
বাড়ি ঢুকতে দেয় নি। তোর কি প্রতিশোধ নিতে ইচ্ছে করছে না?’

রজনী মুখ নামিয়ে বলল, ‘খুব করছে।’

‘তাহলে?’

রজনী চুপ করে থাকল। তার পায়ের আঙুলে খামের গোড়ার ভাঙা
পলস্তারা খসে পড়ছিল।

অপরাধী বলল, ‘কী হল? কাঁদছিস কেন?’

রজনী জবাব দিল না।

তখন অপরাধী বোনকে জড়িয়ে ধরে বলল, ‘ছি: রনি! এতে কাঁদবার কী
হল বল তো? বিয়াস আমার একমাত্র বন্ধু ছিল। নেচারা অমন করে মরে
গেল। কিন্তু কী করব? আমার নিজের সমস্তা কি কম? আর কিছু ভাববার
সময়ই পাচ্ছি না। অন্তত বিয়াসের মুখ চেয়ে একটা কিছু করা দরকার। তুই
অমত করিসনে রে! কেমন?’

গোপনে নির্জনে

দুর্ঘ এখান উত্তরায়নে চলে এসেছে। রোদে উষ্ণতা জেগেছে। বসন্তপুত্রের
মাঠে ঘুর্ণীহাওয়া রেললাইন ডিঙিয়ে চলে যায় করালী নদীর দিকে। শ্মশানের
ভাঙ্গা উড়িয়ে ঢোকে দেবী করালীর ভিটের। প্রাচীন বৃক্ষেরা চঞ্চল হয়ে ওঠে।
মধ্য কান্তনে এখন মন্দার শিমূল পলাশের লাল ফুল দাঁউদাঁউ জ্বলছে চতুর্দিকে।
হাইওয়ের দুধারে দীর্ঘ বৃক্ষরেখা। শিরিস দেবদারু বট অশথ চিকণ ঘনসবুজ রঙে
ঢাকা। নদীর শাকোর কোণে অমলভাস গাছটা হলুদ ফুলে ঢাকা। দুই
বোন বাস থেকে নেমে করালীর ভিটের গিয়েছিল।

কুড়ানি ঠাকরন বলতেন, ‘করালী আমার মা। আমি তার মেয়ে।’ বলতেন, ‘মা স্বপ্ন দিয়ে ডেকে পাঠিয়েছিল আমাকে। মায়ের মনে এটা ইচ্ছে ছিল। সে-ইচ্ছের ফল এই দেখছি। তাই। আমার বরসংসার, আমার ফুল-কলের বিরক্তি, আমার গউর, আমার অপু, আমার রনি, আমার দুটুটা—ওই অনি। আর কী চাই মাহুমের? শুধু দুঃখুটা রইল বাপটার জন্তে। সেই যে জল আনতে গেল, আর ফিরে এল না—দেখাও হল না এ জন্মেতে।’

দেবী কবালীর কাছে তাঁর জগৎ ‘মানসা’ করতে এসেছিল দুজনে। ঠাকুরমার গাছের কিছু ফুলফল এনেছিল রেকাবিতে। দুজনেরই পরনে নতুন তাঁতের শাড়ি। স্নান কবে এসেছে। এলোচুল ছড়িয়ে রয়েছে পিঠে। ভাঙা মন্দিরের চত্বরে রেকান্টি রেখে দুজনেই চোখের জল ফেলেছে। গলবস্ত্রে প্রণাম করেছে। তারপর শেষ বেলায় বাস রাস্তায় ফিরে এসে বাসের প্রতীক্ষা করেছে বকুল গাছটার তলায়।

সেই সময় ব্রিজের শেষ প্রান্তে অমলতাস গাছটাব ধারে একটা মোটরগাড়ি এসে থামল। অমনি রজনী অফুটস্বরে বলে উঠল, ‘বিয়ানাদিয় দাদা না?’

অপরূপা তাকিয়ে রইল। শতক্র গাড়ি থেকে বেরিয়ে ব্রিজের ওপর উঠল। রেলিঙে ভর দিয়ে নদী দেখতে থাকল।

অপরূপা চকল হয়ে উঠল। বলল, ‘আমাদের দেখতে পায় নি। নৈলে চলে আসত। আর রনি!’

‘কোথায়?’

‘শাটলেজনার কাছে।’ অপরূপা দুটুপি করে হাসল। রজনীর হাত ধরে টানলও।

বঙ্গব বাগানুখে বলল ‘তুই যেন কী! যেচে পড়ে ভাব জমাতে যাস লোকের সঙ্গে।’

অপরূপা বলল, ‘অতবড় একটা সাজেডি ঘটল। নিজের ছোট বোন। তাই এ্যান্ডিন আমাদের বাড়ি আসে নি। আমিও সেইকথা ভেবে কোনো যোগাযোগ করি নি। আয় না! অন্তত বিয়াসের জগৎ সিম্প্যাথি জানানো উচিত কি না বল তুই।’

রজনী বলল, ‘সিম্প্যাথি থাকলে টলাইন পোস্টকাডে লিখে পাঠাতিস! পাঠাস নি কেন?’

অপরূপা দোবী মুখে বলল, ‘ঠিক বলেছি। অতটা খেয়াল হয় নি। যাক গে, যা হবার হয়েছে—আয়।’

রজনী বিধাজড়িত পা ফেলে অপরূপাকে অহুমরণ করল। অপরূপার এই

তাগিদের কিছু বোঝে না রজন। অপরাধ কেবলই মাসটা টিউশনি করে জবাব দিয়েছে। বাঁকা-শ্রীরামপুর চলে যেতে খরচপাতি আছে বলে হিসেব করে চলেছে। বিয়াস ওভাবে মারা না গেলে সে শতক্ষর সঙ্গে শিগগির যোগাযোগ করত। কিন্তু শোকতাপগ্রস্ত মানুষকে এসব কথা এখন বলা যায় না! অবশ্য ইচ্ছে তো শতক্ষরই। কিন্তু শতক্ষরও এসে কিছু বলার মতো মানসিক অবস্থা ছিল না এতদিন। এবার কথাটা নিয়ে বসা যায়। রজনীর ব্যবস্থাটা সেরে কেলে অপরাধ তখন বাঁকা-শ্রীরামপুরে চলে যাবে।

পায়ের শব্দে মুখ ফিরিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল শতক্ষ। তার পরনে ঘিয়ে বড়ের পাঞ্জাবি আর দুধের মতো শাদা রঙের পাঞ্জামা। তার চুল উড়ছিল এলোমেলো হাওয়ায়। অপরাধের চোখে খুব সুন্দর দেখাল তাকে। এমন ছেলের হাতে বোনকে তুলে দেবার গর্বে সে চঞ্চল হল আরও।

শতক্ষ আন্তে বলল, ‘কী খবর?’

একটু দমে গেল অপরাধ। ভাবল, এখনও বোনের শোকটা কাটিয়ে ওঠে নি শতক্ষ। অপরাধ একটু হাসল। ‘আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছিলুম। বিয়াস ওভাবে হঠাৎ...’

শতক্ষ বলল, ‘মন্দিরে গিয়েছিলেন বুঝি? পুজো দিতে?’

অপরাধ বলল, ‘হ্যাঁ। আমরা—মানে আমি চলে যাচ্ছি তো বাঁকা-শ্রীরামপুরে, তাই প্রণাম করতে এসেছিলুম।’

‘সেটা কোথায়?’

‘বেশ ধানিকটা দূরে। আমার ঠাকুমাব বাবার গ্রাম। সেখানে স্থলে একটা চাকরি পেয়েছি।’

‘আচ্ছা।’ শতক্ষ একটু হেসে রজনীর উদ্দেশে বলল, ‘আপনিও যাচ্ছেন তো?’

রজনী আন্তে ঘাড় নাড়ল। হ্যাঁ কিংবা না বোঝা কঠিন। অপরাধ দ্রুত বলল, ‘কিছু ঠিক নেই। ওর গ্রাম-ট্রাম ভীষণ অপছন্দ। আপনি তো ভালই জানেন শাটলেজলা, দিনরাত্তির ইংরিজি উপভাস পড়ে ওর মনে এখন সে-দেশের স্বপ্ন।’ অপরাধ হাসতে লাগল। রজনী মুখ ফিরিয়ে নদী দেখতে থাকল।

শতক্ষ হাসল। ‘তাই বুঝি? বেশ তো। আরও পড়াশুনো করুন। নিউজপেপার দেখবেন, মাঝে মাঝে করেন স্কলারশিপের বিজ্ঞাপন দেখুন।’

অপরাধ বলল, ‘বিয়াসদি মৃত্যুর আগে কলকাতা থেকে আমাকে চিঠি লিখেছিল।’

‘হ্যাঁ আমাকে বলেছিল লিখবে।’...বলে শতক্ষ একটু হাসল। ‘কিন্তু আর-তো সে-গ্রন্থই ওঠে না।’

‘আপনি কবে কিরছেন শাটলেজনা ?’

শতদ্রু ভুরু কুঁচকে একটু ভেবে বলল, ‘কোথায় ? স্টেটসে ? নাঃ । কিরছি না ।’

অপরূপা আস্তে বলল, ‘হ্যাঁ—এমন একটা ট্র্যাজিক ঘটনা ঘটল । বাড়ির একমাত্র ছেলে আপনি ।’

‘ঠিকই ধরেছেন ।’ শতদ্রু একটা চাবির রিঙ আঙুলে জড়িয়ে ঘোরাতে-ঘোরাতে বলল । ‘এ বয়সে বাবাকে কষ্ট দেওয়া উচিত মনে করলুম না । তবে বসন্তপুরে থাকছি না ডেকিনিটলি ! আমাদের এখানকার বাড়ি-টাড়ি এভারথিং বেচে দিচ্ছি । সব ঠিক হয়ে গেছে । মোস্ট প্রবেবলি বাই দা নেক্সট উইক আমরা কলকাতায় নতুন বাড়িতে গিয়ে উঠছি ।’

অপরূপা শুকনো মুখে বলল, ‘হ্যাঁ—বাড়িটার তো দোষ ঘটে গেল ।’

শতদ্রু হাসতে লাগল । ‘যিনি কিনছেন, তিনি সব জেনেগেনেই কিনছেন ।’

‘আপনি কলকাতায় থাকছেন তাহলে ?’

‘হ্যাঁঃ ।’ শতদ্রু ঠোট বাঁকা করে বলল । ‘একটা কিছু করতে হবে রুজিরোজগারের জন্ত । আমার বরাত ! নরক বলে যাকে ঘেঁষা করি, তার সঙ্গে এ্যাডজাস্ট করে চলতেই হবে । উপায় কো ?’ সে শিস দেবার ভঙ্গিতে ঠোট গোল করে নদীর দিকে ঝুঁকল ।

রজনী বলল, ‘দিদি ! একটা ট্রাক আসছে । নিয়ে যাবে না ?’ অপরূপা দেখে নিয়ে বলল, ‘গুথ না, দাঁড়ায় নাকি ।’

শতদ্রু বলল, ‘কেন ? আমি অনায়াসে আপনাদের লিকচু দিতে পারি ।’

অপরূপা জবাব দিল না । হুই বোন রাস্তার একেবারে মাঝখানে । ট্রাকটা থেমে গেল । ভাইভার মুখ বাঁড়য়ে বলল, ‘গাড়ি বিগড়ে গেসে ?’

অপরূপা দ্রুত বলল, ‘হ্যাঁ । আমাদের একটু বসন্তপুরে পৌঁছে দেবেন সর্দারজী ?’

‘আইয়ে, আইয়ে । বৈঠ্ যাইয়ে ’

বাড়ি ঢুকেই অপরূপা বলল, ‘মা করালী যা করেন, সবই ভালর জন্তে রে । ভেবে গুথ, কেটসিজির ছেলের কথায় তখন যদি কিছু করে বসন্তপুর, এখন কী অবস্থা হত তোর ? ওই ছত্ৰী রাজপুত—খোটাং-শের বুডো আর তার দেমাকী বোঁ-এর পাল্লায় পড়তেই হ’তো তোকে । আর শাটলেজ না কাটলেট বলতিস, ঠিকই বলতিস । আসলে বড়লোকের ছেলের খেয়াল । কথায় বলে না ? বড়র পীড়িত্তি বালির বাধ...’

রজনী ইন্দারাতলার দিকে যাচ্ছিল । ঘুরে বলল, ‘শাট আপ ! ঘুব হয়েছে ।’

অপরূপা আসন্ন সন্ধ্যার ঘূসর আলোয় শান্তভাবে হাসল । ‘সত্যি বলছি

রে রনি, তুই না থাকলে বাঁকাশ্রীরামপুরে কী করে একা থাকতুম ভেবে পাচ্ছিনে। আকটার অল বিদেশবিভূই জায়গা তো বটে। অজ পাড়ানী। দুজনে থাকলে কত সাহস পাব বল রনি।’

তারপর সে বাড়ির ভেতর চোখ বুলিয়ে শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে ফের বলল, ‘দাদা যদি কোনোদিন ফিরে আসে, সে এ বাড়িতে বাস করবে। সেই ভেবেই বাড়িটা নেচলুম না। থাক পড়ে। ছুতোর বউ দেখাশোনা করবে। ঠাকুমার লাগানো ফুল-কলের গাছপালাগুলো একটি জলটল পেয়ে বেঁচে থাকলে ঠাকুমার আত্মা শান্তি পাবে। আব কী করতে পারি আমরা, বল রনি?’

রঙ্গনা কিছু বলল না। সে ইন্দারায় বুকে গভীরতর জলের ভেতর আকাশ দেখার চেষ্টা করছিল। বালতিটা ডুবিয়ে জলকে স্থির হতে দিচ্ছিল। তার দিদি জানে না, কেউ জানে না, সেই কবে ঠাকুমার সঙ্গে করালীর মন্দির থেকে কেরার সময় শতক্রুর গাড়িতে তার মনের খুব তলার দিকে কী এক আবছা গোপন স্বপ্ন জেগে উঠেছিল। সেই স্বপ্ন সে মুছে ফেলতে পারে নি। স্বপ্নটা ছিল অজানা স্বপ্নের আশ্রয় এক দেশের—সে এক বহুদূরের পৃথিবী। ছবির মতো সাজানো বাস্তবধাট। প্রজাপতির মতো ফুটফুটে রঙীন মাছুষজন। হয়তো আমেরিকা নয়, ইউরোপ নয়—অন্ত এক দেশ। স্বর্গের মতো স্বপ্নের, মহৎ, সম্ভাবনাময়, নিরুপদ্রব।

বিহ্বাস দব চিঠিটা পড়ার পর সেই গোপন স্বপ্ন তাকে আরও চঞ্চল করেছিল। সারারাত সে ভাবত কত সব ভাবনা। আর ভাবনাগুলোর মধ্যে ফুটে উঠত দীর্ঘ স্ট্রাম উজ্জল চেহারার এক যুবাপুরুষ—তার মধ্যে শতক্রুর আদল দেখে সে লজ্জায় বালিশে মুখ গুঁজত। রঙ্গনা সেই যুবাপুরুষটিকে চুপিচুপি ভালবাসতে শুরু করেছিল। এতদিনে আবিষ্কার করল, সেই যুবাপুরুষ শতক্রু নয়। অত একজন। তার প্রতীক্ষা রঙ্গনার জীবনে আয়ত্ব্য থেকে যাবে। রূপের জগতে সে বুঝি এক অরূপরতন।

রঙ্গনা ইন্দারায় বুকে স্বপ্নভঙ্গের দুঃখটাকে লুকোতে চাইছিল। তার বুকের ভেতরে তাঁর একটা কান্নার আবেগ ঠেলে উঠছিল। সে চোঁট কামড়ে ধরে গভীরতর প্রতিবিস্তৃত আকাশ দেখতে থাকল।

অপরূপা যখন তাকে ডেকে বলল, ‘অমন করে সন্ধ্যাবেলা ইন্দারায় বুকে থাকতে নেই, সরে আয়—’ তখন সে মুখ তুলে আস্তে বলল, ‘বাচ্ছি।’ তারপর ভরা বালতিটা তাড়াতাড়ি টেনে তুলল। দিদি দেখার আগেই ভেজা চোখ দুটো সে বালতির জল দিয়ে ধুয়ে ফেলল। ..

উপসংহার

আজকাল গ্রামাঞ্চলের চেহারা দ্রুত বদলে যাচ্ছে। আদিতে কারণ অবশ্য ভোটের বাস্তবীকরণ। ভোটকুড়ুনো মোটরগাড়ি চলাচলের উপযোগী রাস্তাঘাট দরকার। মাত্র একটা ভোট জয়-পরাজয় স্থচিত করে। স্বতরাং এই তৎপত্তা। হাইওয়ে থেকে বাঁকা-শ্রীরামপুর পর্যন্ত পাঁচমাইল কাঁচা রাস্তা পাকা হচ্ছে। একপ্রস্থ ঝামা ইটের সোলিং পড়েছে, যদিও প্রত্যেকটা টুকরোর মধ্যে কালো রঙ খোঁজা বখা এবং দ্রুত ডিজেলচালিত বৃহৎ রোলারে পেয়াই করে তখনই একস্তর হালকা পাথরকি ছড়িয়ে সত্যামত্য গোপন করা হচ্ছে। রোডস দক্ষতরের ওভারশিফটবাবু কন্ট্রাক্টারের তাবুতে বসে মুরগিব ঠ্যাং চিবোন এবং ওকে আওয়াজ দিয়ে সদর অফিসে ফেরেন। কচিং কোনো মোলায়েম-স্বভাবী ইঞ্জিনিয়ারের আগমন ঘটে। পথিপার্শ্বে কালো ড্রামে পিছু সেক হয়। কড়াইভর্তি গরম পিচ নিয়ে লোকেরা ছোট্টাছুটি করে। তাদের পেছনে আদিবাসী মেয়েদের মাথায় বালির খুড়ি। ইঞ্জিনিয়ার ভ্রলোক উদাসচোখে দিগন্তবিস্তৃত সবুজ মাঠ দেখতে দেখতে হঠাৎ-জেগে-উঠা কণ্ঠস্বরে বলেন, ‘মাই গুডনেস! এ যে দেখছি সত্যিই সবুজ বিপ্লব!’

এখন বসন্তকাল। তবু শরতকাল বলে ভ্রম হয়। বাঁক-শ্রীরামপুরের গা ঘেঁষে বাঁজা ডাঙায় কন্ট্রাক্টারের তেরপলের কয়েকটা তাঁবু পড়েছে। পেছনে ঢাঙা বিশাল শিমূল ভাব ফুল উজাড় করে কেলে নিঃস্ব হয়ে সারাদিন উজ্জ্বল হাওয়ায় পুঞ্জপুঞ্জ তুলো ছড়ায়। পুরুরপাড়ে জীর্ণ প্রাচীন শিবমন্দিরে স্তম্ভ সন্দেশীবা দেয় আসন্ন সংক্রান্তির উদ্দেশ্যে জয়ধ্বনি। ঝুলপালানো ছেলেমেয়েরা তাঁবু আনাচেকানাচে ঘুরঘুর করে। সিগারেটের শূন্য প্যাকেট থেকে রাংতাকাগজ সংগ্রহ করে। প্রাইমারি সেকশনের দ্বিদিমিটি বড় কড়া। স্কুলের বারান্দা থেকে এদিকে তাকালেই তাদের বৃকের স্পন্দন বেড়ে যায়। শিবমন্দিরের কঙ্কালের জঙ্কলে তারা গা ঢাকা দেয়। ঠিক তখনই ঢং ঢং করে টিকিনের খন্টা বেজে ওঠে।

বাঁক-শ্রীরামপুর আমোদিনী বিদ্যালয় এখন সরকারী অফিসমোদন লাভ করেছে। সামনে বছর অন্তত একডজন ছাত্র-ছাত্রী স্কলকাইনাল দেবে। প্রাচীনকালের জমিদারী কাছারিবাড়ির একতলা সারবাঁধা ঘরগুলোর শোল বদলেছে। জুপাশে

কিছু নতুন ধর জোড়া দেওয়া হয়েছে। সামনে ফুলবাগিচা জেগে উঠেছে, এবং গোটে বুগানভিলিয়ার বাঁপি। ফুলে ফুলে লাল বরনা নেমেছে।

ছুটির পর রজনী বাড়ি করে না। ফুলের পেছনে বাঁধের নিচেই ছোট্ট নদী। সে বাঁধে কিছুদূর এগিয়ে আসেটাকা একটুকরো জমিতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত বসে থাকে। হাতে একটা বই। বইপড়া স্বভাব তাকে আজও ছাড়েনি। পড়তে পড়তে কখনও মুখ তুলে প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে থাকে। দূরের ঘাটে খানপরা কোনো রক্তাকে দেখলেই তার বুক ছাঁৎ করে ওঠে, কুড়ানি ঠাকরুন নাকি ?

কুড়ানি ঠাকরুনের বাপের ভিটের গ্রামপঞ্চায়ত ছুবোনের জন্তু মাটির ঘর তুলে দিয়েছে। উঠোন ঘিরে সুন্দর বাঁশের বেড়া আর বেড়া ঢেকে কেলেছে সবুজ লতাব ঝালর। উঠোনে কত ফুলফলের গাছ। কুড়ানি ঠাকরুনের আত্মা ভ্রম করেছে রক্তাকে। জামাইবাবু হরেনকে দিয়ে বীজ ও চারা আনাঘ। হরেন এখনও বসন্তপুরে সাধুবাবুদের পেট্রল পাম্পে চাকরি করছে। ছুটির দিনটা ছুটে আসে বউয়েব কাছে। চাকরি ছাড়লে তার চলবে না। তার অধর্ষ জ্যারামশাহিকে সপরিবারে ভিথিরী হতে দেবে কোন মুখে সে ? এদিকে অপরাধা সম্ভানসম্ভবা। হরেনের ইচ্ছা, বাচ্চাটা পৃথিবীর মুখ দেখলেই সে জ্বালিকাকে কোথাও গায়ের জোরে ঝুলিয়ে দেবে পাকাপোক্ত জায়গা দেখে। আর কোনো আপত্তি বরদাস্ত করবে না। আর কতকাল খিজি আইবুড়ি থাকবে অমন সুন্দর মেয়েটা ? বিয়ের কথা শুনেই আত্মহত্যার শাসানিতে নিশ্চয় গভীর কোনো অভিমান আছে, হবেনের এই ধারণা। তবে হরেনের এও মনে হয়, গতবছর বহরমপুরে বেসিক ট্রেনিং পড়ার সময় মাসছয়েক একা ছিল। তখন কারুব সঙ্গে প্রেম-ট্রেন বাধিয়ে আসে নি তো ? অপরাধা তাই শুনে বলে, 'তোমার মাথা ধারাপ ? তাহলেও তো বেঁচে যেতুম।' ওব মনটা অল্পধাতুতে গড়া।

এদিন বিকেলে রজনী ফুলের ছুটির পর নদীর ধারে বসে ছিল। তার হাতে একটা হাক্কাধরনের ইংরেজি নভেল। বহুবীর পড়া হয়ে গেছে। কিন্তু উপায় নী ? ঝাক্কাভীরাযপুরে বই কোথায় পাবে ? বহরমপুরে ট্রেনিংয়েব সময় কয়েকটা বই স্টাইপেণ্ডের টাকা বাঁচিয়ে কিনেছিল। আর কয়েকখানা যা আছে, সবই মধুরবাবুর চোরাইমাল। বইগুলো সে বন্ধু করে তাকে সাজিয়ে রেখেছে। সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে সুখী চোখে তাকিয়ে থাকে। কল্পনা করে তার সারাঘর বইয়ে ঢাকা—রঙীন ফুলের মতো সুন্দর কত বই, কত কথা। সেখানেই তার বেঁচে থাকার পৃথিবী।

বাঁদিকে বাঁধের ওধারে উঁচু বাঁজা ডাঙায় কন্ট্রাক্টারের তাঁবুর মাথা দেখা

বাচ্ছিল। শেষবেলায় কালো ধোঁরা উঠেছে চাপচাপ সেনিকটার। পিচের ড্রাম গরম করছে মজুরেরা। মার্চেই কাজ শেষ করার কথা ছিল। শেষ করা যায় নি। এপ্রিলের একটা সপ্তাহ চলে গেল। তাই ব্যস্ততা। সন্ধ্যা অবধি কাজ চলেছে। আগামী পয়সা বোশেখ পূর্তমন্ত্রী উদ্বোধন করতে আসবেন।

বাজা ডাঙা থেকে কেউ দাঁড়িয়ে তাকে দেখছে—পরনে খুসর প্যান্ট, সাদা শার্ট, মাথায় টুপি। রক্তনা অস্বস্তি বোধ করছিল। লোকটাকে সে এদিকে আসতে দেখে উঠে দাঁড়াল। নির্জন জায়গা। তার গা ছমছম করছিল। বাঁধে উঠতেই সে দেখল, লোকটা ধমকে দাঁড়িয়ে গেছে। পড়ন্ত বেলার লালচে আলো তার মুখেব একটা পাশে পড়েছে। রক্তনাও দাঁড়িয়ে গেল। তার বুকের ভেতর একঝলক রক্ত ছলকে উঠল। শতদ্রু না?

পরক্ষণেই দেখল শতদ্রু আসছে। তারপর লম্বা পায়ে এগিয়ে সে বাঁধে উঠল। 'কী আশ্চর্য। আপনি রক্তনা?'

রক্তনা হাসল এতক্ষণে। 'আপনি এখানে?'

শতদ্রু একটু মুগিয়ে গেছে। রঙের সেই উজ্জলতা আরু নেই। ঈষৎ তামাটে, রোদপোড়া আব রুক্ষ দেখাচ্ছে তাকে। বলল, 'কদিন থেকে লক্ষ্য করছি আপনাকে। কি ভুলেও ভাবিন যে আপনি।' শতদ্রু সিগারেট ধরাল উদ্দাম হাওয়ার আড়ালে 'বাঁকা-প্রীরামপুরের কথা আপনার দিদির কাছে শুনেছিলুম যেন। নাকি অকেউ বলেছিল। থাক্ গে, খবর বলুন। আপনার দিদি কেমন আছেন?'

রক্তনা বললদিদি ভাল আছে। আপনি বুঝি রাস্তার কাজে এসেছেন?'

'আব বন্মে না।' শতদ্রু একটু বিরক্ত মুখে বলল। 'শেষপর্যন্ত পৈতৃক পেশায় ঢুকলো। চাকবি-টাকরি আমার পোষাল না। ওদিকে বাবা মারা গেলেন। তাঁর ভাবলুম, বাবার পরিচিত এলাকাতেই ক্রিয়াকর্ম নেওয়ার সুবিধে অনে বাবার অনেক কন্টাক্ট ছিল তো এ জেলায়।'

রক্তনা ল। 'তাললে সত্যি আমেরিকায় ফিরে যাননি দেখছি।'

শতদ্রু হাসল। 'সেই শেষ দেখা আপনার সঙ্গে—করালী নদীর ত্রিজে। মনে আক্সোমি সম্ভবত খানিক রক্ত ব্যবহার করেছিলুম। এতদিনে কমা খাবার পাওয়া গেল। আসলে তখন আমি প্রচণ্ড মানসিক বিপর্যয়ে আবার?' কমা করছেন তো?'

রক্তনা কান্না বলল, 'কেন ও কথা? পাচবছর আগে কী ঘটেছিল, আমার আছে-এখানে।'

‘আমার মনে আছে।’ শতক্ষ দূরের দিকে তাকিয়ে চাপা নিঃশ্বাস কেঁলল। তারপর ঘুরে বলল ফের, ‘তারপর আমার খুব ইচ্ছে করেছিল, আপনাদের বাড়ি যাই। সবকথা বলে আসি। কিন্তু বুঝতে পারিনি কীভাবে আপনারা নেবেন ব্যাপারটা।’

রজনী ওর চোখে চোখ রেখে বলল, ‘কী?’

‘আপনার দাদার ব্যাপারটা।’

‘আমরা জানি।’

‘জানেন?’ শতক্ষ একটু চমকে উঠল। ‘কীভাবে জানলেন?’

‘আমার জামাইবাবু শুনেছিলেন আপনাদের বাড়ির একটা লোকের কাছে।’

‘ভুলোদার কাছে বুঝি?’

‘হ্যাঁ।’

শতক্ষ গলায় একটু ব্যকুলতা এনে বলল, ‘বাবয়্য কোনো হাত ছিল না এতে। জানোয়ার পুষেছিলেন বাড়িতে—’

বাধা দিয়ে রজনী বলল, ‘ওসব কথা থাক। বসন্তপুত্রর বাড়িটা তো বেচে দিয়েছেন তুনেছি।’

শতক্ষ আনমনে বলল, ‘হ্যাঁ। বহরমপুরে একটা বাড়ি কেনে ছ সস্তাতি। কলকাতার বাড়িটায় ভাড়াটে বসিয়েছি।’ তারপর দ একটু হাসল। ‘এখন বাবার মতো ঘোর বিষয়ী মানুষ হয়ে গেছি, বুঝে। খুব হিসেবী মানুষ।’

‘তাই বুঝি?’

‘হ্যাঁ। বউ, ছেলেপুলে—অবশ্য মাত্র একখানা, সবে ইন্টার্মিশেখে—বড় বিচ্ছু। বুঝলেন?’

রজনী তাকাল তার মুখের দিকে। ‘কোথায় বিয়ে করলেন

‘বহরমপুরেই শেষপর্যন্ত। বাবাকে আর বুড়োবয়সে বউতে চাইনি। তাছাড়া মায়েরও...’

রজনী হঠাৎ বলল, ‘আচ্ছা, চল। দাদকে বলব আপনার কথা

শতক্ষ আন্তে বলল, ‘এলাকায় আছি। তাই আশা কবছি, কানোনামি আপনার বিয়ের নেমন্তন্ন পেয়ে যাব। ভুলে যাবেন না কিন্তু। আ বিয়েটা এমন হঠাৎ হয়ে গেল যে কিছু করার ছিল না। আসলে ভাগ্য তার বেচে একটা আছে। আমাদের ইচ্ছা অনিচ্ছা কোনো মূল্য সে দেয়

রজনীর চোখ জলে উঠেছিল। মুহূর্তে শান্ত হয়ে সে ঠোঁটের মাঝে দেখা

হাল। 'বিয়ে ছাড়া এখনও অতকিছু ভাবতে শেখেন নি মনে হচ্ছে। আচ্ছা,

শতরু পা বাড়িয়ে বলল, 'রজনী'।' শুনুন। আমি কি স্বীকৃত করলেন আমার
কোথায় ?'

'না।'

'রজনী, আপনি বাগ করেছেন।'

'...'

আক্রান্ত প্রাণীর মতো রজনী হনহন করে হাঁটছিল। ফুলবাড়ির কাছে গিয়ে
একবার ঘুরে দেখল, শতরু তখনও বাঁধের ওপর দাঁড়িয়ে তাকে দেখছে। এক-
মুহূর্তের জগত ভাব মনে প্রশ্ন উঠল, কেন ? কিন্তু জবাব খুঁজতে গিয়ে দেখল তার
বুকের ভেতরটা পাঁচবছর আগের এক সন্ধ্যাবেলার তেই ছিল উঠেছে, চোখ
ছাপিয়ে জল আসছে।

যখন সে বাড়ি ঢুকল, তখন সে শান্ত এবং কঠোর। অপরাধী বলল, 'কোথায়
খাকিস রনি এতক্ষণ পর্যন্ত ? বতুর বউ এসেছিল। এই জাধী, একগাদা মাছ
দি' গেল। কাল থেকে ওর ছেনেটাকে নিয়ে একটু বসবি, বুখলি ? জাল্ট
আইন্ট একটু পড়াবি।' অপরাধী কলাপাতা ভালতোহাতে খুলে খয়রামাছ-
গুলে দেখিয়ে হাসল। 'বতুর বউ বলল, রোজ এমনি টাটকা মাছ খাওয়াবে।
ও রাই, অবেলায় আমি আব আঁশের হাত করব না রে। লাকি ভাল তুই
এগুলোব ব্যবস্থা কর।'

কালকে মাছগুলো দেখে মূহূর্তে রজনীর মুখ ঝলিতে লাগল। বউ নিয়ে
কলতব দৌড়ল হস্তদস্ত। দিন্নপেখ ধুসর আলোয় ফুলকলেব সংসারে
বসন্তপুর্ভিটের সেই পুরনো কোনো দিনের আনন্দ ফিরে এসেছে। আঁশ
ছাড়াছোড়াতে রজনীর মনে হয়, কুড়ানি ঠাকরুন তৈরী কবে লাওয়ায় বসে
তাকে দেখেন এবং এত কাটলেই বলে উঠবেন, 'অই। অই।'

রজনী বলল 'দিদি, তুলে গেছি বলতে। আজ কী অদ্ভুত ব্যাপার জানিস ?'
'কী ?'

'বিরুদ্ধি দাঁটার মনে দেখা হল।'

অপরাধী ব্যস্ত হয়ে কাছে এল। 'সে কী রে। সাটলেজদাকে কোথায় দেখলি
আবার ?'

রজনী কাজে মন দিয়ে বলল, 'ওই যে রাস্তা হচ্ছে—তার কন্ট্রোল। অ্যাডিন
আছে এখানে, আমরা জানিই না। আর বুখলি দিদি ? মুখের জিওগ্রাফি

বললে গেছে। হঠাৎ দেখলে চিনতেই পারবিনা। কীছুটিয়ে না গেছে! তখন
কথা জিগোস করছিল।’

অপরূপা ব্যস্ত হয়ে বলল, ‘তুই সঙ্গে কাঁবে ডেকে আনলিনে কেন? কোথায়
উঠেছে বল তো স্যাটলেজলা!’

‘কে.’ তুই যাব না? দেখা করতে?’

অপরূপা হাসল। ‘যাব বকি। হাতের কাছে এসে পড়েছে। যাব না?
শিবমন্দিরের পাশে কন্সট্রাক্টর ক্যাম্প দেখেছি। ওখানেই

রক্তনা মাথা দোলাল।

‘হ্যাঁ রে, কেমন মনে হল ওকে?’ অপরূপা চাপা গলায় বলল। ‘আসলে
দাদার ব্যাপারটার জন্তেই পিছুিয়ে গিয়েছিল। কনসেনসাস হল তো! কিন্তু
ভেবে জায রনি, ওর তো কোনো লোষ নেই ওতে। ওর বাবাও নেই ভাবতে
গেলে। বাহাদুরটাকে যদি পাতুম, ঝাঁট দিয়ে কাটতুম। পালিয়ে গেছে যে।’

রক্তনা টিউবেলের হাতল চাপে মাছের ওপর জল ঢালতে থাকল। টিউবেলটা
হরেনের টাকায় হয়েছে। পলিমাটি এলাকার জল বলে কেমন ঝাঁশটে গন্ধ
জলটার। ভুঁ অর চাপেই বদলকর করে একরাশ জল উগরে দেয়।

অপরূপা চোখের জল মুছে বলল কেন, ‘পাস্ট্ ইজ পাস্ট্। আমি সব
যাব স্যাটলেজলার কাছে। শুনেছি কেউ সিদ্ধি মারা গেছে। তবে ওর বউ
ভালিমান্ন। হবে না কেন? কলকাতার মেয়ে—এজুকেটেড মেয়ে। কথাটা
কি আভাস পেয়ে না তোকে কত পছন্দ বিন্যাসের মাদ্রেন?’

রক্তনা মাছগুলো ধোঁয়া কলাপাতায় নিয়ে বেতে বেতে বলল, ‘কুন্ডি...
ডোর স্যাটলেজলা বহরমপুরে বিয়ে করেছে। বাচ্চা হয়েছে। হাঁচি-হাঁচি পা-পা
করছে বলল। আর বলল, বড্ড বিচ্ছু।’

অপরূপা ঘুরে দাঁড়িয়ে কান করে শুনছিল। চমক দিয়ে বলল, ‘সত্যি?’
‘সত্যি।’

রায়াঘরের বারান্দায় হেরিকেন জেলে রক্তনা দেখল, অপরূপা তখন চুপচাপ
দাঁড়িয়ে আছে কলতলার কাছে। আবছা আঁধারে তাকে ভূতের মত দেখাচ্ছে।
রক্তনা কুড়ানি ঠাকরনের কণ্ঠস্বরে ডাকল, ‘সন্ধ্যাবেলা অমন করে দাঁয়ে থাকে
না। এখানে আর না রে দাদা!’

অপরূপা আঙুলে বলল, ‘হাই।’...